ব রে ন ব সু

প্রাক্তন

সাধারণ পাবলিশার্স

· ৭ ওয়েস্ট রোঃ ঃ কলিকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৬

সাড়ে চার টাকা

নরেন মল্লিক কর্তৃক সাধাবণ পার্বলিশার্স, ৭ ওযেণ্ট রো, কলিকাতা ১৭
প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হা
াইভেট লিমিটেড, ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা ১৩ হইতে মু

প্রাক্কথন

লেখকেব অন্যান্য বই

রঙরুট
জংগী ভিয়েৎনাম
মহানায়ক
বাবুরামের বিবি
নতুন ফৌজ

ধুলোয় ধূসর এক গোধূলি...........

দিন ক্ষণ বর্ষের পাঁজিতে সেদিনটা এমন কোন বিশেষ একটা দিনও নয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সেদিনের সন্ধ্যা সমাগমে ছিল না কোন বিশেষ সমারোহ। সে দিনটা বছরের আর যে কোন একটা আটপৌরে দিনের মতই গতানুগতিক।

জায়গাটা জলন্ধর ক্যান্টনমেণ্ট। ওটা গ্রামও নয়, শহরও নয়—নিছক একটা সেনা ছাউনি। গোধূলি ওখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে থাকে আকাশের গায়ে। দিন যাই-যাই করেও যেতে চায় না। সৈনিকদের মনে সন্ধ্যার আমেজ লাগার আগেই নেমে আসে ক্লান্তি।

সময়টা উনিশশো' ছেচল্লিশ সালের মে মাস।

যুদ্ধের পাট চুকেছে। নতুন যে পালা সুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে যুদ্ধ ব্যবস্থার পাট গুটানো। এই পাট-গুটানোর ব্যাপারেও সেদিন সেনা-ছাউনি যুদ্ধকালিন যে কোন একটা দিনের মতই কর্মমুখর। ব্যবস্থাযন্ত্র ঘড়ির কাঁটার মতই টিক্‌টিক্ করে বিস্তীর্ণ সময়ের মাত্রা ভাগ করে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে।

সৈনিকদের মুক্তি দিয়ে বাড়ী পাঠানোর কাজ চলেছে পুরোদমে। তার সঙ্গেও ব্যবস্থাবিদদের সমান নিষ্ঠা। রূঢ়তা আর ক্রূরতার সেই একই আভিজাত্য। কতকগুলো মানুষকে ফৌজি খাতায় নাম লিখিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো অথবা অবশিষ্ট মানুষগুলির নাম সেই চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে কেটে দিয়ে বাড়ী পাঠানোর ব্যাপারে সেই একই ব্যবস্থা, একই প্রক্রিয়া। মানুষ নামে খ্যাত জীবগুলির মননশক্তি নামক কোন একটি অকিঞ্চিৎকর বৃত্তির প্রতি সেই একই ঔদাসীন্য।

সে দিনের বিলম্বিত গোধূলি লগ্নে কতকগুলো মানুষ সেনা-ছাউনির কাঁটা তারের বারো ফুট উঁচু বেড়া আর তার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরীর উদ্যত বেয়নেট অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালো রাস্তায়।

তারা মুক্ত! তারাই সেই মুহূর্ত থেকে প্রাক্তন সৈনিক।

ছাউনি থেকে স্টেশন, প্রায় এক মাইল রাস্তা আনন্দের মত্ততায় মাতালের মত টলতে টলতে তারা চলেছে। ফেটিগ্-খাটা, অর্থাৎ মোট-বাহী একদল সৈনিকদের দিকে চেয়ে সমবেতভাবে অট্টহাসি হেসেছে। বোধহয় জানাতে চেয়েছে, তারা আর তাদের সমগোত্রীয় নয়।

পথের ধার দিয়ে যাওয়া স্থানীয় একটি মেয়েকে দেখে প্রথমে শিষ দিয়েছে, তারপর কটাক্ষ হেনেছে, তার পরে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে। মেয়েটি যখন ছুটে পালিয়ে গেছে, তখন উন্মত্তের মত অট্টরোলে হেসে উঠে পরস্পরের গায়ে প'ড়ে ঢলাঢলি করেছে।

সেই দিনটিতে এইটাই হয়তো তাদের কাছে আনন্দ! এ আনন্দ নিশ্চয়ই কোন সুস্থ সামাজিক জীবের নয়। তবুও এ-ও আনন্দ! এ আনন্দ তো বাঁধন ছে'ড়া জন্তু জানোয়ারের! তারাও হয়তো এই-ই।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসে যখন তারা উঠলো, তখন ঠুলি-লাগানো আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। যাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম। স্টেশনে নেই কোন কোলাহল। ওই ঠুলি-লাগানো আলোগুলোর মতই সমস্ত স্টেশনটা যেন ঝিমুচ্ছে।

সাধারণ নাগরিক যাত্রীরা যথা সম্ভব নিজেদের অস্তিত্বকে অগোচরে রাখবার উদ্দেশ্যে আড়ালে-আবডালে গুটিসুটি মেরে ব'সে আছে। যুদ্ধ থেমেছে, তবুও তারা এখনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি। এখনও ট্রেণে মিলিটারী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী।

স্টেশনের ঘণ্টা খন্খন্ করে বেজে ওঠে। নাগরিক যাত্রীরা অন্ধকারের কন্দর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে। আসছে পাঞ্জাব মেল।

অফিসার ছাড়া মিলিটারী পোষাকে আর কারও পাঞ্জাব মেলে ওঠা হুকুমনামা অনুসারে নিষিদ্ধ। সুতরাং যে দলটা সবেমাত্র স্টেশনে এসে হাজির হ'ল, আর তাদের মধ্যে যারা পাঞ্জাব মেলে যাওয়াই স্থির করলো, তাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বেশ পরিবর্তন।

তারা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বেশ পরিবর্তন ক'রে নিলে। কেউ পরলে পায়জামা, সার্ট আর কাবুলি জুতো--আবার কেউ কেউ পরলে ধুতি, পাঞ্জাবী আর চপ্পল।

আর এতদিনকার পোষাকগুলো! কেউ বুটজোড়া পানবিড়ির

ভেণ্ডারকে দিয়ে নিলে এক বাণ্ডিল বিড়ি বা এক প্যাকেট সিগারেট। কেউ বুটজোড়া সজোরে ছুঁড়ে দিলে অন্ধকারের মধ্যে। আর যে ছিল সবচেয়ে রসিক, সে বুটপট্টি থেকে সুরু ক'রে মাথার মণ্টি-ক্যাপটা পর্যন্ত প্ল্যাটফরম থেকে নেমে দুটি লাইনের ওপর সাজিয়ে দিলে। যেন অশরীরি এক সৈনিক পরম নিশ্চিন্তে রেল লাইনের ওপর শুয়ে পাঞ্জাব মেলের আলিঙ্গনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

পাঞ্জাব মেল এসে দাঁড়াতেই নাগরিক পোষাকে প্রাক্তন সৈনিকরা মিশে গেল সাধারণ নাগরিক যাত্রীদের সঙ্গে। সৈনিকের পোসাকে প্রাক্তন সৈনিকরাই তুলে দিলে তাদের মালপত্তর; কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে শেষ আলাপ করলো। আর যে তাদের মধ্যে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই রইলো না, সে কথা বলতে গিয়ে চোখ ভরে উঠলো জলে। মনে পড়লো, জীবন পর্যটনের পথে এক সরাইখানার পালা শেষ হ'ল। আবার সুরু হবে পথ চলা।

পাঞ্জাব মেল যখন স্টেশন ছেড়ে রওনা দিল, তখন বাকীরা কেমন যেন মনমরা হয়ে যায়। মনে পড়ে, এইবার আসবে আর্. টি. ও, গরু-ভেড়ার মত তাদের নিয়ে গোণাগিণতি সুরু করবে. নামের বদলে নম্বর ধরে হাঁকবে ফৌজি আদবকায়দা সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবে. তারপর তাদের পুরে দেবে একটি কামরার মধ্যে।

তাদের যাওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট ট্রেণ হচ্ছে আর. সি. মেল, অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ডি-ক্যালকাটা মেল। আর. সি মেলে তাদের জন্যে অনেক জায়গা। হয়তো সারা পথই শুয়ে যেতে পারবে। পথে চা, খানার সুবন্দোবস্ত, দাঁড়াবে শুধু ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনগুলোয়। সৈনিকদের উঠিয়ে নেওয়া বা নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়দায়িত্ব এ ট্রেণের নেই।

তবুও মনে স্বস্তি নেই। পাঁচুগোপাল আপন মনেই গজ্‌গজ্ করতে থাকে, ওই বিকাশটার কথায় রয়ে গেলাম, কিন্তু আগেভাগে বেরিয়ে পড়লেই ছিল ভাল। এ শালাদের বিশ্বাস নেই। এখনই হয়তো এক শালা জমাদার এসে বলবে, চলো সব্‌কোই ক্যাম্পমে—উয়ো রিলিজ্ অর্ডার ক্যান্‌সেল্ হো গয়া!

পাঁচুগোপালের উক্তির সম্ভাব্যতায় অতখানি আস্থা না থাকা সত্ত্বেও বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। বিগত পাঁচ বছরের অভ্যাসের সঙ্গে আজকের এই পরিস্থিতি কিছুতেই যেন খাপ খাচ্ছে না। পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ হুকুম করছে না, তাদের চলাফেরার ওপর নেই কারও কড়া নজর—এইটাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে অস্বস্তিকর।

সুকুমার বলে ওঠে, এ শালা উজবুগের রাজত্বে সবই সম্ভব!

কমলাকান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আসুক না শালারা, ধরে চলন্ত ট্রেণের চাকার তলায় দেব ফেলে।

পাঁচ বছরের আঁটসাঁট সৈনিক জীবনে অভ্যস্ত সদ্য মুক্তি পাওয়া প্রাক্তন সৈনিকের মনে থাকে না, সে এখন মুক্ত। পুঞ্জিভূত আক্রোশ প্রতিদিনের অবসর মুহূর্তের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

কে একজন দেখিয়ে দেয় অদূরে ব'সে থাকা তাদেরই কোম্পানির হাবিলদার মেজরকে।

রফিক হাবিলদার মেজরের উদ্দেশ্যে কুৎসিত এক গালাগালি দিয়ে বলে ওঠে, ওই শালাকে আজ আমাদের গাড়ীতে টেনে তুলতেই হবে। কেমন আলাদা বসে আছে, যেন ও এখনও হাবিলদার মেজর!

সনত রফিককে কাছে টেনে নিয়ে বলে, ওর ওপর এখন ঝাল ঝেড়ে কি লাভটা হবে রফিক। ও কি ভাবছে হাবিলদার মেজরী ফলাবার জন্যে আলাদা ব'সে আছে। আসলে ও লজ্জায় আর ভয়ে আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারছে না।

কমলাকান্ত খেঁকিয়ে ওঠে, ওঃ, ভারী আমার লজ্জাবতী লতা রে! এ লজ্জা এতদিন ছিল কোথায়!

উত্তেজনাটা আর এগোতে পারে না। দূরে আর, সি, মেলের হেড্‌লাইট দেখা দিয়েছে।

আরও দেখা দেয় এক নতুন বিস্ময়। গাড়ী এসে পড়লো তবুও আর, টি, ও'র কোন পাত্তা নেই!

আর, সি, মেলে জায়গার অভাব হয় না। অধিকাংশ কামরা একেবারেই খালি। মিলিটারী জীবনে নিজের খুশিমত ট্রেণে ওঠা এই বুঝি প্রথম, আর শেষ তো বটেই। কাজেই সমস্ত ট্রেণটার এ-মোড় থেকে

ও-মোড় ছুটোছুটি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করে অতি সাধারণ এই স্বাধীনতাটুকু চেটেপুটে উপভোগ ক'রে নিতে চায় সকলে।

বিছানা পাততে পাততে রফিকের মনে প'ড়ে যায় হাবিলদার মেজরের কথা। চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে, সে শালা হাবিলদার মেজর গেল কোথায়?

সুকুমার টিপ্পনি কাটে, দেখ্, হয়তো ডগ্‌বক্সে গিয়ে ঢুকেছে।

রফিক কম্বলটাকে তালগোল পাকিয়ে বেঞ্চের ওপর আছড়ে ফেলে বলে, চল রে কমলাকান্ত, শালাকে ধ'রে নিয়ে আসি। দেখি শালার কতটা ভয় আর কতটা লজ্জা হয়েছে।

হুড়মুড় ক'রে রফিক, কমলাকান্ত আর সুকুমার বেরিয়ে যায় কামরা থেকে।

বিকাশের বিছানায় উঠে এসে সনত সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরে বলে, একটু সামলে নিতে হবে বিকাশ। যদি হাবিলদার মেজরকে সত্যিসত্যিই এই কামরায় নিয়ে আসে, তাহলে কিন্তু ওর ওপর অত্যাচারও করতে পারে।

সিগারেট ধরিয়ে জানলার ওপর ঝুঁকে পড়ে বিকাশ বাইরের দিকে চেয়েই ব'লে যায়, তা যদি একটু আধটু ঝাল ঝেড়ে নেয়, মন্দ কি। আমি তো তাতে দোষের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এই তো জলন্ধরে এসেও তোমাকে ফাঁসাবার তাল করেছিল। তুমি জান না, রফিকের কি রাগ ওই হাবিলদার মেজরের ওপর।

সেইটা জানি বলেই তো আমার এত ভাবনা, ব'লে সনত সিগারেটে টান দেয়। পরপর কয়েকটা বিলম্বিত টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, এ আক্রোশের সার্থকতা ছিল যতদিন মিলিটারীতে ছিলাম। কিন্তু আজ তো আর এ আক্রোশের কোন সার্থকতা নেই। ওই হাবিলদার মেজর এখন নিছক একজন অজানা অচেনা রাস্তার লোক। ওকে এখন আঘাত করলে, শুধু ওই মানুষটাকেই আঘাত করা হবে, ও যে যন্ত্রের একটা অংগ ছিল, সে যন্ত্রের ওপর কোন ঘা'ই লাগবে না।

সবার আগে রফিক, তার পেছনে কমলাকান্ত আর সুকুমার বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে, মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে উঠে এলো কামরায়।

রফিক বললো, বুঝলে বিকাশ, হাবিলদার মেজর সাহেব দেখলাম

ভয়ে আর লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন।

সুকুমার সমবেদনা জানায়, এমন করে বললে যে আর জোর করতে পারলাম না।

কমলাকান্ত আবার বিছানা পাততে সুরু করে বললে, এই কথাটা যদি ভদ্দরলোকের আগে মনে পড়তো, তাহলে বেচারাকে আজ আমাদের সামনে অমন ক'রে হাত জোড় করতে হত না।

ট্রেণে হেঁচকা লাগে। আমেরিকান ডাব্লিউ, ডি ইঞ্জিনের ভাঙা গলার বিকট আওয়াজে সকলে চমকে ওঠে। মুহূর্তের তরে সকলেই থতমত খেয়ে যায়। কেন যেন সৈনিক জীবনের সুরুতে প্রথম মুভ্ করার ক্ষণটির কথা আচম্বিতে মনে পড়ে যায়। হৃদয়ভরা উদ্বেলতা, বুকভরা কান্না আর চোখভরা জল নিয়ে সেদিন তারা আকাশ বাতাস, গাছপালা, এই পৃথিবীর ধূলিকণাটির কাছেও বিদায় চেয়েছিল! সে ছিল এক অসহনীয় আবেগময় মুহূর্ত!

কিন্তু আজ! আজ তো তারা মুক্ত! তারা আজ ফিরে যাচ্ছে তাদের গৃহে গৃহে।

আর, সি, মেলের গতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। হঠাৎ পাঁচু-গোপাল সশব্দে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে, তাহলে সনতদা, এই নরক থেকে মুক্তি পেলাম!

এ কথার উত্তর দিল না কেউই। হয়তো ওই একই কথা সকলের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল।

আর, সি, মেল চলতে থাকে। চলে অবিরাম গতিতে। আর চলবেও আরও দেড়দিন ধ'রে।

তাড়া নেই কোন কিছুরই। উদ্বেগও নেই কারও। সকলেই বেশ গোছগাছ করে শুয়ে পড়েছে। রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে জলন্ধরের কোন এক হোটেলে। আর খাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য বড় একটা করেনি কেউই। সামি কাবাব দিয়ে সুরু করে বিরিয়াণী, রওগন্‌জোস, জরদা, এমন কি ফিরনি পর্যন্ত বাদ দেয়নি। জলন্ধরের হোটেলওয়ালারা লোক চেনে। তাই দরাজ গলায় মেনু হেঁকে গেছে, না চাইতেই প্লেটের

পর প্লেট টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছে। ওরা জানে, এ মানুষগুলো মুখের একটু রুচীর জন্যে দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মতই কাঙাল।

খাওয়ার শেষে বিলের অঙ্ক দেখে চমকে উঠেছে। এ রকম অবস্থায় যে এর আগে কখনও পড়েনি, তা নয়। কিন্তু তখন চমকে উঠতো না। সে সময়ে জীবনটাই ছিল বাজি-ধরা। যেখানে জীবনের জন্যে মায়া নেই, সেখানে পয়সার হিসেব কেউই করেনি।

কিন্তু আজ যা পকেটে আছে, তা যে নতুন করে জীবন সুরু করার পাথেয়। আছে অবশ্য মোটা মোটা টাকা সকলেরই পকেটে। যে স্তরের মানুষ তারা, সেদিক দিয়ে পাঁচশো কি সাতশো টাকা নিশ্চয়ই মোটা টাকা। ওই-ই তো তাদের পাঁচ বছরের সৈনিক জীবনের সঞ্চয়। ওরই মধ্যে আছে সরকারী ডেফার্ড পে, সৈনিক জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছাপ্পান্ন দিনের মাইনে খেসারৎ।

কি একটা স্টেশনের ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে আর, সি, মেল। ক্রসিঙের ওপর দিয়ে চলা চাকার শব্দ কেন যেন সচকিত করে তোলে সকলকে। হয়তো নিরাপত্তার প্রশ্ন মনের গহন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, হয়তো জন্মাচ্ছে জীবনের ওপর মায়া! বাজি-ধরা জীবনকে না খুইয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মমতা হয়তো সজাগ ক'রে তোলে মানুষগুলোকে।

যুদ্ধের শেষ হয়েছে প্রায় এক বছর। কিন্তু তার জের এখনও মেটেনি। অত বড় গাড়ীখানার মধ্যে আলো নেই একটাও। কিন্তু এতেই বোধহয় সকলেই খুশী। নিজের মনের মত করে ভাবতে পারছে নিজেদের কথা। আর সে কথা ভাবতে গিয়ে যদিই বা মুখে কোন ব্যথার ছায়া পড়ে অথবা আনন্দের আতিশয্যে একটু বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার জন্যে কারও দৃষ্টির অনুসন্ধিৎসা বরদাস্ত করতে হবে না।

পাঁচুগোপাল বিছানার ওপর উঠে ব'সে বিড়ি ধরায়। বিড়ি সিগারেটের আগুন আরও কয়েকটা রয়েছে। হঠাৎ সকলেই কেমন যেন স্তব্ধ, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নিরালা নিঝুম গাড়ীটায় দোলানি লাগছে। খোলা জানলাগুলো দিয়ে হুহু করে হাওয়া ঢুকছে।

সকলেই জেগে আছে। তবুও কেউ কথা সুরু করে না। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে বিড়ি সিগারেটের আগুনগুলো জোনাকির মত জ্বলছে আর নিভছে। তারই দিকে অলস দৃষ্টিতে চোখ মেলে আছে সকলেই। সকলেই ক্লান্ত, নিজের কথা ভেবে ভেবে শ্রান্ত, অবসন্ন। অভূতপূর্ব যে আনন্দের প্রত্যাশায় গতকাল রাতে তারা বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে, সে আনন্দ কোথায়! মুক্তির আনন্দ কই!

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে পাঁচুগোপাল সনতকে সম্বোধন করে, সনতদা জেগে আছো?

সনত উত্তর দেয়, আছি ভাই।

—তোমার বোধহয় ঘুম আসছে না?

পাঁচুগোপালের প্রশ্নে সনত চমকে ওঠে। অন্ধকার কামরার কৃপায় সে চমক কারও চোখে পড়ে না। সনত সহজ স্বরে উত্তর দেয়, না, এখনও তো ঘুম পাচ্ছে না।

পাঁচুগোপাল বলে, আমারও না।

—কেন বলতো? পাঁচুগোপালের কথায় সনত প্রশ্ন না ক'রে পারে না।

পাঁচুগোপাল উত্তর দেয়, কেন জানি না, মনটা আমার কেমন যেন খারাপ লাগছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এই যে ফিরে যাচ্ছি, আর তো ফিরে আসতে হবে না!

পাঁচুগোপালের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ রফিক খেঁকিয়ে ওঠে, এখানকার জন্যে তোমার পরাণটা এত পুড়ছে কেন শুনি?

—পরাণ পুড়ছে কিনা ঠিক বলতে পারছি না রফিক, পাঁচুগোপাল যেন ক্লান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, কিন্তু খোঁয়াড়ের গরুর মত এখন যেন মনে হচ্ছে খোঁয়াড়টাই ছিল ভাল।

কমলাকান্ত সহানুভূতির স্বরে বললো, তোর যদি এতই মায়া পড়ে গিয়েছিল, তাহলে সার্ভিস্ ডেফার করলি না কেন?

—মুস্কিল তো সেইখানেই, পাঁচুগোপাল ধীরে ধীরে বলে, তাও তো পারলাম না। আবার ছাড়া পেয়েও তো তেমন খুশী হতে পারছি না।

সহর্ষ গৃহ প্রত্যাবর্তনের পথে বিষাদের এমন চোরাবালি যে থাকতে পারে, পাঁচুগোপালের মত করে আর কেউ সে কথা হয়তো ভাবছিল

না। খুশী হয়েছিল সকলেই। সে খুশীর মূলে ছিল সৈনিক জীবনের তিক্ততা থেকে মুক্তি, পদে পদে মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে মুক্তি, প্রতি মুহূর্তের হুকুমবরদারি থেকে মুক্তি।

মুক্তি তো হল। তার পর!

সে কথা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে ভেবেছে। সে ভাবনাটা সাধারণত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। কিন্তু সবার বড় ভাবনা যেটা বুকের মধ্যেকার ধুক্‌ধুকুনির মত সব সময়ে মাথার মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল, সেটা হচ্ছে, বেকার হয়েই তো আবার বাড়ী ফিরতে হচ্ছে।

কাজেই প্রথম কথা মনে এসেছে, রোজগারের সমস্যা। পকেটে যে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট রয়েছে, আর তাতে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের ঠিকানা লিখে দেওয়া আছে, তার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে মনের কোথায় যেন বারম্বার হোঁচট খেতে হচ্ছে। মনের মধ্যে গেঁথে থাকা রিক্রুটিং অফিসারের ভর্তি করার সময়কার মুখস্ত বলে যাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি, 'চাকরী আপনাদের জন্যে রিজার্ভ করে রাখা হবে', তার ওপর কেন যেন কিছুতেই কোন ভরসা রাখা যাচ্ছে না।

মিলিটারীতে ঢুকে একটি জিনিষের ওপর ভরসা ছিল অনেকখানি, সে হচ্ছে মৃত্যুর নিশ্চয়তা। তাই মিলিটারীতে জীবন ছিল অবাধ আর দুর্বার, ভাবনা চিন্তার বালাই ছিল বড়ই কম। কিন্তু বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে মন শঙ্কিত আর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকাটা সহজ ব্যাপার নয়, আর বাঁচতে হলে ভাবনা চিন্তারও প্রয়োজন আছে।

তাই প্রশ্ন উঠেছে মনোজগৎ নিয়ে। যে মানুষগুলোর মনের খবর গত পাঁচ বছর ধরে দুনিয়ার অগোচর হয়ে গিয়েছিল -যাদের অস্তিত্বের পরিমাপ হত নিছক সংখ্যায়- যারা ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, রাইফেল, স্টেন গানের সমপর্যায়ে পড়ে গিয়েছিল—যাদের মনের খবর কেউ রাখেনি, রাখবার চেষ্টা করেনি, হয়তো প্রয়োজনও মনে করেনি—সেই মানুষগুলো ভাবছে, তাদেরও মন বিকল হয়ে উঠেছে!

পাঁচুগোপালের কথার ওপর আর কথা বলে না কেউই! রফিক গোছগাছ করে পাশ ফিরে শুলো। কমলাকান্ত পা দুটো দিলে ছড়িয়ে।

সামনের দিকে ঝুঁকে পাঁচুগোপাল কিছুক্ষণ যেন অপেক্ষা করে। তারপর ধীরে ধীরে আড়ামোড়া ভেঙে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মাথার তলায় দুটি হাতের পাতা জড় করে।

আরও একটা স্টেশন থ্রুপাস্ করে যায় আর, সি, মেল।

বিকাশ শোয়নি। জানলায় হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে থেকে হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে গায়ে। তখনও হাওয়া ঠান্ডা হয়নি। পাঞ্জাবের গরম, তার তাপের মাত্রা বাংলা দেশের ছেলের গায়ে একটু বেশী বেঁধে। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এতক্ষণে আঁধিতে বহে নিয়ে যাওয়া ধুলোর রাশী আকাশ ছেড়ে নামছে মাটিতে।

বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে ভালই লাগছে বিকাশের। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত গমের ক্ষেত, তার বুক জুড়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু কখনও ক্বচিৎ একটা আলো চোখে পড়ে গ্রামের মেটে বাড়ীগুলোর কোন একটা ঘর থেকে। ট্রেণের গতি আর আঁকাবাঁকা পথ কখন হারিয়ে দেয় ছোট্ট সেই এক কুচি আলো।

চোখে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। দিনের দেখা ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। অন্ধকার রাত্রি যেন হয়ে ওঠে রৌদ্র-ময়ী। ক্ষেতের মাঝে মাঝে কুয়া, তাকে কেন্দ্র করে এক মহিষ ঘুরছে বৃত্তাকারে কাঁধে জোয়াল নিয়ে। আর ছোট্ট একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে দৈর্ঘ্যে তার চেয়ে বড় প্রকান্ড এক লাঠি নিয়ে ওই বিরাটকায় জানোয়ারটাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিকাশ ভেবে পায় না, ওই মহিষ ঘুরে ঘুরে কুয়া থেকে যে জলটুকু তুলবে, তাইতেই ফসল ফলবে! আরও তার বিস্ময় জাগে, যখন দেখে এই অজলা দেশে ফসল তো সুজলা সোনার বাংলা থেকে কিছুই কম হয় না!

বিকাশও গ্রামের ছেলে.........

গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল ম্যাট্রিক পাশ করার পর ইণ্টারমিডিয়েট

পড়তে। তখন তার বয়েস সতেরো কি আঠারো। গ্রাম সুবাদে আত্মীয় নীতিশবাবুর বাসায় দু'মাস কাটতে না কাটতে আত্মীয়তার জটিলতা আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। দোষ বোধহয় নীতিশবাবুরও ছিল না। মানুষ তাঁরা সকলেই ভাল। বিয়ে-থা করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর-করা নিছক একজন ছা-পোষা মানুষ হচ্ছেন তিনি।

কেরাণীগিরি করার উপযোগী সর্বনিম্ন বিদ্যেবুদ্ধি থাকলেও অর্থ-নীতির যে পেনিয়নটার পাকেপাকে সমাজজীবনের কাঁটা ঘোরে, সে রহস্য বুঝবার মত কারিগরী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় নীতিশবাবুকে দেয়নি। আর স্বকৃত প্রচেষ্টায় বুঝবার উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব সুরু করার আগেই তিনি সংসারের টানা-জালে আটকা পড়ে গেছেন।

সময়টা উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল।

আর সমস্যাটা ওই সালের বাজার দর নিয়ে। মাসিক দশ টাকায় একজনকে বাড়ীর ছেলের মত আদরে যত্নে খেতে এবং থাকতে দেওয়া আর বোধহয় সম্ভব হচ্ছিল না নীতিশবাবুর পক্ষে। তিনি মাস-মাহিনার চাকুরে সদাগরী আপিসে। সস্ত্রীক দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে, মাসে মাসে যথাসময়ে বাসা ভাড়া দিয়ে যাট টাকা রোজগারে যে যুগে একটা সংসার কায়ক্লেশে চলে যেত, সে স্বর্ণ যুগের তখন অন্তিম দশা।

নতুন এই যুগের সাইরেনে গ্রাসধ্বনির আর্তনাদ বিকাশের কানে যায়নি। সে তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে। স্বপ্ন, স্বপ্ন আর স্বপ্ন -এই ই তো জীবন। জীবনের পাখা মেলে ঈগলের মত ছোঁ মেরে তুলে নেবে তার ঈপ্সিতকে। এমন জীবনবেদে দৈনিক বাজারদরের উত্থান পতন সম্পর্কে কোন সতর্কই স্থান পায়নি।

কাজেই বারম্বার টাকার কথার মত ছেঁদো কথায় বিকাশ চটতে লাগল। যদিও সে মনেপ্রাণে চাইছিল নীতিশবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান-টুকু থেকে বঞ্চিত না করতে; তবুও, বিশেষ করে ইদানিং লোকটাকে আর যেন সে সহ্য করতে পারছিল না। ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত লোকটি মূর্তিমান একঘেয়েমী। সকালে থলে হাতে বাজারে যাওয়া এবং ফিরে এসে বাজারদর নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ

আলোচনা, আপিস থেকে ফিরে বড়, ছোট, মেজ সাহেবের কথা, আর রাতে শোওয়ার আগে হিসাবের খাতা—এই নিয়ে কি একটা মানুষের জীবনের সমস্তখানি জুড়ে থাকতে পারে!

দেশ থেকে বিকাশের মাস-বরাদ্দ সর্বসাকুল্যে কুড়ি টাকা। তারই মধ্যে খাই খরচ, কলেজের মাইনে এবং বিবিধও। এই টাকাতেই হয়তো বিয়াল্লিশ সাল পড়বার আগে একজন পরিশ্রমী ছাত্রের কলকাতায় থেকে পড়াশুনা চলে যেত। কিন্তু বিয়াল্লিশ সাল তার সুরু থেকে যে বিপর্যয় সঙ্গে করে উদয় হ'ল, তাতে বিকাশের মত সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এক ভাবে-ভরা মানুষের পক্ষে গা-ভাসিয়ে চলার চেয়ে গায়ে আগুনের আঁচটাই লাগতে লাগলো বেশী।

নীতিশবাবুর স্ত্রী স্নেহলতা স্বামীর কথা সবই বোঝেন, আবার বিকাশের কথাও বুঝতে তাঁর কোনই অসুবিধে হয় না। স্বামী বেচারী একার রোজগারে এই মাগ্গিগণ্ডার দিনে চালানই বা কি করে! কিন্তু বিকাশেরই কি বয়েস হয়েছে এইসব সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর! বাছার বয়েসই বা কত, আর বুদ্ধিশুদ্ধিই বা কতটা!

এ সব ছাড়াও আরও বেশী কিছু বোঝেন স্নেহলতা। বিকাশ পথের ভিখারী নয় বা নিছক অপোগণ্ডও নয়। দেশে জমিজমা, বাড়ী-ঘর সবই আছে। তার ওপর আবার একটা পাস দিয়ে শহরে এসেছে কলেজে পড়তে। আরও একটা কি দুটো পাস দিতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! ভাল একটা চাকরী তার মারে কে! মেয়ের বয়েস যে তেরো পার হয়ে চোদ্দয় পড়লো, সে খবর নীতিশবাবু না রাখলেও স্নেহলতা একদণ্ডের জন্যেও ভোলেন নি। বিশেষ করে বিকাশ তাঁদের বাসায় এসে ওঠার পর থেকে মেয়ের বয়েস সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়েছেন অনেক বেশী, সকল দিক থেকেই। শুধুই তো তাঁর টাকার হিসেব রাখলে চলে না। সব ক'টা মানুষের মনের হিসাবও যে তাঁকে রাখতে হয়।

একদিন বিকাশকে আড়ালে ডেকে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহলতা বললেন, সবই তো বুঝতে পারছ বাবা, তোমায় আর বেশী কথা কি বলব। তুমিই তো এ বাড়ীর বড় ছেলে। এক কাজ কর না

কেন, এখানকার মাগ্‌গিগণ্ডার কথা জানিয়ে মাসিমাকে লেখ্‌ তোমার মাসোহারাটা আর দশটাকা বাড়িয়ে দিতে।

বিকাশ যেন হালে পানি পেল। আপন মনে সে গজগজ ক'রে মরছিল। রাগ করে কম খাচ্ছিল, আর খিদেয় ছট্‌ফট্‌ করছিল। স্নেহ-লতার কাছ থেকে উঠে গিয়ে তখনি মাকে চিঠি লিখতে বসলো।

স্নেহলতার কথায় সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে যত সহজ আর সরল মনে হয়েছিল, চিঠি লিখতে ব'সে প্রথম বয়ানটুকু সেরে নেওয়ার পর কিন্তু তার কপাল ঘেমে উঠতে লাগলো। মায়ের কাছে টাকার কথা লিখতে গিয়ে তার কলমের কালি বারম্বার শুকিয়ে যেতে লাগলো।

চিঠির উত্তর যখন এলো তখন বিকাশ রাগে. ক্ষোভে, দুঃখে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। সে লিখেছিল মাত্র পাঁচটা টাকা বাড়াতে। ঠিক করেছিল, ওই পাঁচটা টাকা নীতিশবাবুর হাতে ফেলে দিয়ে এই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

উত্তরে মা জানিয়েছেন, এই খরচই তিনি আর জোগাড় ক'রে উঠতে পারছেন না। হয়তো আর দু'চার মাসের মধ্যে মাসোহারার এই টাকাটাও বন্ধ করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে সে যেন অন্যত্র কোথাও থাকার বন্দোবস্ত করে নেয়। নীতিশবাবুর গলগ্রহ হয়ে সে থাকবে, এটা তিনি চান না। অন্যত্র থেকে একবেলা খেয়েও সে যেন পড়া চালিয়ে যায়। মানুষ তাকে হতেই হবে।

কেন জানি বিকাশের মনে হয়েছিল, মায়ের চিঠিখানা স্নেহলতাকে দেখানো যায় না। কিন্তু চিঠিখানা নিয়ে সে-ই বা করবে কি! তার মনে হচ্ছিল, সেই মুহূর্তেই কারও কাছ থেকে দুটো সান্ত্বনার কথা, একটু সহানুভূতি, কিছু পরামর্শ না পেলে সে বোধহয় পাগল হয়ে যাবে।

সোজা গিয়ে তেরো পার হয়ে চোদ্দয়-পড়া মেয়ে মায়ার হাতে চিঠি-খানা গুঁজে দিয়ে বললে, প'ড়ে দেখো।

পরিস্থিতি অনুযায়ী যথোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে মায়া চিঠি-খানা আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললে। তারপর বিকাশকে প্রশ্ন করলে, তাহলে কি হবে?

বিকাশ বললে, কেন! এখান থেকে চলে গিয়ে থাকবো কোন বাড়ীর

গাড়ী বারান্দার তলায়, আর টাটার মত ছুঁচ বিক্রী করবো।

মায়া ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি। আর বিকাশও যে পরিস্থিতিটা সঠিক বুঝেছিল, তাও নয়। তবুও মায়ার কাছে তার নির্ভীক মনের খানিকটা আত্মপরিচয় দিয়েই সে খুশী হয়েছিল।

দিন দুই-তিন যাওয়ার পর নীতিশবাবু মায়ার ওপর হুকুম জারি করলেন, বিকাশের কাছে তুই পড়বি না। আর স্বগত উক্তি করেছিলেন, ওই সময়টা যদি অন্য কাকেও পড়ায়, তাহলে অন্তত ছ'টা কি আটটা টাকা তো রোজগার করতে পারে।

মায়া বিকাশকে বাপের স্বগতোক্তিটাই বলেছিল নিজের না-পড়ার কৈফিয়ৎ হিসাবে।

বিকাশ কিন্তু এইটাকেই তার ওপর নোটিশ মনে করে কলকাতা শহরের সবচেয়ে সস্তা মেস্-এর সন্ধান করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

স্নেহলতা প্রমাদ গুনলেন। স্বামীর কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলবো-বলবো করেও এতদিন বলা হয়নি। আর এ ঘটনার পর বলবার স্পৃহা শুধু নয়, সাহসও উবে গেল। পনেরো বছর স্বামীর ঘর করে তিনি এটুকু বুঝেছেন যে. তাঁর স্বামী আর যার কথাই শুনুন না কেন, তাঁর কথার বিপরীত কাজটাই আগেভাগে করবেন।

পরিস্থিতি যতই তাপ সঞ্চয় করতে থাকে, মা আর মেয়ে ততই বিকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে মায়ের কাছ থেকে আভাষ পেয়ে মায়াই একদিন বিকাশকে ও-বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলে।

মানুষের মনের গতি আর প্রকৃতিকে জানবার বা বুঝবার মত অবকাশ কতটুকুই বা পেয়েছে বিকাশ। পড়ার টেবিলে বসে থাকা অবস্থায় চেয়ার থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বিকাশ চোখ কুঁচকে মায়ার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সেই অবসরে বোধহয় সবচেয়ে চোখা-চোখা কথাগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু বিকাশকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই মায়া ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভাবে-ভরা ফানুস বিকাশ চুপসে যায়। চলেই যখন যেতে বলছে,

তখন আবার কান্না কিসের জন্যে। অপার বিস্ময়ে সে চেয়ে থাকে মায়ার কান্নাভরা মুখখানার দিকে। দু'চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ধারে নেমে আসছে অশ্রুর বন্যা, পাতলা ঠোঁট দুটো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে, কখনও যাচ্ছে কুঁকড়ে। নরম নরম দুটি হাতে তাকে টেনে নিয়েছে বুকের মধ্যে। থেকে থেকে তার বুকের মধ্যে মুখটা ঘষছে আর বিড়বিড় করে অনর্গল কি যেন সব বলে যাচ্ছে।

বিকাশ মায়ার মুখখানা তুলে ধরল।

মায়া পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বিকাশের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, বল, বল তুমি, যখনই তোমার ইচ্ছে হবে, আসবে। আর রোজ অন্তত একবার তুমি আসবেই।

মুখের কথায় উত্তর না দিয়ে বিকাশ গভীর এক চুম্বন এ'কে দিয়েছিল মায়ার ওষ্ঠাধরে।

তারপর বিকাশ বীরপুরুষের মতই ও-বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছে। সবচেয়ে সস্তার মেস্‌-এর অনুসন্ধানের বদলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কোন মেস্‌-এ সীট্‌ পাওয়া যায়, সেইটাই তখন তার প্রধানতম সমস্যা।

অবশেষে মেস্‌-এ সীটও পাওয়া গেল। বিকাশ বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিলে।

নীতিশবাবুর গোমড়া মুখ আর স্নেহলতার ছলছলে চোখের কাছে বিদায় নিয়ে বিকাশ যখন তার বিছানা আর সুটকেসটা রিক্সার ওপর তুলে দিচ্ছিল, তখন স্নেহলতা এগিয়ে এসে বললেন, যখনই সুবিধে পাবে, এসো বাবা। তোমার মেসোমাসিকে ভুলো না যেন।

নিরুত্তর বিকাশ যখন নীতিশবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবে বৈকি। এসে দেখে যাবে অভাব মানুষের স্বভাব কেমন করে নষ্ট করে।

আপ্লুত মন আর ছলছল চোখে বিকাশ মুখ তুলে তাকালো। দেখলে, স্নেহলতার চোখ দুটি রীতিমত জলে ভরা। নীতিশবাবুর চোখও আর্দ্র। বাচ্চা দুটো বিস্ময়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের দিকে।

কিন্তু এই বিদায় পর্বের মধ্যে মায়া এসে দাঁড়ায় নি!

সমাধান যে একটা হয়ে গেল, এ কথা মনে করে বিকাশ, মায়া, এমন কি স্নেহলতাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু জীবন কারও চললো না, যে যেমনটি ভেবেছিল, তেমনভাবে।

বিকাশ দেখলো জীবন তার আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মাস-কাবারি মেস্-এর টাকা দিতে গিয়ে কলেজের মাইনেতে টান পড়ে। আর কলেজের মাইনে চুকিয়ে দিলে মাসের শেষে মেস্-এর ম্যানেজারের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয়। টিউশনির চেষ্টা করতে গিয়ে নতুন খবর তার কাছে এসে পেঁছায়, ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িকে শহর ছেড়ে স্কুলের ছেলেমেয়েরা দেশে-গাঁয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

আরও দেখে বিকাশ, তার চলে আসাতেই নীতিশবাবুর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। তাঁর বাড়ীর ব্যবস্থা প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। মায়ার স্কুল যাওয়া বন্ধ হল। ছোটদের দুধের বরাদ্দ কমতে সুরু করলো। এতদিনে সে বুঝতে পারে, নীতিশবাবুকে যতখানি অর্থপিশাচ বলে তার মনে হয়েছিল, আসলে তিনি তা ন'ন।

বিকাশের জীবনের সমস্যা ঘনতর হয়ে আসে। পড়াশুনা ছেড়ে সে দেশে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কিসের আশায়! সে তো হবে তারই পরাজয়। শহরের ওই বিচিত্র জীবন, উদার পরিবেশ ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা মনে হলে তার কান্না পায়। আর গ্রামে ফিরে গিয়ে তার প্রধান যে সমস্যা, তার সমাধানই বা হবে কতটুকু!

আর এ সমস্ত কিছুর ওপরে মায়া। দিনান্তে তাকে একবার চোখের দেখা না দেখলে, মেস্-এর চৌকিতে শুয়ে ঘুমই যে আসতে চায় না। জলভরা চোখ আর অভিমানে থম্‌থমে মায়ার মুখখানি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে তার বুকের ওপর!

সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে বিকাশ আর মায়ার মধ্যে। দু'জনে মিলে গম্ভীর মুখে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গল্পে মেতে ওঠে। সে গল্প তাদের মিলিত জীবনের জল্পনা কল্পনা। সতেরো আর চোদ্দ বছর বয়েস সাংসারিক আর অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর

সময় নয়। সে যেন রঙিন ফানুস, হাওয়ার কাঁপনে কেবল দুলবে, হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে, খুসীর জোয়ারে পাল তুলে দিয়ে খেয়ালের সাগরে পাড়ি জমাবে!

মায়া চেয়েছে লুকিয়ে গায়ের গহনা খুলে দিতে, বিকাশ বাধা দিয়েছে।

বিকাশ চেয়েছে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চাকরী করতে, মায়া বাধা দিয়েছে।

মেস্-এ ফেরার পথে বিকাশকে মায়া লুকিয়ে খানিকটা খাইয়ে দিয়েছে। বোধহয় সে মনে করতো, মেস্-এ কম খেলে মাসকাবারি টাকাও কম লাগবে।

কি একটা স্টেশনে এসে আর. সি, মেল্ দাঁড়িয়ে পড়ে।

স্টেশনটা নিশ্চয়ই বড় যখন একটা মেল-ট্রেণ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্টেশনের চেহারা দেখে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। প্ল্যাটফরমে কয়েকটা মাত্র আলো, তখনও তার ঢাকনি খোলা হয়নি। স্টেশন মাষ্টারের ঘরে ঢুকবার দরজায় এখনও সেই ব্যাফ্ল্ ওয়াল্, হয়তো ভাঙার হুকুম হয়নি। স্টেশনের নাম তখনও কোথাও লেখা হয়নি।

এক বছর হতে চললো যুদ্ধ থেমেছে, কিন্তু স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসেনি তখনও।

জনমানবশূন্য স্টেশনে গাড়ীটা রয়েছে দাঁড়িয়ে। কোথাও কোন সাড়া জাগেনি। একটা ভেন্ডারের হাঁক কানে আসছে না, এমন কি প্রচণ্ড এই গ্রীস্মের রাতে একজন পানি-পাঁড়েও নেই।

বিকাশ জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখবার চেষ্টা করে। আন্দাজ করবার চেষ্টা করে, স্টেশনটা কি হতে পারে। লুধিয়ানা, আম্বালা, কয়েকটা বড়বড় স্টেশনের নামই কেবল মনে আসে। কিন্তু এমন একজনও নেই যাকে জিজ্ঞেস করবে।

এ ট্রেণের মানুষেরা দূরপাল্লার যাত্রী, কাজেই কেউ নামছে না। আর উঠছেও না যখন কেউই, তখন এটা ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশন নিশ্চয়ই নয়।

হঠাৎ দূর থেকে ঠুক্-ঠুক্ করে একটা শব্দ ধীরে, অতি ধীরে এগিয়ে আসছে। বিকাশ জানলার ওপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে শব্দ-টাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। দূরে দেখা যায় নীল কোর্তা-পরা একটা লোক লম্বা একটা লাঠির ডগায় ছোট্ট একটা হাতুড়ি লাগিয়ে প্রতিটি চাকার গায়ে ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলেছে ইঞ্জিনের দিকে।

বিকাশ যেন আপন মনেই বলে ওঠে, দুনিয়ার সকলেই কি আমাদের ত্যাগ করেছে!

পাশে লম্বা হয়ে শুয়েছিল সনত। সেও, সম্ভবত আপন মনেই ব'লে উঠলো, হয়তো তাই।

বিকাশ তখনও জানলার ওপর দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। নীল কোর্তাধারী সেই মানুষটাকে সে তখনও চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করছে।

সনত উঠে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলে, রাত কত হ'ল বিকাশ?

বিকাশ নিস্পৃহভাবে উত্তর দেয়, বারোটা থেকে চারটের মধ্যে যে কোন একটা হবে।

উঠে এসে সনত বিকাশের পাশে বসলো। তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলে, কি এত ভাবছ বিকাশ?

—কি জানি! গাড়ীতে উঠে পর্যন্ত ভেবেই চলেছি। কি যে এত ভাবছি তা আমি তোমায় গুছিয়ে বলতে পারবো না।

সিগারেট ধরিয়ে সনত বললে, কেমন যেন ফুরিয়ে গেছি, না?

সনতের হাতটা গভীর আবেগে চেপে ধরে বিকাশ বলে ওঠে, ঠিক বলেছ সনতদা, সত্যিই ফুরিয়ে গেছি। আখমাড়া কলে যেমন করে সমস্ত রস নিঙড়ে নেয়, ঠিক যেন তেমনই মনে হচ্ছে নিজেকে। ওঃ, কি ক্লান্তি যে লাগছে! অবসাদে সমস্ত দেহমন যেন ভেঙে পড়ছে! এতক্ষণের মধ্যে কতবার যে ভেবেছি, শুয়ে পড়ি। কিন্তু ওইটুকু কাজ যেন আর কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।

—অথচ মনে হচ্ছে, একবার শুয়ে পড়লে বোধহয় আর কোনদিনই উঠে দাঁড়াতে পারবো না, সনত বিকাশের কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দেয়।

আবার বিকাশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ঠিক তাই। আমি তো ভাবছি,

বাড়ী ফিরে মাসখানেক কেবল শুয়ে থাকবো, বাড়ীর চৌকাঠ আর ডিঙোবো না।

গাড়ীতে ঝাঁকানি লাগে। ধীরে ধীরে গড়াতে সুরু করে ট্রেণখানা। ব্রেক চেপে ধরা কোন একটা চাকা অনাদ্যন্ত কোঁকাতে থাকে। স্টেশনের ঝাপসা আলো ধীরে ধীরে পেছনে মিলিয়ে যেতে থাকে। সামনে কেবল জমাট বাঁধা নিরেট অন্ধকার।

নিষ্প্রদীপ কামরার মধ্যে নানান জনের নিদ্রিত শ্বাস-প্রশ্বাসের মিশ্র কলরব। কারও কারও নাক ডাকছে বিচিত্র শব্দ করে। আর কে যেন স্বপ্নে কথা বলে চলেছে একটানা বিড়বিড় করে।

সনত বললে, সিগারেট খাবে বিকাশ?

—দাও, বিকাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সনত দিয়াসালাই জেবলে ধরিয়ে দেয় বিকাশের ঠোঁটে লেগে থাকা সিগারেটটা। সেই স্বল্প আলোয় দেখা গেল, কমলাকান্ত পাশ ফিরে শুচ্ছে।

আর শোনা যায় নিদ্রিত রফিকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, শালা হাবিলদার মেজর!

বিকাশ হেসে ওঠে।

সনত বললে, না বিকাশ, হেসো না। রফিকের মতই ওই রকম জ্বালাধরা আক্রোশ আমাদের প্রত্যেকেরই মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধেছে। এইটাই সম্বল ক'রে আমরা বাড়ি ফিরছি।

—কিন্তু এ-আক্রোশ আমরা ফলাবো কার ওপর? হেসে প্রশ্ন করে বিকাশ।

—প্রথমেই নিজেদের ওপর, তারপর বাড়ির লোকের ওপর। আমাদের এই রুক্ষ, শুষ্ক, আক্রোশ-ভরা মন নিয়ে আমাদের গৃহকেই আমরা বিষিয়ে তুলবো।

বিকাশ কথা বলে না।

সনত সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দেয়। তারপর যেন আপন মনেই বলে চলে, জানো বিকাশ, আমিও ঘুমোতে পারলাম না। বারবার পাঁচুগোপালের কথাটা মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগলো। ভাব-

ছিলাম, সত্যিই তো, আরতো আমাদের ফিরতে হবে না। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে বিকাশ, আমার মনে কি প্রশ্ন জাগছিল জানো?

বিকাশ কোনই প্রশ্ন করলো না। শুধু আরও একটু সোজা হয়ে বসলো। সে জানে সনত তার জানতে চাওয়ার অপেক্ষায় থাকবে না।

ক্ষণেক চুপ ক'রে থেকে সনত বলতে থাকে, তাহলে যাবো কোথায়? তুমিই বল, কোথায় যাবো? জীবনের শুরু হওয়ার আগেই ঢুকলাম মিলিটারীতে। বাড়ীতে বাবা, মা, ভাইবোন, সবই আছে। তাদের প্রতি কর্তব্য আছে বটে, কিন্তু জীবন কই? কিসের জন্যে ফিরে যাবো, কোন আরব্ধ কাজকে অসমাপ্ত রেখে এসেছি বল? বাড়ীর প্রতি কর্তব্যের কথা যদি বল, সে তো এই পৃথিবীর যে-কোন এক প্রান্ত থেকে, যে-কোন ধরনের কাজের বিনিময়ে যথেষ্ট টাকা পাঠাতে পারলেই হ'ল!

এবার বিকাশ কথা বলে, এটা কিন্তু তোমার মনের সত্যিকার কথা নয় সনতদা।

—হয়তো তাই, সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে সনত, এখন আমার তাই-ই মনে হচ্ছে। তবুও এই কথাই এতক্ষণ ধ'রে ভেবেছি। পাঁচুগোপালটা কেমন যেন আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু বিকাশ, একটা ভয় আমার অনেকদিন ধরেই ক'রে আসছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা যেন আর মানুষ নই। কেমন যেন কিম্ভুতকিমাকার হয়ে গেছি। মিলিটারীতে যতদিন ছিলাম, ততদিন বাড়ীর পানে চেয়ে বেঁচে ছিলাম। ভাবতাম, বাড়ী ফিরে যাবো, আবার জীবনকে গড়ে তুলবো, আবার ফিরে আসবে জীবনের স্বাদ। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে যায় সনত। গভীর মমতায় সিগারেটটা চেপে ধরে দুটি ঠোঁটের মাঝখানে। ঠিক টান দেয় না, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু ধোঁয়া গিয়ে পৌঁছায় গলায়। বাইরের অন্ধকারের ওপর চোখ রেখে আবার সেই আনমনা সুরে বলে যায়, ফিরছি তো বেকার হয়ে আর মনের এই অদ্ভুত অবস্থা নিয়ে। পারবো কি খাপ খাওয়াতে নতুন এই পরিস্থিতি আর পরিবেশের সঙ্গে।

বিকাশ সনতের মুখটা দেখতে পায় না। তবুও তার চোখের ওপর ভাসছে সনতের সুন্দর মুখখানা। সনতের মুখখানা তখনই সুন্দর হয়,

যখন কোন কিছুর জন্যে ব্যথায় ওর মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে। চোখের মণিদুটো যায় স্থির হয়ে, চোখটা সজলতায় চক্‌চক্ করে আর বুকের মধ্যে যেন কান্নার দাপাদাপি চলে।

সনতের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বিকাশ বলে, আমার কিন্তু ওসব কথা মনে হয়নি সনতদা। আমি ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম, যেভাবে আমার জীবনটা জটিল হয়ে উঠেছে, তার জট্ খুলবো কি করে!

সনতের কণ্ঠস্বর হাল্কা হয়ে ওঠে, তুমি ভাগ্যবান বিকাশ। তোমার জীবনে জটিলতা আছে। একটা একটা করে জট্ তুমি খুলবে, তোমার জীবনের পরিধিও চলবে বেড়ে। কিন্তু আমার জীবনের গতিটা এতই সরল রেখায় যে, তার শেষপ্রান্তটুকু সব সময়েই চোখে পড়ে।

বিকাশ প্রশ্ন করলো. ফিরে গিয়ে তুমি কি করবে সনতদা?

—চাকরীর চেষ্টা, উত্তর দেওয়ার জন্যে সনতকে এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না।

—সে তো হল পেট ভরানোর ব্যবস্থা। কিন্তু তোমার মনটাকে কি দিয়ে ভরিয়ে রাখবে?

—মনের ব্যাপার নিয়ে আমার খুব মাথাব্যথা নেই বিকাশ। তোমাদের নিয়েই আমার দিনগুলো বেশ কেটে যাবে।

বিকাশ বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হঠাৎ তার নজরে পড়ে পূব আকাশের দিগন্তরেখায় খুব ফিকে সবুজ আলোর আভাষ।

আর. সি. মেল্ তখন ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে বিশাল এক প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে—তার চাকায় আর লাইনে বেজে চলেছে অপরূপ এক ছন্দ।

দুই

পাথুরেঘাটা স্ট্রীটটা বিকাশের অজানা। শহর-জীবনের প্রথম পর্বে কলকাতার আদিমতম এই অঞ্চলটায় আসায় তার প্রয়োজন পড়েনি। নীতিশবাবুর বাসা ছিল বেলেঘাটা অঞ্চলে. আর সে পড়ত বঙ্গবাসী কলেজে।

পাথুরেঘাটার হদিস জানবার জন্যে সে স্মরণাপন্ন হয়েছিল সনতের। সনত অন্তত তার চেয়ে বেশী দিন কলকাতার বাসিন্দা।

সনতের এঁকে-দেওয়া ছক ধরে খুঁজে নিতে বিকাশের কোন অসুবিধে হয়নি। নম্বর খুঁজতে খুঁজতে যে বাড়ীটার সামনে এসে সে দাঁড়াল, সে-বাড়ীর সঙ্গে নম্বরের মিলটাই যেন তার কাছে আরও বিভ্রান্তিকর।

রাস্তা ছেড়ে একটা চাপা গলি। গলির দু'ধারে বাড়ীগুলো যেন ওপরে উঠে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে খাড়া হয়ে আছে। বাড়ীগুলোর একতলায় সারি সারি দরজা, তার কোনটা দিয়ে যে ভেতরে যাওয়ার পথ, সেইটা সঠিকভাবে বুঝে নিতে খানিকটা সময় লেগে গেল। কাঁধের ওপর কিট্ব্যাগের বোঝাটায় ঘাড় টনটনিয়ে উঠেছে।

বাচ্চা একটা মেয়ে শালপাতার ঠোঙায় তেলেভাজা নিয়ে ফিরছিল। বিকাশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অপার বিস্ময়ে একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলে।

বিকাশ ওই মেয়েটিকেই জিজ্ঞেস করলে, বিমলবাবু এই বাড়ীতে থাকেন ?

মেয়েটি সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আপনাতে আপনিই উছলে উঠল, ওঃ, আজ বুঝি আপনার আসবার কথা ছিল মিলিটারী থেকে। আসুন—হন্‌হন্ করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে যে দরজাটা বিকাশ সামনে পেল তার মধ্যে একটা পা গলিয়ে দিয়ে আবার টেনে নিলে। প্রথমত, বোঁচকা ঘাড়ে করে ওই দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে না। দ্বিতীয়ত, সামনেটা অন্ধকার ঘুট্‌-ঘুট্ করছে, আর সর্বোপরি, যে উৎকট গন্ধ তার নাকে এল, তাতে তার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে, সে একটি পায়খানার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল।

কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়! খানিকটা পেছিয়ে এসে বিকাশ অন্য দরজাগুলোকেও আরও একবার দেখে নেয়। সব দরজারই এক মাপ!

কিন্তু এ-কথাও তার মনে হচ্ছে না যে মেয়েটিকে অনুসরণ করতে সে ভুল করেছে।

চোখ টান করে বিকাশ আরও খানিকক্ষণ সময় সেই দরজার মধ্যে দিয়ে চেয়ে থাকে। গাঢ় অন্ধকারের পেছনে যেন একটু আলোর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে! তবুও সে ইতস্তত করছে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না। বেলা প্রায় দশটার সময় কলকাতা শহরের একটি বাড়ীর এই কি প্রবেশ পথ!

প্রবেশ পথের অপর প্রান্ত থেকে একটা কোলাহল এগিয়ে আসছে। সুহাসিনীর কণ্ঠস্বর চিনতে বিকাশের কোনই অসুবিধে হয় না, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরও চিনতে পারে সেই মেয়েটির কাকলি।

দু'পা এগিয়ে যায় অন্ধকারের মধ্যে দরজার তলা দিয়ে নিচু হয়ে। ততক্ষণে সুহাসিনী সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেটা বিকাশ বুঝতে পারে মায়ের হাতের স্পর্শে—সেই নরম নরম হাতদুটো অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ঠিকই তার মাথা, মুখ, বুক স্নেহের স্পর্শে নিষিক্ত করে দিচ্ছে।

বিকাশকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সুহাসিনী বললেন, তুই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস বিকাশ, তা একবার তো ডাকতে হয়।

ওই ভেপসা অন্ধকারের মধ্যে বিকাশ মায়ের মুখখানাও দেখতে পায় না, কেবল চোখে পড়ে তাঁর সাদা থানখানা।

হেসে বিকাশ বললে, মা এটাতো আমাদের খলিলপুর নয়, এটা শহর কলকাতা। এখানে ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করা চলে না। এখানে নক্ করতে হয়।

সুহাসিনী এগুবার উদ্যোগ করে বললেন, হ্যাঃ, সেই রকম বাড়ী কিনা। নে, তুই আয়—

আন্দাজ করে মায়ের পেছনে পেছনে বিকাশ আলোয় এসে দাঁড়ায়। আবার তার চোখে ধাঁধাঁ লাগে। আলো থেকে অন্ধকার, আবার অন্ধকার থেকে আলো। বিকাশ অনুনয় করে, এক মিনিট দাঁড়াও মা, চোখটা একটু সইয়ে নি।

প্রবেশ পথ ভেদ করে যেখানটায় এসে বিকাশ দাঁড়াল, সে-জায়গাটা

হচ্ছে চৌকো মাপের এক প্রশস্ত উঠোন। ঠিক তার অপর প্রান্ত দিয়ে উঠে গেছে দোতলায় ওঠার সরু এক ফালি সিঁড়ি। উঠোনকে ঘিরে তিনদিকে সারি সারি ঘর। আর সিঁড়ির তলায় কলতলা।

মোটটাকে কাঁধ বদল করে নিয়ে বিকাশ উঠোনের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে থতমত খেয়ে যায়। কলতলায় এক যুবতি স্নান করছেন। স্নানরতা যুবতির পরণে শুধুই একখানি পাতলা শাড়ী, আর সে-শাড়ী সম্পূর্ণ সিক্ত। সিক্তবসনার সৌন্দর্য আঁকা-ছবিতে সে অনেক দেখেছে বটে, কিন্তু এমনভাবে সামনা-সামনি, মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানের মধ্যে দেখার কল্পনাও সে করেনি কোনদিন।

সিক্ত-বসনা ঘুরে বসে সুহাসিনীকে প্রশ্ন করলেন, এই বুঝি আপনার সেই ছেলে মাসিমা?

সুহাসিনী তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিরক্তিভরে বিকাশকে বললেন, আয় বিকাশ, তাড়াতাড়ি উঠে আয়।

বিকাশ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। দোতলার প্ল্যানও এক-তলারই অনুরূপ। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই খানিকটা ছাদ। তারপর উঠোনের ফাঁকটুকুকে ঘিরে তিন দিকে সারি সারি ঘর। ঘরের কোলে হাত-দেড়েক আন্দাজ বারান্দা।

দক্ষিণের বারান্দা পার হয়ে পশ্চিমের সারির প্রথম ঘরখানা তাদের। সুহাসিনী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেতরে গিয়ে বস।

ঘরের মধ্যে ঢুকবার আগে বিকাশের কাঁধ থেকে বোঁচকাটা নামিয়ে নিলে তার ছোট ভাই প্রকাশ।

মাথা থেকে মণ্টি-ক্যাপ্‌টা খুলে নিয়ে বিকাশ চৌকাঠের ওপর বসে পড়ল। জুতো খোলা অর্থাৎ একজোড়া বুট খোলা তো রীতিমত এক পর্ব। তার জন্যে খানিকটা প্রস্তুতি চাই।

প্রকাশ বললে, বাইরে বস না। ভেতরে গিয়ে জুতো খোলো। আর দেয়ালের গায়ে পেরেক পোঁতা আছে, তাইতে ঝুলিয়ে রাখ।

ঘরের মধ্যে ঢুকে একখানা মাদুর দেখে বিকাশ যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে গিয়ে বসে পড়ে। বাড়ীর দোরগোড়া থেকে এই ঘরটার মধ্যে এসে পেঁছুতে যেন অনেকখানি সময় কেটে গেছে, আর তার পরিশ্রমও

হয়েছে অমানুষিক! জুতাশুন্ধ পা মাদুরের বাইরে রেখে হাতদুটো ছড়িয়ে দিলে পেছনের দিকে, আর সেই হাতের ওপর দেহের ভর ছেড়ে দিয়ে চোখদুটো বুজিয়ে রাখে গভীর ক্লান্তিতে।

ক্ষণেকের তরে বুজিয়ে-রাখা চোখের ওপর ভেসে উঠল এমন এক দৃশ্য, যাতে বিকাশ রীতিমত চমকে উঠল। সদ্য দেখে-আসা সেই সিক্ত-বসনার দেহের অস্থি-সন্ধি যেন এক পলকের মধ্যে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার চমকে ওঠাটা বুঝতে না দেওয়ার জন্যে বিকাশ শরীরের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসে জুতো খুলতে সুরু করলে। বুটের ফিতে খুলতে খুলতে তার অনতিদূরে দেখতে পেল আরও দুখানি পা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা তুলে সে ওই পা দুখানির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ওই নরম নরম ছোট্ট পা দুখানিকে সে চেনে বড় নিবিড়ভাবে। ওই সুঠাম পা দুখানি নিয়ে যত আদর, যত সোহাগ সে করেছে, অত বোধহয় আস্ত মানুষটাকেও করেনি।

ওই পা দুখানিকে একটু স্পর্শ করার লোভ যেন বিকাশকে পেয়ে বসে। সে ধীরে ধীরে একটা হাত সেই দিকে বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু পা দুখানি চকিতে চঞ্চল গতিতে সরে যায়।

জুতো খোলা হয়ে গেলে ফিস্‌ফিসানি একটা স্বর বিকাশের কানে এল, তুমি মাদুরের ওপর পা তুলে বস, আমি জুতো জোড়া ঠিক করে রাখছি।

বিকাশ মুখ তুলে তাকায়। ঘরের ওই পূব-মুখো দরজা ছাড়া আর একটি ছোট্ট জানলা আছে ওই পূবদিকেই। সেই জানলাটাকে পেছনে রেখে মায়া দাঁড়িয়ে আছে জড়সড় হয়ে, প্রায় নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে।

সুহাসিনী কি কারণে আবার নিচে নেমে গেছেন। প্রকাশ বারান্দার রেলিঙের ওপর হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের দিকে চেয়ে।

বিকাশ মায়ার এ-রূপ কখনো দেখেনি। এমন ব্রীড়াবনতা, শরম-কুণ্ঠিতা, সলজ্জ নববধূর রূপে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি।

বিয়েটা সে করেছিল মায়ের অমতে। তাই নীতিশবাবুর বাসার

যুদ্ধের দিনে এক ব্ল্যাক-আউটের সন্ধ্যায় শুভকাজটা নিতান্তই নমঃ নমঃ করে সারা হয়েছিল। একমাত্র মন্ত্রের কোন ছাঁট-কাট না করে, আর সমস্ত ব্যাপারেই ছিল যুদ্ধকালিনতার ছাপ। কাজেই নীতিশবাবুর দু'চারজন আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর বিকাশের দু'একজন বন্ধু ছাড়া লোক সমাগমের কোন বালাই ছিল না। তাই বিবাহ থেকে ফুলশয্যার দিন পর্যন্ত এমন কেউ তাদের মাঝখানে ছিল না, যাদের সম্মানার্থেও অন্তত মায়াকে কিছুটা ঘোমটা দিতে হবে বা বিকাশকে অপেক্ষা করতে হবে বিশেষ একটা সময়ের জন্য, যখন সে মায়ার কাছে আসতে পারবে বা মায়াকে কাছে পাবে।

বিকাশ হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠে বললে, তা তুমি অমন কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন! আজ তো আর আমাদের ফুলশয্যা হচ্ছে না।

খুশীর হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মায়ার। ধীরে ধীরে মাদুরের এক কোণে বসে বললে, মা বলেছেন খুব সাবধান হয়ে চলতে। এ যা বাড়ী!

হঠাৎ বিকাশের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। বিশেষ একটি দৃশ্য এবার ওর খোলা চোখের ওপরই ভেসে ওঠে। রাগে তার সমস্ত শরীর রী রী করে ওঠে। ঘুরে বসে মায়ার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মায়া, তুমিও কি ওই কলতলায় স্নান কর নাকি?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় মায়া ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বিকাশের মুখের দিকে।

বিকাশের ভাষা তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। আবার প্রশ্ন করে, অবগাহনরতা যে সুন্দরীটিকে এখনই দেখে এলাম কলতলায়, ওইভাবে তুমিও স্নান কর নাকি ওইখানেই?

এতক্ষণে মায়ার হৃদয়ঙ্গম হয় বিকাশের প্রশ্ন। বললে, এ-বাড়ীর ওই একটিই কলতলা। আর আমি কিভাবে স্নান করি সেটা না হয় তুমি কাল নিজের চোখেই দেখ।

মাদুরের ওপর থেকে হাত-পাখাটা তুলে নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বিকাশ বললে, তুমি রাগ কর না মায়া। বাড়ীতে ঢোকার সুরু থেকে

এই ঘরে এসে মাদুরের ওপর বসা পর্যন্ত যে-সব ঘটনা ঘটল আর যে-সব দৃশ্য দেখলাম, তাতে মেজাজটা ভাল হয়ে ওঠার কথা নয়। সেই জলন্ধর থেকে স্বপ্ন দেখতে দেখতে আসছি, বাড়ী ফিরছি, আমাদের নিজের বাসা, যেখানে তুমি আছ, সেখানে সবই না-জানি কত সুন্দর! কিন্তু এই কি তার নমুনা!

হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে ওঠে মায়া। কি যেন সে বলতে গিয়েও সামলে নেয়। মুখখানা তার আরক্ত হয়ে ওঠে। পাখাটা ছিনিয়ে নেয় বিকাশের হাত থেকে। অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালাতে সুরু করে দেয় পাখাখানা।

বিকাশ মুখ তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করে, কি হল?

শুষ্ক স্বরে জবাব দেয় মায়া, কিছুই না।

বিকাশ ডাকে, মায়া!

চমকে উঠে বিস্ফারিত চোখে মায়া চেয়ে থাকে বিকাশের দিকে। ও-ডাক তার বড় চেনা, ও-ডাক শুনলে বুকের মধ্যেটা তার কেমন যেন করে ওঠে।

বিকাশের কণ্ঠস্বর ফিরে গেছে পাঁচ বছর পেছনে. তাদের বিবাহ-পূর্ব জীবনে। যখন মায়া তার পথ চেয়ে আকুলি-বিকুলি করতো। আর বিকাশ নিত্য দুঃসংবাদ বহন করে এনে একে একে উজাড় করে দিত মায়ার কাছে। সমস্ত কথা বলা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিকাশ হঠাৎ ডেকে উঠতো, মায়া!

সে-ডাকে কি থাকতো, মায়া বুঝতো কি বুঝতো না. সেটা কোন প্রশ্নই নয়। সেই মুহূর্তে মায়া নিজেকে বিকাশের বুকের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠতো। বিকাশের ওই ডাকে অন্য কোনভাবে সাড়া দেওয়ার কোন উপায় আছে কিনা, মায়া ভেবেও দেখতো না।

আজও বিকাশের কণ্ঠে সেই একই ডাক। তেমনই অসহায় আর ততখানিই করুণ!

মায়ার দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে আসে গালের ওপর।

বিকাশ হাতটা বাড়িয়ে দেয় মায়ার দিকে। চায় তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে।

কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে আসছেন সুহাসিনী ছাদ পার হয়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ। দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। চোখ দুটোকে তুলে ছেড়ে দেয় দৃষ্টিটাকে। দরজা পার হয়ে, বারান্দা পার হয়ে, ছাদ ডিঙিয়ে দৃষ্টি গিয়ে আটকে যায় কোন এক ধনির বাড়ীর সারি সারি পামগাছের নুয়ে-পড়া পাতার আনাচ-কানাচ দিয়ে এক টুকরো আকাশের গায়ে।

সুহাসিনী সামনে এসে বলেন, কইরে, জামা-কাপড় ছাড়্। বৌমা গেল কোথায়।

বিকাশ দরজার সামনে থেকে সরে এসে বললে, তুমি মায়াকে বৌমা বল কেন মা, ওকে তুমি নাম ধরে ডেকো।

প্রায়-জড়সড় মায়ার দিকে চেয়ে সুহাসিনী বললেন, আচ্ছা, সে না হয় দেখা যাবেখন। তুই তো জামা-কাপড় ছাড়। যা মুখহাত ধুয়ে আয়। বন্দনা তোর জন্যে চা আর জলখাবার নিয়ে আসছে।

বিকাশ বললে, কই ছোড়দিকে তো দেখলাম না।

সুহাসিনী বললেন, ওরা পেয়েছে ঠিক এরই নিচের ঘরখানা।

জামাটা খুলে মায়ার এগিয়ে-দেওয়া দু-ভাঁজ করা একটা ছেঁড়া ধুতি লুঙ্গির মত করে পরে নিয়ে বিকাশ বললে, হাতমুখ কি নিচের ওই কলতলায় গিয়ে ধুয়ে আসতে হবে?

সুহাসিনী হেসে বলেন, না রে না, এই দরজার সামনেই এক বালতি জল তোলা আছে, আর তার পাশেই আছে নর্দমা।

বাইরে যেতে গিয়ে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিকাশ প্রশ্ন করল, বাড়ীটি জোগাড় করল কে?

—কে আর আমার জন্যে কলকাতায় বাড়ী খুঁজতে যাবে বল্, সুহাসিনী সহজভাবেই উত্তর দেন, ওই বিমল কি কম কান্ড করে এই ঘর দুটো জোগাড় করেছে।

সুহাসিনীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিকাশ বলে ওঠে, তা ঠিকই হয়েছে। যেমন লোক, বাসাও ঠিক তেমনই জোগাড় করেছেন!

সুহাসিনী হঠাৎ যেন আঁতকে ওঠেন, বিকাশ!

বিকাশও চমকে ওঠে মায়ের আর্তস্বরে। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে মায়ের ব্যথায় মুচড়ে দুমড়ে যাওয়া মুখখানার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নেয়।

বন্দনা তখন ছাদ পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে। তার হাতে বিকাশের চা আর জলখাবার।

বছর আষ্টেক আগেকার কথা......

সুহাসিনী তখন সদ্য বিধবা হয়েছেন তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। বন্দনা, বিকাশ আর প্রকাশের মুখ চেয়ে চোখের জল মুছেছেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের শুভানুধ্যায়ীতার প্রকোপে সেদিন তাঁকে স্বামীশোকও ভুলতে হয়েছিল।

বিকাশ আর প্রকাশ তখন স্কুলে পড়ে। কিন্তু বন্দনাকে পড়ানোর মত স্কুল ওই গ্রামে ছিল না। আর তার দরকারও পড়েনি। পিতার কাছে বন্দনা হাতেখড়ি থেকে লেখাপড়া করে এসেছে। তিনি মেয়ের বিয়েব চিন্তার চেয়ে তার লেখাপড়ার ভাবনাটাই ভাবতেন বেশী। তাঁর বড় সাধ ছিল মেয়েকে ম্যাট্রিক পাস করাবেন।

এহেন সময়ে বিমল দেশে ফিরে যায় কলকাতা থেকে পিতাকে জমিদাবী সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে। বিমল সুহাসিনীর খুড়তুতো ভাসুরপো। একই জমিদারীর সরিক, কিন্তু ভিন্ন তাঁরা পিতামহের আমল থেকে। পারিবারিক জীবনেও কিছুটা দূরত্ব এসে গিয়েছিল হাঁড়ির পৃথকতার জন্যে। কিন্তু বাস একই চৌহদ্দির মধ্যে।

বিমল গ্রামের মানুষ হয়েও গ্রামে মানুষ হয়নি। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেই চলে আসে কলকাতায় উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। একাদিক্রমে চার বছর গ্রামের বাইরে থাকার জন্যে গ্রামে মন-না-বসার অপবাদ বরাবরই কুড়িয়ে এসেছে। বি.এ পাস করার পর প্রথমে চাকরীর চেষ্টা করেছে। কিন্তু চাকুরীজগতের সেটা স্বর্ণযুগ না হওয়ায় কিসের নাকি এক কারবার ফেঁদে বসে। শহরেই থাকে বেশী, গ্রামে যায় নিতান্তই ন'মাসে-ছ'মাসে। গ্রামের মানুষ সোজাসুজি বুঝে নিয়েছিল, শহরের

কোন ডাইনী নিশ্চয়ই সুপুরুষ বিমলকে গিলে ফেলেছে।

সেবারই দেশে ফিরে বিমল দেখে, তারই বাড়ীতে বসে জল্পনা-কল্পনা চলেছে সুহাসিনীকে তাঁর তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে সমেত পথে বসানোর। বাপের জমিদারী বুদ্ধি আর অপত্য স্নেহের তারিফ না করে বিমল বেঁকে দাঁড়ালো। নিজেই উপযাচক হয়ে সুহাসিনীকে তাঁর নাবালক ছেলেমেয়ের একমাত্র অভিভাবিকা হিসাবে আদালতে আইনত প্রতিষ্ঠা করল। শহরের কুশিক্ষা একটা মানুষকে যে কতদূর গোল্লায় নিয়ে যেতে পারে, সেটা বিমল তার পিতা এবং অসংখ্য হিতাকাঙ্খিদের কাছে আরও একদফা সপ্রমাণ করল।

এই সময়টায় বিমল বেশ কিছুদিন গ্রামে ছিল। আর সুহাসিনীর জমিদারীর ব্যাপার নিয়ে তদারক করতে গিয়ে তাঁর কাছে বেশ খানিকটা স্নেহভাজন হয়ে পড়েছিল। স্বামীর অপূর্ণ সাধের কথা তিনি কোন-দিনই ভোলেন নি। বিমলকে কাছে পেয়ে তিনি যেন আবার নতুন করে আশার আলো দেখতে পেলেন। স্বামীর সাধের কথা বিমলকে জানিয়ে তিনি বন্দনাকে পড়ানোর ভার তার হাতে তুলে দিলেন। বন্দনা তখন গ্রামের মেয়ে হিসেবে রীতিমত যুবতী, অর্থাৎ ষোলয় পা দিয়েছে।

এরই ফাঁকে কয়েক দিনের জন্য বিমল কলকাতায় ঘুরে আসে। তারপর যখন সে গ্রাম ছাড়ে, তখন সে একা যায়নি—বন্দনাকেও সঙ্গে নিয়েছিল। তারপর বিমল আর বন্দনা কলকাতার জনারণ্যে পঙ্গপালের দলে মিশে যায়। গ্রামের মানুষেরা বহু চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে বার করতে পারেনি।

ব্যাপারটা এতই অভাবনীয় আর আকস্মিক যে প্রথম কয়েকদিন কেউই এমন একটা রসালো ঘটনা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে লাগল দিনের পর দিন পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর মুখও খুলতে লাগল গ্রামের মানুষের, বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনের। দোষটা সবটাই সুহাসিনীর; কারণ তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিবি বানাতে চেয়েছিলেন! মুখে খৈ ফুটতে লাগল তাদের, যাদের বাড়া-ভাতে বিমল ছাই দিয়ে গেছে সুহাসিনীকে সম্পত্তির ব্যাপারে স্বাব-লম্বী করে দিয়ে।

বিপদে নাকি বন্ধুর অভাব হয়! কিন্তু সুহাসিনীর ক্ষেত্রে এ মহা-জন বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হল। সৎপরামর্শ দেওয়ার জন্যে নানান রকমের লোক আনাগোনা করতে লাগল অযাচিতভাবে। বিমলের শহুরে শিক্ষার কদর্যতার ওপর কটাক্ষ করে তাঁরাই পরামর্শ দিলেন, মেয়েকে ফুসলে বার করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে বিমলের নামে মামলা ঠুকে দিতে।

এই সব সজ্জনদের হয়তো আশা ছিল সম্পত্তির সরিকানা নিয়ে বিবাদটা আবার বেশ পাকিয়ে উঠবে সুহাসিনীকে শিখণ্ডি খাড়া করে।

কিন্তু এক কথায় সুহাসিনী সমস্তটাই মাটি করে দিলেন, আইন-আদালত দিয়ে মানুষের মনকে শাসন করা যায় না। আমি আদালতে যাব না।

বাড়ী বয়ে এসে অপমান, ছেলেদুটোকে পথেঘাটে অপমান নিত্য-নৈমিত্যিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। বিকাশ তখন বড় হয়েছে, বছর চোদ্দ তার বয়স। নিজের চেয়ে মায়ের অপমান তার গায়ে বেঁধে বেশী।

সুহাসিনী তখন কাঠ হয়ে গেছেন। কোন ব্যথা যে তাঁকে এমন অসাড় করে ফেলেছে, সেইটাই তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

সময় কেটে যায়। গায়ের ঝাল আশ মিটিয়ে ঝেড়ে নিয়ে নতুন আর কিছু করার না পেয়ে আত্মীয়স্বজন আর শুভানুধ্যায়ীরা ঝিমিয়ে পড়েন। আবার যেন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসতে থাকে।

বছর দেড়েক আগেকার কথা......

বিকাশ সেদিন ওয়ার-লিভ্-এ দেশে ফিরছে। মিলিটারী পোষাকে ট্রেণে চলাফেরা করা ফৌজি শাস্ত্রের অনুশাসন। বিকাশ নাল্ লাগানো বুটের আওয়াজ তুলে শিয়ালদা মেন্ স্টেশন থেকে বেরোচ্ছিল। টিকিট-ঘরের সামনে একেবারে বিমলের মুখোমুখি।

থতমত কে খেয়ে যায় বলা শক্ত। হয়তো দুজনেই দারুণ চমকে উঠেছিল। কিন্তু বিমূঢ় ভাবটাকে প্রথম কাটিয়ে ওঠে বিকাশ। তড়িৎ বেগে বিমলের কব্জিটা সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধ'রে গর্জে ওঠে, ছোড়দি কোথায়?

বিমল আমতা আমতা করে বলে, বাসায়।

—কোথায় বাসা?

—চল নিয়ে যাচ্ছি।

তখন শহরে ব্ল্যাক-আউট। নির্জন অন্ধকার একটা রাস্তা দিয়ে চলেছে বিকাশ আর বিমল। দুজনেই নির্বাক। বিমলের হাত কখন যেন বিকাশ ছেড়ে দিয়েছে। খোয়া-ঢালা রাস্তায় তার বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে খট্-খট্-খট্। বিমল চলেছে বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে মাঝে মাঝে কয়েক ধাপ দৌড়ে নিয়ে। বিকাশ তার গতি কমাতে পারছে না।

হঠাৎ একটা ঠুলি-লাগানো গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ে বিকাশ বলে ওঠে, কেন আপনি এমন কাণ্ড করলেন বিমলদা?

বিমল বিকাশের করুণ মুখখানার দিকে বারেক চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। অতি দীণ কণ্ঠে বলে, না করে উপায় ছিল না বিকাশ। ও ছাড়া আর পথ পাইনি।

—তার মানে!

—তার মানে, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। না পারছিলাম দেশে-গাঁয়ের ওই জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ্ খাওয়াতে, আবার শহরেও নির্বান্ধব হয়ে থাকতে ভয় করছিল। আমি চেয়েছিলাম একটি দরদী মন। সমস্ত কথাই বন্দনাকে বলেছিলাম।

—একটি ছেলেমানুষ মেয়ের কাছে নাকে-কান্না কাঁদলে আর তার মন গলবে না! আর তারই সুযোগ নিয়ে এমন একটা কেলেংকারী করে বসলেন।

—অত কথা ভেবে উঠতে পারিনি বিকাশ। বন্দনাকে বড় ভাল লেগেছিল। ওর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম সুন্দর একটা মন। মনে হয়েছিল, ও আমার ব্যথা বুঝবে, আমার সঙ্গে তার জীবনকে গড়ে তুলতে পারবে। তাই ওর সঙ্গে আত্মীয়তার কথা, খুড়িমার কথা, তোমাদের কথা, সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম।

ফ্যাকাশে মুখে বিকাশ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিমলের মুখের দিকে। গ্যাসের আবছায়া আলো এসে পড়েছে তার পীতাভ

ফর্সা মুখখানার ওপর। মনে হচ্ছে যেন মার্বেল পাথরে কুঁদে বার করা একখানা মুখ মণিহীন চোখের কোটর থেকে তার দিকে চেয়ে আছে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে।

একে একে মনে পড়ে বিকাশের, তার দুর্জয় প্রতীজ্ঞাগুলো। কোনদিনই সে এই মানুষটাকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু আজ যখন সে পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে, পেয়েছে তাকে তারই হাতের মুঠোর মধ্যে, তখন নিজেকেই কেমন যেন তার দুর্বল মনে হতে থাকে। কি সে এখন করতে পারে ওই মানুষটাকে নিয়ে।

—আচ্ছা চলুন, বলেই বিকাশ আবার হাঁটতে সুরু করেছে। কিন্তু তখন আর তার নেই আগেকার সেই গতি!

বিমলও হাঁটতে থাকে বিকাশের পাশে পাশে।

এঁদো একটা গলির মধ্যে ঢুকে খোলার চালের একসারি ঘরের সামনে এসে বিমল একটা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

বিকাশ খপ্ করে বিমলের একটা হাত ধরে ফেলে বলে ওঠে, ছোড়দিকে এনে এখানে তুলেছেন?

—আমার সামর্থে এর চেয়ে ভাল বাসা নেওয়ার মত ক্ষমতা নেই বিকাশ।

বিকাশের তখন নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। বাঁ হাতে পিথ্-হ্যাট্টাকে ঠেলে দেয় খানিকটা পেছনে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তা যদি নেই, তবে প্রাণে এত সাধই বা কেন!

—আমার সাধ ছিল সুখী হওয়ার, ভাল বাড়ীতে বাস করার নয়।

—তাই নাকি! শ্লেষের ঝাঁঝে বিকাশের স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে, তাহলে তো বলতে হয়, আপনি একটা মহৎ কাজ করেছেন!

বিমলের মুখখানা আবার পাথরের মত কঠিন হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, এত কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত অন্যায় কাজ করেছি বলে আমার মনে হয় না বিকাশ। তোমাদের মনে আঘাত দিয়েছি, তার জন্যে ব্যথা আমার মনে সব সময়েই রয়েছে। কিন্তু আজ তুমি নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়ে আমার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে উঠবে, সেটা আমি মেনে নিতে পারছি না।

রাগে অন্ধ হয়ে যায় বিকাশ। হঠাৎ বিমলের একটা হাত ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে, ওসব বড় বড় কথা রেখে দিন। একটা স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার। আমি আপনাকে পুলিশে দেব।

নিশ্ছিদ্র ওই অন্ধকারের মধ্যে বিমলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, রাগে, দুঃখে, অপমানে, না কৌতুকে, বিকাশ কিছুই বুঝতে পারে না।

বিমলের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ও কাজটা করবার চেষ্টা ক'র না বিকাশ. তাতে তোমাকে তোমার ছোড়দির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আদালতের কাঠগড়ায়।

—কেন! তাকে বিয়ে করেছেন বলে!

—না সেইটাই সব নয়। তার চেয়েও অনেক বড় ব্যাপার আছে। সে-সব কথা তোমার এই মন নিয়ে বুঝতে পারবে না। তবে এইটুকু জেনে রাখো, বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে আজও করা হয়ে ওঠেনি।

—কেন? রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে বিকাশ।

—তার উত্তর হল, বন্দনার সঙ্গে ছেলেখেলা আমি করতে চাই না। কালিঘাটে যে-কোন একদিন গিয়ে পৈতাধারী যে-কোন একটা ভিখারীকে ডেকে তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বিয়ের কাজটা হয়তো সেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সে কাজ করতে আমার বিবেকে বেধেছে। তাই অপেক্ষা করে আছি, যেদিনই. আমাদের এ সম্পর্ককে অন্তর থেকে সমর্থন করে, এমন তিনটি লোক পাব. সেইদিনই আমাদের বিয়েটা রেজেষ্ট্রী করে নেব।

শ্লেষের বিষে বিকাশের মুখখানা যেন নীল হয়ে ওঠে, কদর্যভাবে মুখ বিকৃতি করে বললে. নাটক নভেল আমারও কিছু কিছু পড়া আছে। আর ওসব বুলি আমারও যথেষ্ট জানা আছে। কিন্তু আপনাদের সম্পর্কটা কি? ছোড়দি কি বলে নিজের পরিচয় দেয়?

—সেটা তোমার ছোড়দিকে জিজ্ঞেস কর, বললে বিমল ধীর গম্ভীর গলায়।

হঠাৎ বিকাশ ছুটে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ে প্রচণ্ড জোরে।

ফুটিফাটা চৌচির দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, একটা আলো এগিয়ে আসছে। বিকাশের পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। ঘামে

সমস্ত মুখখানা ভিজে উঠেছে। মাথাটাও যেন টলছে। দু'হাতে সে দরজার একটা চৌকাঠ চেপে ধরেছে।

দরজা খুলেই আঁতকে উঠে দু'পা পেছিয়ে গেল বন্দনা। আতঙ্কিত আর্তনাদ উঠল তার কণ্ঠস্বর থেকে, ও মা, মিলিটারী!

ঝট্ করে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলে বিকাশ বলে উঠল, ছোড়দি, আমি বিকাশ।

—বিকাশ! তুই বিকাশ? এ্যাঁ, বিকাশ! হাতের লম্ফটা ফেলে দিয়ে বন্দনা দৌড়ে চলে গেল ভেতরে।

লম্ফটা মেঝেতে পড়ে বার কয়েক দপ্‌দপ্ করে উঠে নিভে গেল।

বিমল হতভম্ব বিকাশকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে যায়। বলে, সোজা চলে এস বিকাশ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিকাশ অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ করে এগিয়ে চলে। খানিকটা এগিয়ে এসে দেখে, বন্দনা ঘরের দাওয়ার একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর বিমল তার হাত ধরে টানাটানি করছে। ঘরের মধ্যে থেকে খানিকটা আলো এসে পড়েছে দাওয়ায়।

বিকাশ কাছে যেতেই বিমল বললে, ধরে তোল তো, ফিট্ হয়ে গেছে।

দু'জনে ধরাধরি করে বন্দনাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানায়। বিমল জল এনে মাথায়, চোখে, মুখে ছিটিয়ে দেয়। বিকাশ পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে।

বাতাস করতে করতে হঠাৎ বিকাশ চমকে ওঠে। কি যেন একটা নরম-নরম তার একটা পা জড়িয়ে ধরেছে। পা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে দেখে ছোট্ট একটি বাচ্চা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিকাশ চোখ তুলে বিমলের দিকে তাকায়।

বিমল বললে, আমাদের প্রথম সন্তান। দ্বিতীয়টি মারা গেছে। তারপর থেকেই বন্দনার এই অসুখ।

বাচ্চা মেয়েটাকে কোলের ওপর তুলে নেয় বিকাশ। দেয়ালবাতির লালচে আলোয় মুখখানা পরিস্কার দেখা যায় না, কেবল চোখে পড়ে একরাশ কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল।

বিকাশ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাথাভরা চুলের মধ্যে ছোট্ট সেই কচি মুখখানার দিকে।

বিকাশের সেই মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে বাচ্চার চোখ ছাপিয়ে এক ঝলক জল উপছে পড়ে।

বাচ্চার মুখখানা দুটি হাতের মধ্যে নিয়ে বিকাশ তাকে বুকের ওপর চেপে ধরে।

বিমল পাখাটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ায় বিকাশের দিকে।

বিকাশ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। আবার জোরে জোরে পাখা চালাতে থাকে।

বন্দনাকে খুঁজে পাওয়ার খবর সুহাসিনীর মধ্যে যেন আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। যে মানুষ শোকে দুঃখে অপমানে পাথর হয়ে গিয়েছিল, সেই মানুষেরই শীতিলভূত অনুভূতি যেন স্নেহের তাপে দ্রবীভূত হয়ে মহাদেবের জটা থেকে তর্‌তর্‌ বেগে নেমে আসতে থাকে মাটির পৃথিবীতে।

মায়ের এ পরিবর্তনে বিকাশ খুশী হয়। মায়ের অপমানের দিনগুলির কথা বারবার মনে পড়ে, আর সে মায়ের আরও কাছ ঘেঁষে আসে। ধীরে ধীরে বিমলের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বলে যায়।

কোন প্রশ্ন করেন না সুহাসিনী, কেবল শুনে যান বিকাশের প্রতিটি কথা তাঁর সব কয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে। বিকাশের বলা শেষ হলে বলেন, বিমলকে লিখে দে, কলকাতায় আমাদের জন্যে একটা বাসা দেখতে।

ঠিক এতটা তাড়াতাড়ি একটা কিছু ঠিকঠাক করে ফেলার কথা বিকাশ ভাবেনি। বললে, এতই বা তাড়া কিসের মা! আমার তো মিলিটারী মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এ ক'টা দিন না হয় অপেক্ষাই কর না। তারপর ভেবেচিন্তে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন।

কিন্তু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে চান না সুহাসিনী।

মায়া বেঁকে বসল, ছোড়দির সঙ্গে এক বাসায় আমি কিছুতেই থাকব না।

বিকাশ ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে, কেন?

—কেন, সে কথাটা শুধু তোমার ছোড়দি বলেই আর তোমার কাছে স্পষ্ট করে বলতে চাই না।

লজ্জায়, অপমানে বিকাশের মাথাটা ঝুলে পড়ে। সোজাসুজি কিছু না বললেও, মায়া সবই বলেছে। অপমানের খোঁচাটা সবটাই তার গায়ে লাগে। এক মুহূর্তে সে মায়ার কাছ থেকে বহু যোজন দূরে ছিটকে পড়ে।

মুখটা তুলে বিকাশ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকায়। মায়ার মুখখানা থমথম করছে। দুর্বিনীত এক রূঢ়তায় তার মুখখানা কুৎসিত হয়ে উঠেছে।

এই মুহূর্তে যে মায়াকে বিকাশ সামনে দেখছে, সে মায়াকে সে চেনে না। অনেক কথা তার মনে পড়ে। এই মায়াই তাকে গহনা খুলে দিতে চেয়েছে নীতিশবাবুর পাইপয়সার হিসাব রাখা সংসারের মধ্যে বাস করে! সুহাসিনীর অমতের কথা শুনে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছে গৃহত্যাগ করতে! নীতিশবাবুর অমতের উত্তরে সে চেয়েছে তার হাত ধরে এ পৃথিবীর যে কোন এক কোণে চলে যেতে!

তবুও বিকাশ অনুভব করতে পারে, সেই মায়াই এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে অনেক দূরে।

বিকাশ মায়াকে কাছে ডাকে।

মায়া এক পা-ও নড়ে না।

বিকাশ বলে, তুমিও তো একজন মেয়েমানুষ মায়া। মেয়েমানুষের দুঃখে তোমার মন যদি না গলে, তা হলে তার পাশে আজ দাঁড়াবে কে?

মায়া কোন উত্তর দেয় না। হন্‌হন্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ছুটির দিন ফুরিয়ে আসে।

সুহাসিনী ক্রমেই অধৈর্য হয়ে ওঠেন। প্রতিদিনই বিকাশকে তাগাদা দেন, বিমলকে বাড়ী দেখার জন্যে চিঠি লিখতে।

আর মায়া ক্রমশই হয়ে উঠছে কঠিণতর। বিয়ের পর সুদীর্ঘ চোদ্দ-মাস পরে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ যেন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। মায়া নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। কাছে টেনে নিলে তবে বুকের মধ্যে আসে। কিন্তু

বুকের মধ্যে সে তুফান জাগায় না। স্বামীত্বের ফতোয়ার জোরে যা কিছু পাওয়া যায়, সবই পায় বিকা । তবুও সে জলের মত পরিস্কার বুঝতে পারে, কিছুই সে পেলে া. কারণ মানুষটাই রয়ে গেল তার নাগালের বাইরে।

ইচ্ছে করেই বিকাশ আর বন্দনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না। কিন্তু সে বুঝতে পারে, ও ব্যাপারে একটা সমাধান করতে না পারলে তার আর মায়ার মধ্যেকার এই ব্যবধান দূর করা যাবে না।

মায়ের অমতে মায়াকে বিয়ে করার জন্যে সুহাসিনীর মনে যে বিরাগ মায়ার ওপর প্রথম দিকে একটু-আধটু প্রকাশ পেয়েছিল, সময়ের অমোঘ নিয়মে তাঁর ঘা-খাওয়া মন সে বিরাগকে বেশীদিন আঁকড়ে থাকতে পারেনি। কিন্তু বিকাশ সেদিন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে. যখন দেখে তাকে মাঝখানে রেখে মা এবং স্ত্রীর মধ্যেকার এই দুস্তর ব্যবধান। এ দুয়ের বিরোধ সে মেটাবে কেমন করে! এই দুই মনোভাবের মাঝে সেতু বাঁধবে কি দিয়ে!

কিন্তু তারই ওপর নির্ভর করছে তার জীবন। মা আর স্ত্রী। পক্ষ নেওয়ার প্রশ্ন আসে না। জীবন থেকে এদের কাকেও ছেঁটে দেওয়া যায় না। এদের কাকেও বাদ দিতে গেলে জীবনের অঙ্গহানি ঘটে।

কোন সমস্যারই সমাধান করবার চেষ্টা করল না বিকাশ। কেবল নিজেই বুঝবার চেষ্টা করল সমস্ত ব্যাপারটাকে।

এরই ফাঁকে দেখতে দেখতে ছুটির মাত্র ক'টা দিন ফুরিয়ে গেল।

বিকাশ রওণা হবে। মায়া গুছিয়ে দিচ্ছে সুটকেস। পথের খাবার সঙ্গে এনে ঘরের মেঝেয় বসলেন সুহাসিনী।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুহাসিনীই কথাটা পাড়লেন চিঠিটা শেষ পর্যন্ত লিখলি না বিকাশ।

বুটের ওপর পট্টি জড়াতে জড়াতে বিকাশ বললে. কেন মা এমন অধৈর্য হচ্ছ। এতদিন যখন গেছে, আর ক'টা মাস যেতে দাও। এই তো যাওয়ার পথে আবার আমি দেখা করে যাব। টাকাকড়ি দরকার হলে ছোড়দির হাতে কিছু দিয়ে যাবখন।

সুহাসিনী প্রবোধ মানেন না। বলেন, ওরে বিকাশ, মায়ের মন তুই বুঝবি কি করে! তবুও তোর কথাই আমায় শুনতে হবে। তুই যে আমার বড় ছেলে।

বিকাশের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে। মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে দু'ফোঁটা জল গড়িয়েও পড়ে। রুমালটা বার করে চোখ মুছে বিকাশ বলল, ফিরে আসি মা, তোমার কথা মতই বন্দোবস্ত করব।

মা ও ছেলের কথার মাঝখানে হঠাৎ মায়া ফোঁস করে বলে উঠল, তাহলে তার আগে আমারও একটা বন্দোবস্ত কর।

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে বিকাশ।

সুহাসিনী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন. তোমার আবার কিসের বন্দোবস্ত বৌমা!

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মায়া ঘোষণা করে, ছোড়দির সঙ্গে এক বাসায় আমি কিছুতেই থাকব না।

এবার গর্জে ওঠেন সুহাসিনী, কেন শুনি?

মায়ার সমস্ত রাশ যেন আলগা হয়ে গেছে। যে কথা নিয়ে অহরহ সে মনের মধ্যে গুমরে চলেছে, সেই কথাটাই সে নগ্নভাবে প্রকাশ করে ফেলল, আমি ওই নষ্টচরিত্র মেয়েমানুষের সঙ্গে এক সংসারে কিছুতেই থাকব না।

বিকাশ আর্তনাদ করে ওঠে. মায়া!

সে আর্তনাদ ঘরের মধ্যে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে বেড়ায়।

থতমত খেয়ে যায় মায়া। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

বিস্ফারিত চোখে বিকাশ সুহাসিনীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুহাসিনীর মুখখানায় কে যেন তখনই এক পোঁচ কালি লেপে দিয়েছে। মুখের হাড়-গোড়, রক্তমাংস, প্রতিটি পেশী যেন দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বিকাশ ভয় পায়। আতঙ্কে তার সর্বশরীর শির্‌শির্‌ করে ওঠে।

আজ সে ফিরে যাচ্ছে। অনিশ্চিৎ তার এই যাত্রা। আর যাওয়া বা না-যাওয়া কোনটাই তার ইচ্ছাধীন নয়। যেতে তাকে হবেই। না

গেলে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চাকরীতে জুতে দেবে। ফিরে আসা তার হাতে নয়। হয়তো মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছরও কেটে যেতে পারে! যে যুদ্ধের অবসান আজ এত নিকট মনে হচ্ছে, সে যুদ্ধ হয়তো চলতে পারে আরও কয়েক বছর। তার মধ্যে তার মা আর তারই স্ত্রীর বিরোধ হয়তো কটুতর হয়ে উঠবে। তার জীবনের এক অভিশপ্ত ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে শিকড় বিস্তার করবে!

ধীরে ধীরে সুহাসিনী উঠে দাঁড়ান। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন স্থির করেও এক পা এগিয়ে আসেন বিকাশের দিকে। ক্ষণেক তার দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। সমস্ত ঘরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান দরজার দিকে। দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত এসে হঠাৎ তিনি ধরে ফেলেন দরজার একটা পাল্লা। মাথাটা ক্ষণেকের জন্যে ঝুলে পড়ে বুকের ওপর।

বিকাশ ছুটে যায় সুহাসিনীর কাছে। দুটি হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ডাকে, মা!

সুহাসিনী মাথা তুলে তাকান মায়ার দিকে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলেন, মেয়েমানুষের নিজের মুখে সতীপনা ফলানো চলে না বৌমা। পুরুষের মন জুগিয়ে যাদের চলতে হয়, তাদের নিজের ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে পারে না। বন্দনা বোকামী করে থাকতে পারে বটে, কিন্তু অন্যায় সেই কিছুই করেনি।

চৌকাঠের অপর পারে পা বাড়ান সুহাসিনী।

বিকাশ আব্দারের সুরে বলে, ওকে তুমি মায়া বলে ডেকো মা।

তিন

খাওয়া দাওয়ার পালা চুকলে সুহাসিনী সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, টাকাকড়ি তোর হাতে কেমন আছে বিকাশ?

প্রশ্নটা এতই সংক্ষিপ্ত যে উত্তরে কেবল টাকার অঙ্কটা ছাড়া আর অধিক কোন কথার অবতারণা করা যায় না। বিকাশ বলল, শ'পাঁচেক।

সুহাসিনী ক্ষণেক চুপ করে থেকে বললেন, উপস্থিত ওতেই হয়ে যাবে। তারপর তোর চাকরী-বাকরী একটা জুটলে চলে যাবেখন কোন রকমে।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বিকাশ বুঝতে পারে, মনে মনে তিনি যেন কিসের একটা হিসেব করে নিলেন।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিশ্চিন্ততার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন. ওরে বিকাশ, তোর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশেরও একটা কাজ কর্মের চেষ্টা দেখিস বাপু। পড়াশুনা তো জলাঞ্জলি গেল। এখন গতরে খেটে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকলে হয়।

আর বিশেষ কিছু বলার ছিল না সুহাসিনীর। তিনি নিচে নেমে গেলেন বন্দনার ঘরে।

বিকাশের কেমন যেন খটকা লাগে। সবই ঠিকঠাক হয়ে আছে। তার অপেক্ষায় কোন পরিকল্পনা বাকী পড়ে নেই। কেবল যা দরকার টাকার অঙ্কটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার।

গত পাঁচ বছর তো এই ভাবেই চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে তার অস্তিত্বটা গিয়েছে লোপ পেয়ে। সে যে আছে, এ অনুভূতিটা বেঁচে ছিল মাস গেলে ঠিক সময়ে ফ্যামিলি এলটমেণ্টের টাকাটা আসার ওপর। পরিকল্পনা সবই ঠিক করা থাকত. টাকাটা এলে, সেটা ভাগ হয়ে যেত সেই সব পরিকল্পনার খাতে খাতে। কোন ব্যতিক্রম ঘটলে, তখনই সংসারের অচল অবস্থার ফিরিস্তি দিয়ে চিঠি যেত বিকাশের কাছে।

ব্যতিক্রম যে বিকাশের সামরিক জীবনে একেবারেই ঘটেনি, এমন নয়। মায়াকে মায়ের অমতে বিয়ে করে বিকাশ নববধূকে নিয়ে বাড়ীতে এসেই উঠল। সুহাসিনীর বজ্রগম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল তার অন্তরাত্মা। দিনের পর দিন যায়, মায়ের গাম্ভীর্য যেন শিথিল হতে চায় না।

দেখতে দেখতে তার ছুটিও ফুরিয়ে আসে। ফেরার কথা বললেই মায়া কেঁদেকেটে অনর্থ বাধায়। বিকাশও ফিরে যেতে সাহস পায় না, পরিস্থিতিটাকে এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রেখে। সে

জানে, সময়মত কোম্পানিতে ফিরে না যাওয়ার পরিণাম কি। তবুও, জীবনের আসল বনিয়াদ যেখানে, সেখানটা অপলকা রেখে চাকরীকে মজবুত করার কথা তখন তার মনে আসেনি।

ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও বিকাশ বাড়ীতে রয়ে গেল আরও দু'মাস।

এই দু'মাস ফ্যামিলি এ্যালটমেণ্টের টাকা ঠিকই এসেছে। কিন্তু ফিরে যখন সে গেল, আর ফিরে যাওয়ার পর তিনমাস কয়েদ যখন সে খাটছিল, সেই তিন মাসের জন্যে বাড়ীতে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়েই সনতের সঙ্গে বিকাশের আলাপটা ঘণিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বিকাশের মত উদ্দাম একটা ছেলেকে সনতের মত রাশভারী, গুরু-গম্ভীর একজন মানুষ কেন যে এত স্নেহ করে, আর কেনই বা এতখানি প্রশ্রয় দেয়, সেটা ওদের কোম্পানির অনেকের কাছেই গবেষণার একটা বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সে যাত্রা সনতই বিকাশের বাড়ীতে ফ্যামিলি এ্যালটমেণ্টের পুরো অংকটা না হলেও, কিছু কিছু টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। আর সেই সূত্র ধরে বিকাশের জীবনে সে-ও পড়েছিল ঢুকে। সেই থেকে বেপরোয়া বিকাশ অনুভব করেছে, তার বল্গাহীন জীবনের রাশ কেমন করে যেন সনতের শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে চলে গেছে।

আর্জ গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর সুহাসিনীর সঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত সাংসারিক আলোচনাটুকু হ'ল, তার মধ্যে বিকাশ যেন শুনতে পেল চলন্ত ট্রেণে বসে সনতের সেই কথা, 'বাড়ীর প্রতি কর্তব্যের কথা যদি বল, সে তো এই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে থেকে, যে কোন কাজের বিনিময়ে যথেষ্ট টাকা পাঠাতে পারলেই হল।'

সুহাসিনী নেমে গেছেন বন্দনার ঘরে।

সেখানে বিমল এখন নেই। খেয়েদেয়ে সে কাজে বেরোয় বারোটা নাগাদ, আর ফেরে সাধারণত রাত ন'টা-দশটায়।

প্রকাশও যেন কোথায় বেরিয়ে গেল জামা কাপড় পরে।

হঠাৎ এক সময়ে বিকাশ বুঝতে পারল, ঘরের মধ্যে কখন যেন

বিছানা পাতা হয়েছে, আর সে রয়েছে সেই বিছানার ওপর বসে। এই-টুকু বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে আরও দেখতে পেল, মায়া বসে রয়েছে তার কাছ থেকে খানিকটা তফাতে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে কোলের ওপর সেলাই নিয়ে। মাথায় তার তখনও রয়েছে খানিকটা ঘোমটা। আর রয়েছে দরজা জানলা সবই খোলা।

বিছানার ওপর শরীরটাকে ছড়িয়ে দিয়ে বিকাশ বললে, তুমি শোবে না?

মায়া সুচে সুতো পরানো শেষ করে বললে, এ বাড়ীতে অন্তত নয়।

—তার মানে!

—তার মানেও আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে! এই একটা পায়রার খোপের মত ঘরে চারজন লোক বাস করে স্বামী-স্ত্রীতে শোয়া যায় না—কথার শেষে মায়ার গলাটা কেঁপে ওঠে।

বিকাশের কাছে তখনও পরিস্কার হয়নি মায়ার বক্তব্য। বললে, আহা, তা ওরা তো এখন আর কেউ নেই। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস না।

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মায়া, আমি পারব না। দরজা বন্ধ করলে আশ-পাশের সব কটা ঘরের মেয়েরা দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

বিকাশ অনুনয়ের সুরে বলে, বেশ তো, তাহলে জানলাটাও না হয় বন্ধ করে দাও, ঘর অন্ধকার হয়ে যাবেখন।

সেলাইটা আছড়ে ফেলে মায়া লাফিয়ে ওঠে, আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। আমি আর যাই-ই হই, এ বাড়ীর আর সব মেয়েদের মত একজাতের মানুষ নই—

হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যায় মায়া।

হতভম্ব হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে বিকাশ। সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি মনঃসংযোগ করতে গিয়ে শুনতে পায়, মাথার মধ্যে ট্রেণের চাকা আর রেল লাইনের সেই শব্দ, আর তার অপরূপ ছন্দ। ক্লান্ত শরীর-টাকে সে বিছিয়ে দেয় বিছানার ওপর।

বিকাশের ঘুম ভাঙল মায়ার ডাকাডাকিতে। সন্ধ্যা তখন প্রায় হয়-হয়।

বিছানার পাশে চায়ের কাপটা রেখে মায়া অনেকখানি এগিয়ে এসে বসেছে বিকাশের কাছ ঘেঁষে।

বিকাশ ঘুমভাঙা চোখে মায়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল, মায়া!

মায়া চমকে উঠে মুখ তোলে। মনটা তার অপরাধি হয়ে আছে দুপুরের ব্যবহারের জন্যে।

বাইরের তুলনায় ঘরের মধ্যেকার অন্ধকার অনেকটা ঘন। ও বাড়ীতে সন্ধ্যে হয় অনেক আগেই। পড়ন্ত সূর্যের আলো মাথা খুঁড়ে মরে পশ্চিমের অন্ধ দেয়ালে। ঘরের পশ্চিম দেয়ালে এমন একটা ছিদ্রও নেই যেখান দিয়ে এক চিলতে আলো এসে ঘরটাকে একটু সজীব করে তুলবে। যদি কোন এক সজল গোধূলিতে কনে-দেখা-আলো ফুটে ওঠে আকাশের গায়ে, সেই স্নিগ্ধ আলোটুকু দেখে মনকে রাঙিয়ে নেওয়ার কোন অবসরই পাবে না এ বাড়ীর বাসিন্দারা।

আবছায়া আলোয় বিকাশ ঝুঁকে পড়ল মায়ার আরও কাছে। দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে নিয়ে দেখল, মায়ার রঙ আরও ফর্সা হয়েছে, তার ডাগর চোখ দুটো আরও বড় হয়েছে, চাহনির মধ্যে এসেছে সজল কাজল আভা।

বিকাশ বললে, তোমার চা কই?

মায়ার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

—না মায়া, এস আমরা এই চা দু'ভাগ করে খাই।

কাপ থেকে অর্ধেকটা চা বিকাশ ঢেলে দেয় ডিসে। তারপর ডিসটা তুলে ধরে মায়ার মুখের কাছে।

সন্ত্রস্ত মায়া সচকিত হয়ে উঠে ডিস্‌টা নিয়ে নেয় নিজের হাতে। ডিসে চুমুক দিতে গিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল মিশে যায় চায়ের সঙ্গে। চাটুকু শেষ করে চোখ মোছে মায়া।

বিকাশের আরও কাছে ঝুঁকে পড়ে মায়া আর্দ্রকণ্ঠে বলে, ভাল দেখে একটা বাড়ী দেখ তুমি। আমি ছোড়দির সঙ্গেই থাকব। কিন্তু

এ বাড়ীতে আর পারছি না।

মায়ার শেষ কথাটা বুঝিবা বিকাশের কানে যায় না। মায়া নিজের মুখে বলছে, ছোড়দির সঙ্গে সে একই বাড়ীতে থাকতে রাজি—এই কথাটা যেন তার বুকের ওপর থেকে বিশমণ বোঝাকে নামিয়ে দেয়। খুশীতে সে প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ ঘুরে বসে মায়াকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে।

মায়া ছটফট করে ওঠে, আঃ. ছাড়, ছাড়—এখুনি কে না কে এসে পড়বে!

বিকাশ মুখটা নামিয়ে এনে বলে, আসতে দাও, যার খুশি তাকে।

মায়া আর জোর করে না। নিজেকে ছেড়ে দেয়। চাপা গলায় বলে, লক্ষ্মীটি, শুধু একটা চুমু খেয়ে ছেড়ে দাও। আমার বড় ভয় করছে।

বিকাশ আলতো করে ছোট্ট একটি চুমু খায় মায়ার গালে। তারপর ছেড়ে দেয় তাকে।

মায়া সরে যায় খানিকটা। হেসে ওঠে খিল্‌খিল্‌ করে। স্বরে তার লাগে চাপল্যের কাঁপন। তর্জনি দিয়ে বিকাশের দুর্বিনীত ঠোঁট দুটিকে শাসন করে বলে. দুষ্টুমি বুঝি আর তোমার গেল না!

মনটা খুশীই ছিল বিকাশের বাড়ী থেকে বেরোবার সময়।

ভুলে গেছে সে দুপুরের তিক্ততা। সুহাসিনীর হিসাব চাওয়া. মায়ার ঝঙ্কার দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া—সে সব যেন দুঃস্বপ্নের মত অনেক পেছনে পড়ে গেছে।

এখন সে চলেছে সংসারের কাজে, এই সংসারেরই একজন মানুষ হিসেবে। তার স্ত্রী, মা, ভাই নিয়ে ছোট্ট একটি সংসার, সকলেই তার মুখ চেয়ে আছে। এতদিন যা কিছু উপদ্রব দেখা দিয়েছে. যা কিছু অঘটন ঘটেছে—সে তো তার অনুপস্থিতির ছিদ্রপথে। আর তো সে এদের ছেড়ে কোথাও যাবে না।

আর সে মিলিটারীতে নেই, সে কথা মায়া তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। মিলিটারী থেকে ছাড়া পাওয়ার অনুভূতি তার মধ্যে সীমিত

হয়েছিল, যখন-তখন থান্ডার হুইসিলের কর্ণবিদারী শব্দ থেকে পরিত্রাণ. হাবিলদারের হুকুমে ওঠা-বসা চলা-ফেরা করা থেকে রেহাই, আর সর্বক্ষণ দুরন্ত এক আক্রোশে জ্বলার হাত থেকে অব্যাহতি।

মিলিটারী থেকে ছাড়া পাওয়ার তাৎপর্য শুধু ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। মায়া তাকে কেবল মাত্র প্রাথমিক কর্তব্যটাই আজ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে. অর্থাৎ ওই জলপাই রঙের সেলুলার সার্ট, প্যাণ্ট আর আড়াই সেরী বুটজোড়াকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

তাই বিকাশ চলেছে বাজার করতে।

মায়া বলে দিয়েছে, অন্তত এক জোড়া ধুতি, দুটো সার্ট আর একটা লুঙ্গি এখনই চাই।

মনের মধ্যে গুণগুণ করতে করতে বেরিয়েছিল বিকাশ, আর তার সঙ্গে মায়ার জন্যে ভাল একখানা শাড়ী আর খানিকটা চানাচুরও সে আনবেই।

পথে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চিৎপুর রোড আর নতুন বাজারের মোড়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি. মোটর, রিক্সা. ঠেলা-গাড়ী. ফেরীওয়ালা আর মানুষ। সব মিলে প্রচণ্ড এক ভীড়। কলরব আর কোলাহলে গম্‌গম্‌ করছে। সবই যেন পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করছে আগে যাওয়ার জন্যে। মিনিট দুয়েব মধ্যে অন্তত পাঁচজন তাকে ধাক্কা দিয়ে গেল।

তবুও বিকাশের ভাল লাগছিল। সব কিছুই যেন নিজের ইচ্ছের ওপর চলেছে। তার মিলিটারী জীবনের মত বঁড়শিতে গাঁথা জীবন এদের নয়। হঠাৎ তার নিজেরই ভীষণ ভাল লাগে. সে-ই তো নিজের খুশিমাফিক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে। ইচ্ছে করলে সে ওখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আবার হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতে পারে এস্‌প্লানেডে, আবার এসব কিছুই না করে ফিরে যেতে পারে বাড়ীতে।

অপরূপ এই অনুভূতিটুকু মনের মধ্যে চাটনির মত ঢাক্‌না দিয়ে রাখতে রাখতে বিকাশ পা বাড়াল। কোথা থেকে এক ফুলওয়ালা ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়াল, চাই বাবু বেলফুলের গোড়ে।

বিকাশ হাত বাড়িয়ে দেয়, দেখি একটা মালা।

বেশ মোটাসোটা ভারীভুরি একটা মালা তুলে দেয় ফুলওয়ালা বিকাশের হাতে। অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, সবার সেরা মালাটা বাবু আজ রয়ে গেছে আপনার জন্যে।

মালাটা হাতে নিয়ে বিকাশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। স্পর্শে, গন্ধে মনে পড়ে যায় মায়ার কথা। মায়াও তো এমনই নরম আর সুন্দর! মন্দ কি। হোক না আজ নতুন করে ফুলশয্যা। সত্যিকারের ফুল-শয্যার দিন তো আজই। আর তো মায়াকে ফেলে রেখে কোথাও চলে যেতে হবে না।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় বিকাশ। খুচরো কিছু পয়সা আঙুলের ডগায় ঠেকে।

আবার মনে পড়ে মায়ার কথা। দুপুরে সে তার কাছে শোয়নি। তার কথায় ঝংকার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর কখন যেন বলেছিল, 'এই একটা পায়রার খোপের মতন ঘরে চারজন লোক বাস করে স্বামী-স্ত্রীতে শোয়া যায় না।'

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিকাশ এতক্ষণে সায় দেয় মায়ার কথায়। এমন ঘরে মিলিটারী তাঁবুর মধ্যে শোয়ার মত করে শুয়ে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু নতুন করে ফুলশয্যা রচনা করা যায় না।

মালাটা ফুলওয়ালার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বিকাশ বলল, না, আজ চাই না।

জোরে হেঁটে বিকাশ এগিয়ে যায়। বিরক্তি, ক্ষোভ, রাগ, সব কিছু যেন দানা বেঁধে ওঠে একটি চিন্তাকে কেন্দ্র করে। বাড়ীটা এখনই বদলাতে হবে। ও বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব।

কলকাতা শহর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বিকাশের যতটুকু আছে, তাতে মনে স্বস্তিই সে পায়। বাড়ী একটা পাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়! টু-লেট্ তো টাঙানোই থাকে বাড়ীর দেয়ালে, তা ছাড়া গ্যাস পোস্টে, প্রস্রাবখানায় হাতে লেখা টুকরো টুকরো বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। দুটো দিন চেপে ঘুরলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বাসা-বদলের কথা মনে হতেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও সমস্যা দেখা দেয়। বন্দনার সঙ্গে এক সাথে থাকার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে মায়ার ঘোরতর আপত্তিটাই তার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আর ওই আপত্তির ফলেই তো যত সমস্যা।

অনেকদিনের অভ্যস্ত এই চিন্তাটুকু মাথার মধ্যে এসে পড়তেই বিকাশ কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে। অস্বস্তিটুকু নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিকেলে চা খাওয়ার সময়কার কথা। মায়াই তো বলেছে, ছোড়দির সঙ্গেই সে থাকতে রাজি আছে।

বিকাশের ইচ্ছে করে খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠতে। আর সে আরও বেশী খুশী হয় নিজের ওপর। মায়াকে বোঝাবার চেষ্টা না করে তাকে বুঝতে দিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে!

বাসার ভাবনাটা আবার এগিয়ে চলতে থাকে। তাহলে ঘর চাই তিনখানা। বন্দনার একখানা, তার আর মায়ার একখানা, আর একখানা মা আর প্রকাশের। একটা রান্নার জায়গা আর কল পায়খানাটা আলাদা হলেই ভাল।

এমন একটা বাসার ভাড়া কত হতে পারে। তার অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে থেকে খুঁজে পায় নীতিশবাবুর কথা। দুখানা মাঝারি ঘর, রান্নাঘর, কল-পায়খানা আলাদা, নীতিশবাবু দিতেন পনেরো টাকা। তাহলে তিনখানা ছোট ছোট ঘরের জন্যে ওর চেয়ে বেশীই বা কেন লাগবে!

এরই ফাঁকে মনে পড়ে সনতের কথা। বার বার সে সাবধান করেছে খরচ সম্বন্ধে। মিলিটারী থেকে বিদায়কালিন পাঁচশো টাকা দিয়ে তাকে অন্তত ছটি মাস চালাতেই হবে, যদি না তার মধ্যে অন্য কোন আয়ের বন্দোবস্ত হয়।

কাপড়ের দোকানে ঢুকে বেঞ্চির ওপর বসে সেল্‌স্‌ম্যানের উদ্দেশ্যে বার পাঁচেক 'ও মশায় শুনছেন, ও মশায় শুনছেন' করার পর যেন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল।

বিকট মুখব্যাদান করে সশব্দে এক হাই তুলে সেল্স্ম্যান ভদ্রলোক বললেন, কি চাই আপনার?

বিকাশ বললে, ধুতি।

আবার একটা হাই তুলে মুখের সামনে তুড়ি বাজাতে বাজাতে ভদ্র-লোক বললেন, কার্ড এনেছেন?

বিকাশ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ধুতি মোটা আর মিডিয়াম আছে। ফাইন, সুপারফাইন এখন পাওয়া যাবে না। সরকারের কবে মর্জি হবে, আমরা জানি না মশাই। আসবেন মাসখানেক পরে, একবার খোঁজ নেবেন।

বিকাশ কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। সেল্স্ম্যানের কথার একটারও অর্থ বোধহয় সে বুঝতে পারেনি। নতুন নতুন কথা, নতুন ভাষা, কথা বলারও নতুন ভঙ্গি! তার কাছে সবই যেন কেমন নতুন ঠেকছে।

ফ্যাল্ফ্যাল্ করে বিকাশ সেল্স্ম্যানের দিকে চেয়ে থাকে। সে ভদ্রলোক ততক্ষণে একেবারে পেছন ফিরে বসেছেন তার দিকে। আর একজনের সঙ্গে কানে কানে ফিস্ফিস্ করে কথা বলতে সুরু করে দিয়েছেন।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় বিকাশের। নীরবে সে উঠে পড়ে। দোকানের সিঁড়ি থেকে নেমে ফুটপাথের ওপর আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে সে আশা করেছিল, তাকে উঠে আসতে দেখে দোকানদার নিশ্চয়ই ডাকাডাকি করবে।

ফুটপাথের ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও বিকাশ দেখল, তার আশানুরূপ কোন ঘটনাই ঘটল না। দোকানদার তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি। নিজেকেই কেমন যেন তার বোকা-বোকা মনে হচ্ছে। তার কাছে সবই যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সৈনিক জীবনের পাঁচটি বছরে দুনিয়াটা যে অনেকখানি বদলে গেছে, সে কথাটা মনে এলেও মগজে আসছে না।

কুড়িটা টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল বিকাশ। একজোড়া ধুতি, দুটো সার্ট আর একখানা লুঙ্গির দাম যখন সে শুনল আঠাশ টাকা,

তখন তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় দিনদ্‌পুরে তাদের ক্যাম্পের পঞ্চাশ গজ দূরে প্রথম বোমা পড়ার কথা। সেই বোমা ফাটার শব্দে তাদের তাঁবুর হরিহরের কাপড়চোপড় যায় খারাপ হয়ে, দাঁতে দাঁত লেগে ঘাড়-মাথা গুঁজে মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে থাকে।

বিকাশ নিজেই নিজেকে যাচাই করতে থাকে, তার অবস্থাটাও কি ওই হরিহরের মত হতে চলেছে নাকি! কাউণ্টারটাকে শক্ত করে চেপে ধরে সে যেন নিজেকে একটু সামলে নেয়। তারপর শুকিয়ে আসা গলায় জিজ্ঞেস করে, কোনটার দাম কত?

দোকানী একটি একটি করে জিনিষের দাম বলে যায়, এক জোড়া ফাইন ধুতি বারো টাকা, দুটো সার্ট—ছ'টাকা করে বারো টাকা, আর লুঙ্গি একটা চার টাকা।

বিকাশের মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। দেড় টাকার কাপড় বারো টাকা! আঠারো আনার সার্ট ছ'টাকা! আর বারো আনার লুঙ্গি চার টাকা! লোকটা কি তার সঙ্গে রঙ্গ করছে নাকি! না সোলজার মনে করে কিছু দুয়ে নেওয়ার তালে আছে!

মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে বিকাশ বললে, কি যা'-তা' বলছেন, একটু ভেবেচিন্তে বলুন। আমাকে দেখে কি খুব গাঁইয়া বলে মনে হচ্ছে!

এবার বিস্মিত হওয়ার পালা দোকানদারের। নাকের ডগায় ঝুলে পড়া নিকেলের চশমার ওপর দিয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, কোন দেশ থেকে আসছেন মশাই?

বিকাশ বলে, আমি মশাই গত পাঁচ বছর মিলিটারীতে ছিলাম। ছাড়া পেয়ে আজ ফিরেছি।

—তাই বলুন! তাই মেজাজটা এত কড়া! লড়াই বাধিয়ে দেশটাকে তো ছারেখারে দিলেন আপনারাই। পয়সাও তো রোজগার করেছেন অঢেল। এখন চোখ কপালে তুললে চলবে কেন দাদা! এই হল বাজার দর, নিতে হয় নিন। দোকানদারী করতে বসেছি বলে যে আমাকে চোর ঠাওরাবেন, সেটি চলবে না। কেন, আপনাদের ক্যান্টিন্ গেল কোথায়! সেখানে তো আপনাদের প্রিওয়ার প্রাইসে জিনিষ দিত!

বিকাশের কাছে জীবনের জটিলতার জট্ খুলেছে!

তাই বুঝি সুহাসিনী. মায়া, বন্দনা, বিমল, প্রকাশ, এরা সকলেই তার কাছ থেকে অনেক তফাতে চলে গেছে! তাদের ভাবনা চিন্তার সঙ্গে তার ধ্যান ধারণা কোথাও খাপ্ খাচ্ছে না!

একখানা ধুতি, একটা সার্ট আর একটা লুঙ্গি নিয়ে যখন বিকাশ দোকানের চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন তার পা দুটো থর্থর্ করে কাঁপছে। আড়াই টাকা কি বড়জোর তিন টাকার জিনিষের বিনিময়ে ষোলটি টাকা দিয়ে এসে প্রথম প্রশ্ন তার মনে জাগছে, তাহলে তার রিলিজের পাঁচশো টাকার মূল্য কি বা কতটুকু!

মায়ার জন্যে শাড়ী কেনার কথা, এমন কি চানাচুর কেনার কথাও তখন তার মনের ত্রিসীমানায় নেই। মনের মধ্যেকার কোমল, সুন্দর যা কিছু বৃত্তি যেন উবে গেছে! কেমন যেন তার ভয়ভয় করছে! ভাল বাড়ী সে নেবে কেমন করে! এই একখানা পায়রার খুপরির ভাড়া কত, তা তো সে একবারও কাকেও জিজ্ঞেস করেনি।

ভয় পাওয়া মানুষের মত বিকাশ পা চালিয়ে দেয় বাড়ীর দিকে। অসংখ্য প্রশ্ন তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। ওই ঘরের ভাড়া কত? মাসে কত টাকা সংসার খরচ লাগে? আর যেন সে এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারছে না। এখনই তার জানা দরকার, কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে!

গলির মুখে বাড়ীর কাছাকাছি এসে বিকাশ থতমত খেয়ে যায়। দিনের বেলা বোঁচকা ঘাড়ে যখন সে বাড়ীতে ঢুকেছিল, তখন রাস্তাটা ছিল নির্জন। কিন্তু এখন যেন জৌলুষে ফেটে পড়ছে। সকালে যে সব দোকানের ঝাঁপ ছিল বন্ধ, এখন তারা জোরালো আলো জেলে দোকান সাজিয়ে বসেছে। নানান রকমের দোকান। খাবারের দোকান, রুটি পরোটা মাংসের দোকান, নানান ধরণের মুখরোচক ভাজাভুজির দোকান। ফুলওয়ালাও আছে কয়েকজন। নানান ধরণের মানুষ একটু যেন বেশী সাজগোজ করে এর-ওর-তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, ঘুরছে ফিরছে, কেমন যেন একটু খুশীর আমেজে মশগুল রয়েছে!

বিকাশ দাঁড়ায় না। তাদের বাড়ীর অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকে

যায়। দিনের বেলার অন্ধকার ও গলিতে রাত্রে কেবল আরও একটু গাঢ় হয়। সাবধানে সে পা টিপেটিপে এগোতে থাকে। তার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে সদর দরজাটা সে খুঁজে পাবে কিনা!

দরজার মুখ থেকে অতি ক্ষীণ আলোর একটু আভাষ আসছে। বিকাশ দরজার সামনে যেতেই কারা যেন ফস্ করে সরে গেল।

বিকাশ থতমত খেয়ে প্রশ্ন করে, কে?

বিকৃত একটি কণ্ঠস্বর পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি কে বাওয়া!

চাপা একটি মেয়েলী স্বর সব সমস্যার সমাধান করে দেয়, উনি এ বাড়ীর ভাড়াটে।

বিকাশের কাছে আবার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু সে বুঝতে পেরেছে, তাতে সে ক্ষণেকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবছে, এ বাড়ীর মধ্যে সে ঢুকবে কেমন করে! কিন্তু এইটাই যে তার গৃহ! এরই মধ্যে রয়েছে তার সবচেয়ে আপনার জনেরা, তার পরমপ্রিয় প্রিয়তমা!

বিকাশ ঢুকে পড়ল। কোন দিকে না তাকিয়ে উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। দোতলার কোন এক ঘরে হারমনিয়মের সাথে তবলা সহযোগে গান চলেছে। গানের সুর, ভাষা, ছন্দ শুনে সেই সিঁড়ির ওপরই সে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে কি মা, স্ত্রী, ভাই, বোন, সকলকে ফেলে ছুটে পালিয়ে যাবে।

খেমটা সুরে মেয়েলী গলায় গান চলেছে, 'কেন উচাটন মন, পরাণ কেন এমন করে!' একই লাইন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান ছন্দে গেয়ে চলেছে একটি মেয়ে।

সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে যায় বিকাশের। স্তিমিত হয়ে আসে সে। যে গতিতে সে সিঁড়ির প্রথম দু'তিনটে ধাপ উঠেছিল, সে গতি ঝিমিয়ে যায়। ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে ছাদে।

এক ফালি ছাদ। রাস্তার দিকের আলসেটা নিচু, তারই কোলে ইঁট গেঁথে বেঞ্চি বানানো। পূব দিক খোলা। খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে ছাদের ওপর। বেঞ্চির ওপর বসে থাকা জনদুই মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে রঙ-তামাসা করছে!

বিকাশ আর দাঁড়ায় না। ছাদ পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে পড়ে। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক নেই। কিন্তু মাঝের ঘরটা কড়া-আলোয় ভেসে যাচ্ছে। প্রথম ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মাঝের ঘরের আলো খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে বারান্দায় এসে পড়েছে। সেই আলো-টুকু পার হতে গিয়ে বিকাশ চমকে ওঠে। গায়িকা হচ্ছেন সকালের সেই সিক্তবসনা!

বিকাশ ছুটে গিয়ে নিজের দরজায় ধাক্কা মারে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধাক্কায় শব্দে মায়ার ভয়ার্ত স্বর ভেসে আসে, কে! কে!

বিকাশ বলে, আমি বিকাশ।

মায়া দরজা খুলে দেয়।

বিকাশ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পেছনে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ঝাঁপিয়ে আসে মায়া বিকাশের বুকের মধ্যে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমায় তুমি বাঁচাও।

মায়ার কম্পমান দেহকে অনুভব করতে পারে না বিকাশ। রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ ঘরটার জন্যে কত ভাড়া দিতে হয়?

মায়া সরে আসে বিকাশের বুক থেকে। উত্তর দেয়, মাসে বারো টাকা।

—বা-রো টা-কা!

—তাই তো শুনেছি। আর প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে আমি এমনি-ভাবে দরজায় খিল এঁটে বসে থাকি। কোন দিন মা থাকেন, কোন দিন থাকেন না। কতদিন কত লোক এসে দরজায় ধাক্কা দেয়।

—বিমলদা নিচে আছে?

—বলতে পারি না।

কিনে আনা জামা-কাপড়গুলো মায়ার হাতে দিয়ে বিকাশ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বিমলের সামনে গিয়ে বিকাশ সেই বছর দেড়েক আগেকার মত একই সুরে প্রশ্ন করে, এ তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছ বিমলদা?

বিমল উঠে বসে বিছানার ওপর। বিকাশের মুখের দিকে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বিছানাটা দেখিয়ে বলে, বস বিকাশ।

বিকাশ ধপ্ করে বিছানাটার এক ধারে বসে পড়ে।

বন্দনা অন্ধকার কোণটা থেকে উঠে এসে বলে, চা খাবি বিকাশ?

চা! বিকাশ যেন চমকে ওঠে। সেই সকাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিটা পদক্ষেপে কেবলই হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে যেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। হৃদয়হীন এই দুনিয়াটার নির্দয়তায় সে রূঢ়, রুক্ষ হয়ে উঠেছে। তাই সে মারমুখো হয়ে তেড়ে এসেছিল বিমলের কাছে।

কিন্তু বন্দনার স্নেহমাখা কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল, বিকাশ যেন এক লহমায় গলে জল হয়ে গেল। কয়েকটা ঢোঁক গিলে বললে, দাও একটু। কিন্তু কোন কিছু খাওয়ার কথা ভাববার মত ফুরসৎ এতক্ষণ পাইনি ছোড়দি। আমার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় ফিরে এলাম! এই কি আমার সেই গৃহ, যার দিকে তাকিয়ে মিলিটারী জীবনের পাঁচটা বছর কেবল দিন গুণে কাটিয়ে দিয়েছি! সত্যি ছোড়দি, আর যেন পারছি না।

বন্দনা এগিয়ে এসে বিকাশের পিঠে একটা হাত রাখে। সে বুঝতে পারে, প্রাণপণ শক্তিতে বিকাশ কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। বিকাশের মুখটা ধরে ফিরিয়ে নেয় নিজের দিকে। অঝোর ধারায় চোখের জলে ভেসে বলে যায় বন্দনা, এত অল্পতেই ভেঙে পড়িসনি ভাই। এখনও যে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

ক্ষণেক থেমে আবার বলে বন্দনা, একটা কথা শুনবি?

বিকাশ মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বন্দনার মুখের দিকে।

বন্দনা বিকাশের জলভরা দুটি চোখের দিকে চেয়ে বিমলের দিকে আঙুল তুলে বলে, ওর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে চলিস, হয়তো একটু সুবিধে হতে পারে। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও কি করে ভেঙে না পড়া যায়, বোধহয় ওর কাছ থেকে শিখতে পারবি।

বিকাশ মাথাটা নিচু করে নেয়।

ধীরে ধীরে বন্দনা এগিয়ে যায় অন্ধকার কোণটায় চায়ের জল চাপাতে।

বিমল বললে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই বিকাশ। আমি তোমাদের এখানে আনিনি। তোমাদের জন্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আমার আর বন্দনার ছিল বটে, কিন্তু কোন প্রয়োজন ছিল না তোমাদের এমনভাবে কাছে পাওয়ার। যেভাবে খুড়িমা কলকাতায় আসার জন্যে জিদ্ ধরলেন, সে সময়ে এ-ছাড়া আর কোন মাথা গুঁজবার মত আস্তানা অন্তত আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তার জন্যে দায়ী যুদ্ধ। তোমরা, যারা যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়েছিলে, তারা পাঁচ বছর আগেকার মন নিয়ে এ অবস্থাকে বুঝতে পারবে না। কিন্তু এ অবস্থাকে তোমাদের বুঝতেই হবে, আর যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পার, ততই তোমাদের মঙ্গল। আমার ওপর মনের মধ্যে আক্রোশ পুষে রেখে কোনই লাভ হবে না।

আচমকা যেন একটা ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বিকাশ। বিমল বা বন্দনা, কাকেও এভাবে দেখবার জন্যে সে তৈরী ছিল না। সে ছুটে এসেছিল বিমলের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে। তার জীবনের যত গোলযোগ, যার কোনটারই কারণ যতই সে তলিয়ে বুঝতে পারছিল না, ততই সে ক্ষেপে উঠছিল বিমলের ওপর। আর তার সহজ বুদ্ধিতেই সে দেখেছে, বিমলের জন্যেই মা দেশের বাড়ী ছেড়ে এই কলকাতায় ছুটে এসেছেন, ওই বিমলের জন্যেই মা আর মায়ার মধ্যে সংঘর্ষ, ওই বিমলই জোগাড় করেছে এই বাড়ী।

বিকাশ আশা করেছিল, তার এই রুক্ষ মূর্তি দেখে আর তার ক্রুদ্ধ প্রশ্ন শুনে বিমল যাবে ভড়কে! তাতে কোন সমস্যার সমাধান হবে কিনা, অতটা এগিয়ে আর ভাবতে পারেনি।

কিন্তু বিমলের উত্তর শুনে বিকাশই যেন ভড়কে গেল বেশী। বিস্মিত দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় আর. সি. মেলে বসে সনতের সেই কথা 'আমাদের এই রুক্ষ, শুষ্ক, আক্রোশ-ভরা মন নিয়ে গৃহকেই আমরা বিষিয়ে তুলবো।'

বিমল ধীরে ধীরে বলে যায় এ-বাড়ীতে আসার ইতিহাস।

সুহাসিনী বারম্বার দেশ থেকে চিঠি লিখছেন বিমলকে কলকাতায় একটা বাসা ঠিক করার জন্যে। কিন্তু কোথায় বাসা! ইভ্যাকুয়েশনের

হিড়িকে যে কলকাতা প্রায় খালি হয়ে উঠেছিল, এক বছর যেতে না যেতে কোথা থেকে যে লোক পিল্ পিল্ করে এসে কলকাতার আনাচ কানাচ ভরিয়ে ফেলল, তা বোঝাই মুস্কিল। যুদ্ধের কারবার তখন ফলাও হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহরে তখন ধুলোমুঠোও সোনা। কল-কারখানা, মোটা মাইনে, দেশী-বিদেশী সৈনিকের হৈ-হুল্লোড়ে শহর সর-গরম। বাজার চড়ে চলেছে প্রতিদিন লাফ মেরে মেরে।

বাড়ীর খোঁজে বিমল তখন হণ্যের মত শহর চষে ফেলছে। ছোট-খাট একখানা, দুখানা ঘর পাওয়াই যায় না। আর যদিই বা খবর মেলে, ঘর প্রতি ত্রিশ চল্লিশ টাকা ভাড়া আর দুশো-পাঁচশো টাকা সেলামী। কলকাতার বাজার তখন কালোবাজার।

সুহাসিনী কোন কথা মানতে চান না। অবশেষে তিনি জানান, প্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে আসবেন, আর মায়াকে পাঠিয়ে দেবেন তার বাপের বাড়ী, যতদিন না বিকাশ ফেরে।

সেই সময় একটা সুযোগ মিলে গেল। বিলেতি গভর্নর সাহেবের খেয়াল হল, শহরকে নৈতিক আবর্জনা-মুক্ত করা। বেশ্যাপল্লীগুলোর ওপর চলল হামলা। শহরের বাইরে কোথায় নাকি তাদের চালান দেওয়া হল!

কিছু বাড়ী-ঘর খালি হল। পাথুরেঘাটার এই বাড়ীটি সেই বাড়ী-গুলিরই একটি।

সন্ধান পেয়ে বিমল ছুটে আসে। ঘর পছন্দর প্রশ্ন ছিল না। একমাত্র প্রশ্ন ছিল, চারটে দেয়াল আর তার ওপর একটা ছাদ আছে কিনা। তবুও যে-ব্যাপারে সে বিশেষভাবে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল, সেটা হচ্ছে বাড়ীর বাসিন্দারা সকলেই গৃহস্থ কিনা। বাড়ীওয়ালা সে-বিষয়ে গ্যারান্টি দিয়েছে, আর বিমলের চোখেও বিসদৃশ তেমন কিছু পড়েনি।

দু'খানা ঘর পাওয়া গেল। একখানা একতলায়, আর একখানা দোতলায়। ভাড়া যথাক্রমে দশটাকা আর বারো টাকা।

মায়া বাপের বাড়ী যেতে চায়নি। তার ইচ্ছেতেই দোতলার ঘরটা নিলেন সুহাসিনী। এইটুকু ব্যবধানেই বিমল খুশী হয়েছিল। আত্মীয়-

স্বজন থেকে যতটুকু তফাতে থাকা যায়, ততটুকুই মঙ্গল।

মাসখানেক কেটেছিল ভালই। তারপর হাওয়া বদলাতে লাগল বাড়ীর। সন্ধ্যের পর অজানা-অচেনা লোক আনাগোনা করতে লাগল বাড়ীর অন্দরমহলে। আর এখন তো বাড়ীর একটা অংশ পূর্বতন রূপে পুরোপুরিই ফিরে গেছে।

শুধু বিমল একা নয়, তার মত ভাড়াটে আর যারা আছে, সকলেই একযোগে থানায় ডায়েরী করেছে। থানার ও, সি'র দরজায় ধর্ণা দিয়েছে। থানা থেকে এন্‌কোয়ারীও হয়েছে বারকয়েক কিন্তু কোন্ এক যাদু-মন্ত্রবলে কোন কিছুরই প্রমাণ হয়নি।

পরিশেষে বিমল বললে, আমি এখনও খোঁজ করছি বিকাশ। আমার আয় মাসে একশো থেকে শওয়াশো টাকা। তার মধ্যে কুলোবার মত হলেই এখান থেকে চলে যাব।

বাসা পরিবর্তনের ব্যাপারে সংসারের আয়টা যে প্রধান, আর তার যে এখন কোনই আয় নেই—এই দুটো কথা সমান গুরুত্ব নিয়ে এতক্ষণ বিকাশের মনে পড়েনি। সৈনিক-জীবনে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করার কোন রেয়াজই ছিল না। আর বিকাশের চরিত্রে সে স্বভাবটার অভাব ছিল আরো বেশী।

সব কথা শুনে বিকাশ উপস্থিত মতে এইটুকু বুঝল যে, একটা কাজ জোগাড় করার আগে বাসা বদলানোর কথা চিন্তা করা বাতুলতা।

সুহাসিনী আর প্রকাশ ফিরে আসেন। বিকাশকে নিচের ঘরে দেখে বোধহয় তিনি খুশীই হন। উঠে আসেন ঘরের কোলে দেড় হাত চওড়া রোয়াকের ওপর। জিজ্ঞেস করেন, কতক্ষণ ফিরেছিস বিকাশ?

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বিকাশ উঠে পড়ে বলল, অনেক-ক্ষণ। চল ওপরে যাই।

সুহাসিনী ব্যস্ত হয়ে বলেন, বস না আর একটু।

—না মা, মায়া একা দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুহাসিনী আপন মনেই বলেন, ওই তো ওর দোষ! কারও কথা শোনে না। যেদিনই বাইরে যাই, বলি, বৌমা চল। কিন্তু

কি যে ওর জিদ্, কিছুতেই নড়বে না। এক কাজ করিস বিকাশ, কাল থেকে তুই ওকে একটু-আধটু বাইরে নিয়ে যাস।

রাত্রে শোয়ার ব্যবস্থা দেখে বিকাশ আরও একদফা বিস্মিত হয়। এ-ব্যাপারেও সে আগে থেকে কিছুই ভাবেনি।

পাশাপাশি দুটো বিছানা করা হয়েছে, মাঝখানে হাতখানেক ব্যবধান। ব্যবধান পাকাপোক্ত করার জন্যে আরও একটা ব্যবস্থা হচ্ছে, দুটো বিছানায় আলাদা আলাদা মশারী।

ব্যাপারটা দেখে প্রথম চোটে বিকাশ খানিকটা কৌতুক অনুভব করেছিল। মনে পড়েছিল তার মিলিটারী জীবনের কথা। একটা তাঁবুর মধ্যে বিশজনের শোয়ার ব্যবস্থা, অর্থাৎ, মাথাপিছু একহাত করে জমি। কিন্তু তারই মধ্যে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মশারী। মিলিটারীতে হুকুম দিয়ে এ-ব্যবধান রচনার উদ্দেশ্য ছিল অস্বাভাবিককে প্রতিরোধ করা। আর এখানে! যা স্বাভাবিক, তা নগ্নতা আর রুক্ষতার অভিব্যক্তিতে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

বিছানা করার পাট চুকলে সুহাসিনী বললেন, বিকাশ, তুই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। আমি একটু নিচে যাচ্ছি। দরজাটা ভেজানো রইল।

প্রকাশ দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়।

সুহাসিনী ডাকলেন, আয়রে প্রকাশ একটু আমার সঙ্গে। তোর আর সাত-সকালে শোয়ার দরকারটা কি!

অপসৃয়মান পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় দুজনেরই।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। বাড়ীটা কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে আছে, কেউই খেয়াল করেনি। হারমনিয়ম বাজিয়ে তবলা সহযোগে খেমটা গানও থেমেছে। সে-ঘরের কড়া আলোও নিভেছে। আর আকাশে সেদিন চাঁদ উঠেছে কি ওঠেনি, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস বহুদিনই চলে গেছে ও-বাড়ীর বাসিন্দাদের। প্রায় সবকটা ঘরের দরজায় খিল পড়েছে।

সুহাসিনীর ব্যবস্থাটা বুঝতে পারে বিকাশ। সুচারু ব্যবস্থা!

নিচে গিয়ে সুহাসিনী আর প্রকাশ বন্দনার সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করে ফিরে আসবেন। সেইটুকুই তার আজকের রাত্রের মত দাম্পত্য-জীবনের অবসর।

মনটা বিকাশের আবার বিষিয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে, তাতে তার নিজেকে একটা জন্তু-জানোয়ার বলে মনে হচ্ছে। এইরকম নির্লজ্জ একটা জীবন তো তাকে কাটাতেই হবে, যতদিন না এ-বাড়ী থেকে সরতে পারছে।

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে বিকাশের মনে পড়ে. মায়া তার পাশে শুয়ে আছে। হয়তো সে অভিমান-ভরা মন নিয়ে অপেক্ষা করছে, কতক্ষণে সে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নেবে। হয়তো মায়া মনে মনে মিলিয়ে নেবে বিবাহের পর প্রথম রাত কটার সঙ্গে তার আজকের ব্যবহারের!

বিকাশ ঘুরে শুয়ে কাছে টেনে নেয় মায়াকে। সে নিজেই বুঝতে পারে, এই টেনে নেওয়ার মধ্যে নেই কোন উন্দামতা, নেই আগেকার সেই বিপুল আবেগ!

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে মায়া। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সে-কান্নায় বাধা দিতে মন ব্যথিত হয়ে পড়ে বিকাশের। সে বুঝতে পারে, সকলের চেয়ে মায়াই যেন কষ্ট বেশী পাচ্ছে।

মায়ার গালে মুখে হাত বুলিয়ে বিকাশ তাকে টেনে নিতে যায় আরও কাছে। কোমরটা একহাতে জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে টান দেওয়ার আগেই সে থমকে যায়। তার হাতের বেষ্টন আলগা হয়ে আসে। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে অনুভব করে মায়ার পিঠ. পাঁজরা! ঝপ্ করে উঠে বসে মায়ার গা থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার শরীরের ওপর।

অন্ধকার ঘরে দৃষ্টি অন্ধ। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে বিকাশ কেন্দ্রী-ভূত করে তার স্পর্শানুভূতির মধ্যে। সঞ্চরমান হাতখানা তার ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মায়ার সর্বাঙ্গে। হঠাৎ মায়াকে টেনে তুলে নেয় নিজের বুকের মধ্যে। আর্ত, কম্পিত স্বরে বলে ওঠে, বল মায়া, তোমার কি হয়েছে?

হাতদুটো বিকাশের গলায় জড়িয়ে দিয়ে মায়া বলে, কই কিছু হয়নি তো!

—তুমি যে একেবারে শুকিয়ে গেছ!

—ও কিছু না। তুমি ফিরে এসেছ, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখটাকে আরও খানিকটা তুলে ধরে মায়া। বিকাশের কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, তুমি তো জান, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না।

বিকাশের বুকে ভয়ের কাঁপন তখনও থামেনি। তবে যে সে তখন মায়াকে দেখেছিল আরও ফর্সা, সেটা রক্তশূন্যতা! দেখেছিল ডাগর দুটি চোখকে আরও ডাগর, সেটা শীর্ণতা!

অনুযোগ করে বিকাশ. কেন তুমি আমাকে জানাওনি, তোমার শরীর এত খারাপ।

দুষ্টুমি করে মায়া বলে, জানালেই তো তুমি পালিয়ে আসতে, আর ফিবে গিয়ে কয়েদ খাটতে।

আরও নিবিড় করে বিকাশ চেপে ধরে মায়াকে বুকের মধ্যে। তার চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে মায়ার গালে।

চমকে উঠে মায়া কান্নায় কম্পমান বিকাশের ঠোঁট দুটোব ওপর নিজের উত্তপ্ত গাল চেপে ধরে। ধরা গলায় বলে, তুমি ভেঙে পড়লে আমি বাঁচব কি করে। তোমার আশাতেই তো আমি এখনও বেঁচে আছি।

বিকাশ যেন সেঁদিয়ে যায় নিজের মধ্যে। স্বগত উক্তির মত বলে চলে, আমি কি পারব মায়া! আমার নিজেবই যে ভীষণ ভয় করছে। মানুষ হব বলে শহরে এসেছিলাম. পেয়েছিলাম তোমাকে। তবুও তো আমাকে মিলিটারীতে যেতে হয়েছিল। মিলিটারী জীবনের পাঁচটা বছব তোমার স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিয়েছি—তবুও তো এসে উঠতে হয়েছে এই বাড়ীতে! এ দুনিয়ার সমস্তই ওলট-পালট হয়ে গেছে। তার মাঝখানে আমি কোথাও খাপ্ খাচ্ছি না। আজ সারাটা দিন কেবল হোঁচট খেতে খেতেই কেটে গেল। যতদিনে এ দুনিয়াকে চিনতে পারব, বুঝতে পারব, ততদিনে তুমি না ঝরে যাও মায়া।

মায়া একটা হাতে বিকাশের মুখখানা নামিয়ে আনে। দুটি হাত

বিকাশের দুই গালে রেখে প্রাণভরে বিলম্বিত একটি চুম্বন করে।

সাড়া পাওয়া যায় সুহাসিনীর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। অনাবশ্যক সরবতায় ডাকেন প্রকাশকে, কই রে প্রকাশ, রাত যে অনেক হল, শুবি না?

প্রকাশও আসছে। কি যেন সে গজ্ গজ্ করে বলে চলেছে। সম্ভবত বিরক্তি প্রকাশ করছে।

বিকাশ আলতোভাবে মায়াকে শুইয়ে দেয়। তার কপালে গভীর একটা চুমু খায়। তারপর নিজেও শুয়ে পড়ে।

দরজার সামনে এসে সুহাসিনী প্রকাশকে সাবধান করে দেন, দেখিস, যেন আবার হোঁচট খাসনি।

চার

আর, সি, মেলে বসে সনত যখন বিকাশকে বলেছিল, 'আমার জীবনের গতিটা এতই সরল রেখায় যে তার শেষ প্রান্তটুকু সব সময়েই চোখে পড়ে', তখন সে তার জীবনের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে ওর চেয়ে বেশী কিছু ভেবে উঠতে পারেনি, বা তার চেয়ে বেশী কিছু আশাও করেনি। নিছক খানিকটা ভাবাবেগ বা জীবন নিয়ে রোম্যান্স করার জন্যেও কথা বলেনি। যদিও যে যুগের মানুষ সে, সে যুগে ওই ধরণের রোমান্টিক হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তার এই ছাব্বিশ বছরের জীবনের মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা এক-আধটা ঘটে থাকলেও, তার ওপর বাজি ধরে সর্বস্ব-খোয়ানোর পণ ধরার মত সাহস তার ছিল না। আসল কথা, তার জীবনের ধারাটাই ছিল না ওই জাতের।

সনত শহরের মানুষ নয়। তার গ্রাম কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে। ওই দূরত্ব থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করা যায়, কাজ-কারবারও চালানো যায়, কিন্তু গ্রামের মেধাবী ছাত্র হয়ে কলকাতার ভাল স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করা যায় না। তার পিতা চেয়েছিলেন, শহরের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে বালক বয়েস থেকেই সে জীবনের পরীক্ষার

জন্যে তৈরী হোক। তিনি দেখেছিলেন, 'মানুষ' হওয়ার প্রতিযোগিতায় শহরের ছেলেদের পাতে সরটুকু ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর, গ্রামের ছেলেদের ভাগ্যে পড়ে থাকে মাঠা-তোলা দুধের তলানিটুকু।

তাই সনত গ্রামে থাকেনি। পনেরো বছর বয়েসে কলকাতায় আসে পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে। তখন সে সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছে।

রমানাথবাবু তাঁর আবাল্য বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সনত তাঁর বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করবে। ভাল একটা স্কুলে তিনি তাকে ভর্তি করে দেবেন। আর বলাই বাহুল্য, সে থাকবে তাঁর বাড়ীতে বাড়ীর ছেলের মতই।

বাড়ীর ছেলের মতই সনত থেকে এসেছে কলকাতায় রমানাথবাবুর বাড়ীতে সেই পনেরো বছর বয়েস থেকেই। কলকাতার স্কুল-মাত্রেই যদি ভাল স্কুল হয়, তাহলে সনত নিশ্চয়ই ভাল স্কুলে ভর্তিও হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে দিয়ে যদি মেধার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, সনত একজন মেধাবী ছাত্র। আর প্রতিযোগিতার কথা! সে স্বপ্ন দেখুন সনতের পিতা তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বসে। সনত বুঝে নিয়েছে, ও সম্বন্ধে মাথা ঘামানোটাই পণ্ডশ্রম!

ম্যাট্রিক পাশ করার পর সনত রমানাথবাবুর বাড়ীতে বাড়ীর-ছেলে পদবাচ্য হওয়ার আর এক ধাপ উঁচুতে উঠে পড়ল। তার জন্যে নির্দিষ্ট একখানি ঘরের তক্তাপোষ জুড়ে বই, খাতা, দোয়াত, কলম ছড়িয়ে এসে বসল দশ বছরের কমলা, গৃহস্বামীর বড় মেয়ে। দেখতে দেখতে অধ্যাপনার কাজটা সনতের জীবনে একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল।

প্রাকৃতিক নিয়মে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়। সনত ম্যাট্রিকের পর আই-এ, আই-এ'র পর বি-এ'ও পাশ করে। মেধা, প্রতিযোগিতা, 'মানুষ'—সে-সব কথা কবে, কখন, কিভাবে যেন মনের অতলে চাপা পড়ে যায়। কেবল বেড়ে চলে ছাত্রের সংখ্যা, আর পড়ানোর ঘণ্টা।

বি-এ পাশ করার পর সনতের বাবা জানালেন, শুধুমাত্র পড়ার খরচটাও সরবরাহ করতে আর তিনি পেরে উঠছেন না। বরং তিনি তার

কাছ থেকে আশা না করে পারছেন না, সংসার খরচ বাবদ মাসে মাসে কিছু টাকা। এই সময়েই রমানাথবাবুর চেষ্টায় তাঁরই এক বন্ধুর কারবারে সনত ঢুকে পড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের এক কাজে। সে সময়টা ছিল সম্ভবত উনিশশো একচল্লিশ সালের মাঝামাঝি।

'মানুষ' হওয়ার বাসনা যখন গিয়ে পরিণতি লাভ করল পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরীতে, তখন সনত আরও ভাল একটা চাকরী জোগাড়ের চেষ্টায় হন্যে হয়ে বেড়াতে লাগল। সে-সময়টায় নাগরিক চাকরীর বাজারে যেমন মন্দা, সামরিক চাকরীর বাজার আবার তেমনই তেজী।

কমলা তখন ক্লাস টেন্-এ পড়ছে।

মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে সনত ব্যথা অনুভব করেছিল কমলার জন্যেই বেশী। পড়ায় কমলার যে রকম আগ্রহ আর নিষ্ঠা, তাতে যে-কোন শিক্ষকের অমন ছাত্রীর প্রতি মমতার মাত্রা একটু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

খবরটা শুনলে অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলো অযথা হৈ চৈ সুরু করে দিতে পারে, এই ভয়ে সনত তাদের আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। বাকী ছিল কেবল কমলা।

সনতের মনে হয়েছিল, কমলার কাছে তার এই কাজের জন্যে যেন খানিকটা জবাবদিহি করার প্রয়োজন আছে। কথাটা সাদা-মাঠা ভাবে বলতে গিয়েও কেন যেন তার মুখে কথা সরলো না। কেমন যেন তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে পার-হয়ে-আসা দিনগুলি। একদিন যে কমলা তার কোলে পিঠে চড়েছে, সে আজ কিশোরী! একদিন যে-কমলা তার কাছে কথামালা, পদ্যপাঠ নিয়ে পড়া সুরু করেছিল, সে আজ শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়ছে!

গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে সনত বলেছিল, কমলা, কাল থেকে তো আর তোমাকে পড়াতে পারছি না।

কমলা যেন চমকে ওঠে। বিস্ফারিত চোখে সনতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করে, কেন সনতদা?

কারণটাকে কিভাবে বেশ গুছিয়ে বলবে ভেবে না পেয়ে বলে ফেলে,

আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি। কাল সকালেই ক্যাম্পে হাজিরা দিতে হবে। যতদিন না যুদ্ধ থামছে, ততদিনের চাকরী।

কমলার মুখখানা হঠাৎ যেন কাগজের মত সাদা হয়ে যায়। পাতলা ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে। চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে। হঠাৎ সে সনতের কোলের ওপর মুখ গুঁজে ধরে কেঁদে ওঠে, না না, তুমি যেও না—

সনত আর কোন কথা বলতে পারেনি। হয়তো বলতে সাহস হয়নি। এ-বাড়ীতে সে আশ্রিত। এ-বাড়ীর প্রতিটি মানুষকে সেই চোখে দেখতেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবুও বুকভরা স্নেহ বাঁধ মানেনি। তাই সে নীরবে একরাশ চুলে ছেয়ে-যাওয়া কমলার পিঠখানার ওপর পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে চলেছিল।

যেমন হঠাৎ কমলা সনতের কোলের ওপর আছড়ে পড়েছিল, তেমনিই আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে সনত আর তাকে দেখতে পায়নি।

পরদিন ভোরে যখন সে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তখন গেটের কাছে পেঁছে বারেক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে চেয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল কমলাকে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিল সনত। কমলার কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিল। বুঝবার চেষ্টা করছিল কমলার মনের ভাব।

প্রেম! না, না। অসম্ভব। আশ্রয়দাতা আর আশ্রিত। তারা তো সমান্তরালবর্তি নয়। হয়তো স্নেহ কিংবা মায়া। অনেক দিনের সাহচর্য হয়তো ব্যথিয়ে তুলেছে কমলার মন। গত চার-পাঁচ বছরের নিত্য-কর্মের মধ্যে পড়বে ছেদ। সুদীর্ঘ কালের এই অভ্যাসে লাগবে আঘাত। হঠাৎ এক সময়ে সনত নিজেও অনুভব করে তার ভারাক্রান্ত মন। এ ক্ষেত্রেও তো স্নেহ, সাহচর্য, নিত্যকর্ম, অভ্যাস, সব কিছুই সমানভাবে প্রযুজ্য!

সনতের মনও উতলা হয়ে ওঠে। ভাবে কতদিনে থামবে এই যুদ্ধ। পাঁচ বছর, চার বছর, অন্তত তিন বছর তো বটেই। অনেকখানি সময়। প্রকৃতির নিয়মে এ সময় বহে যাবেই। সময়ের এই স্রোত অনেক

পলি বহে নিয়ে আসবে। আর সেই পলির নিচে তার মত অকিঞ্চিৎকর এক আশ্রিত গৃহশিক্ষকের সমাধি যথেষ্ট মাটি পাবে।

কমলা বয়সে কিশোরী, আর বড়লোকের মেয়ে!

নফর কুণ্ডু লেনের বিরাট বাড়ীটার গেটে এসে রিক্সাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

সনত কিট্‌ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে বেডিংটা হাতে ঝুলিয়ে নিল। গেটের মধ্যে ঢুকে কয়েক পা এগিয়েই কেমন যেন সে চমকে ওঠে। ইট, কাঠ, সুরকি. বালিতে বাড়ীর সামনের সমস্ত প্রাঙ্গনটুকু ছত্রাকার হয়ে আছে।

বছর দেড়েক আগে দ্বিতীয়বার, অর্থাৎ শেষবার যখন সে ছুটিতে এসেছিল, তখন তো তার মনে হয়নি, এ-বাড়ীর কোথাও মেরামতের কোন প্রয়োজন আছে।

তবে?

প্রশ্নটা মনের মধ্যে লেগেই থাকে। কেমন যেন অস্বস্তি জাগায়।

প্রথমবার যখন সনত ওয়ার-লিভ'এ এসেছিল, তখনই নজরে পড়েছিল গৃহস্বামীর শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। প্রথমে সে খুশীই হয়েছিল।

কিন্তু তার সে খুশী কেড়ে নিয়েছিল কমলা।

কমলাই সনতের কাছে অকপটে জানাল, আমার এসব ব্যাপার মোটেই ভাল লাগছে না সনতদা। দেশশুদ্ধ মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে বড়লোক হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এ ঘোর অন্যায়। ওই মোটরে করে যখন কলেজ যাই, তখন কেমন যেন লজ্জা করে। চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকাতে পারি না। তাই একখানা বই খুলে চোখের ওপব রেখে মাথা হেঁট করে যাই। মনে হয়, সকলেই যেন বুঝতে পারছে এ-মোটর কালোবাজারের টাকায় কেনা।

সনত চমকে ওঠে। বিস্ফারিত চোখে কমলার মুখখানার দিকে তাকায়। ভয়ে ভয়ে ভাবে পিতা-পুত্রির মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তার মধ্যে এ কি ভয়াণক বিরোধ!

কমলার ওপর বহুদিন ধরে মাস্টারী-করা মন সনতের মধ্যে জেগে ওঠে। পিতার আচরণ সন্তানের সমালোচনার উর্ধ্বে—এইটাই চিরন্তন নিয়ম।

সনত ধীরে ধীরে উপদেশের স্বরে বলে, শুধু কাকাবাবুর বেলায় বিচার করলে চলবে কেন কমলা। তা ছাড়া সে বিচার করা তোমার ক্ষেত্রে শোভা পায় না। এখন তো শুনতে পাই সমস্ত বাজারটাই কালো হয়ে উঠেছে। সাদা বলে আর কিছুই নেই।

—না, না সনতদা, এভাবে সাফাই গাইতে চেষ্টা কর না, কমলা যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে. যখন নিজের চোখে দেখেছি রাস্তায় রাস্তায় মানুষ একটু ফ্যানের জন্যে কুকুরের মত হণ্যে হয়ে বেড়িয়েছে, ফুট-পাথের একটা মানুষ মরে কাঠ হয়ে আছে, তখন সবার আগে মনে পড়েছে বাবার কথা। বাবাকেই আমি দায়ি করেছি ওই মৃত্যুর জন্যে। বাবার ওপর ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠেছে।

পরবর্তি বার, অর্থাৎ দেড় বছর আগে দ্বিতীয়বার সনত যখন ছুটিতে এসেছিল, তখন কমলার মুখে চোখে খুশীর আভাষ ফুটে উঠলেও, কথায় বার্তায় সে অনেক গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

ক্যাম্পে ফেরার জন্যে রওনা হওয়ার দিন সনত যখন বিছানা বাঁধছিল. তখন কমলা দাঁড়িয়েছিল দরজার গোড়ায় একটা কপাট ধরে। সনতের অভ্যাস্ত হাতে ক্ষিপ্র গতিতে ওই বিছানা বাঁধা দেখতে দেখতে কমলা প্রশ্ন করলে. কবে তুমি ফিরবে সনতদা ?

প্রতীক্ষমানা এই সুর শুনে সনত চোখ তুলে চায় কমলার মুখের দিকে। মুখখানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। এত স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত ভাব কমলার মুখে সনত আর কখনও দেখেনি। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন বল তো ?

—বলই না, শুধু এইটুকু উত্তরই দেয় কমলা।

যুদ্ধের আয়ুষ্কাল তখন শেষ হয়ে এসেছে। ইউরোপের যুদ্ধের শেষ তখন আসন্ন। সোবিয়েতের লাল ফৌজ দুর্নিবার বেগে ধেয়ে চলেছে বার্লিন অভিমুখে। বার্লিনের পতন মানেই এ-যুদ্ধের শেষ।

সনত বলল, আশা করছি আর বছরখানেকের মধ্যেই ফিরতে পারব।

কমলা ক্লান্ত স্বরে বলে, যবেই তুমি ফিরে আস, এখানে একবার না এসে যেন তুমি অন্য কোথাও চলে যেও না।

প্রাঙ্গণটুকু পার হয়ে এসে রোয়াকে উঠে সনত দেখলে সমস্ত এক-তলাটা ভেঙে-চুরে নতুন করে ঢেলে সাজা হচ্ছে। ওই একতলারই এক কোণে এই রোয়াকের কোলে ছিল তার সেই ছোট্ট একফালি ঘরটি। সে ঘরও ভাঙা হয়ে গেছে। সেখান থেকে উঠেছে দোতলায় ওঠার নতুন চওড়া সিঁড়ি।

সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে সনতের প্রথম কথা মনে পড়ল, তাহলে কি তার পাটও চুকলো এখান থেকে!

অভিমানের মত কি যেন একটা তার মনের কোন্ এক গোপন কন্দর থেকে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসছিল। মাঝপথেই সনত সাবধান হয়ে যায়। হ্যাঁ, এ-আভাষ তো কমলা দেড় বছর আগেই তাকে দিয়েছিল। তবে কিসের অভিমান! কার ওপর অভিমান! আশ্রয় দিয়েছিলেন তাকে রমানাথবাবু, যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ তাকে দিয়ে-ছেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। তারপর আর কি!

ধীরে ধীরে নতুন সিঁড়ি বেয়ে সনত ওপরে উঠতে থাকে। আবার কেন যেন তার মনে পড়ে যায়, আর কিছুদিন আগেও এই সিঁড়ির বদলে ওখানে ছিল তারই ঘর। ওই একফালি ঘরটাকে বাড়ীর সকলেই বলত 'সনতের ঘর'।

ঘরটার সঙ্গে এমন বিশেষ কোন স্মৃতি জড়িয়ে নেই যার জন্যে তার মন কেমন করতে পারে। ছিল একটা চার ফুট চওড়া তক্তাপোষ, তার ওপর পাতা থাকতো তেলচিটে-ধরা একটি সতরঞ্চি। ওই তক্তা-পোষের ওপর বসে নিত্যনিয়মিত পড়াশুনা করেছে কমলা। তারপর একটির পর একটি করে তার ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সেই পড়ার মিলিত কলরব সহসা যেন তার কানে বেজে ওঠে।

সনতের গতি মন্থরতর হয়ে আসে। তার জীবনের গত একটা যুগের ইতিহাস ছিল ওই ঘরটা। কিন্তু সেই ঘরটা আজ আর নেই।

এমনি করেই বুঝি তার জীবন থেকে অতীত গেল মুছে। এইবার তাকে দাঁড়াতে হবে নতুনের মুখোমুখি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিজেরই ভবিষ্যদ্বাণী যেন তাকে ব্যঙ্গ করে ওঠে। জীবনটাকে তো অত সরল মনে হচ্ছে না! এখনই এসে পড়েছে থাকার প্রশ্ন। এ-বাড়ীতে তার মেয়াদ সম্ভবত সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সুতরাং এই কলকাতা শহরেই তার একটি আস্তানা চাই। দেশে তার সবই আছে, কিন্তু অন্ন নেই।

ঢাকা বারান্দাটায় গিয়ে পৌঁছতেই বাচ্চার দল প্রচণ্ড উল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল। কিট্ ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মেঝেয় রাখার সঙ্গে সঙ্গেই একজন তার ওপর অশ্বারূঢ় হয়ে পড়ল। আর একজন মাঙ্কি ক্যাপটা চেয়ে নিয়ে মাথায় চড়িয়ে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লেফ্‌ট্-রাইট্ করেই চলল। তৃতীয়জন প্রশ্ন করল, সনতদা তোমার রিভলভারটা কই? আমাকে ছুঁড়তে শিখিয়ে দেবে তো?

সনতের মনটা মুহূর্তে হাল্কা হয়ে যায়। এরা তেমনই আছে। ঠিক সেই রকমই জীবন্ত আর উদ্দাম, আর বোধহয় তেমনই আপন!

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কেন কমলা আজ থেকে দেড় বছর আগে ওকথা বলেছিল? সে কি মনে করেছিল, লড়াই থেকে ফিরে সে নিজেই এখানে আসবে না! হা-হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে সনতের। কমলা কি আশা করেছিল, লড়াই থেকে সে ফিরবে হয় সিন্ধবাদের মত অগাধ ধনসম্পত্তি নিয়ে, নয়তো আই, সি, এস'দের মত মোটা মাইনের পাকা চাকরী নিয়ে! না, না, এমন কথা ভাববার মত নির্বোধ অন্ততঃ কমলা তো নয়ই।

বাচ্চাদের কলরব শুনে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন কাকিমা আর তাঁর পেছন পেছন কমলা।

সনত তখনও ঘুরে ঘুরে সমস্ত জায়গাটা পরিদর্শন করছে। সোফা, কৌচ, টিপয়, সেন্টার-টেবল, হ্যাটর্যাক, মেঝেয় পাতা পুরু কার্পেট। দেয়ালে দেয়ালে ছবি। হরেক রকম! বিলেতি ল্যান্ডস্কেপ, ঈগল ও শিকারীবাজ, এমনকি অর্ধনগ্ন মেমসাহেব!

কেমন যেন অসহায় চোখে সনত তাকায় কমলার দিকে।

কমলা মুখ টিপে হাসছে। হয়তো সনতের মনের অবস্থাটা আন্দাজ করতে পেরে কৌতুক অনুভব না ক'রে পারছে না।

কমলাই প্রথম কথা বলে, সে পুরনো বাড়ী আর নেই সনতদা। আগাগোড়া সবই নতুন ক'রে ঢেলে-সাজা হচ্ছে। আচ্ছা, এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে তোমার মনে হচ্ছে না, যেন তুমি ক্যামাক স্ট্রীটের কোন বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আছ? কিন্তু আমাদের রাস্তাটার নাম এমন বিশ্রী!

কাকিমা রাগতস্বরে বলে ওঠেন, আচ্ছা কমলি, তোর ওইসব আজে বাজে কথা যখন-তখন যাকে-তাকে না বললেই নয়।

বিরক্তির ঝাঁঝে একটু ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এসে ব'সে পড়েন একটা কৌচে। সনতকে বলেন, তুমি ব'স বাবা সনত।

সনত একটা কৌচে সন্তর্পণে বসল। সন্তর্পণে এই জন্যে যে, সে জানে. ওগুলোর তল্ বড় গভীর। কোথায় তার তল্, সে মাপটা জানা না থাকলে বেকুব ব'নতে হয়।

কমলা এসে দাঁড়াল মায়ের পেছনে।

কাকিমা বললেন, বড় আনন্দ হচ্ছে বাবা, ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে এসেছ।

সনতের মনটাও ব্যথিয়ে ওঠে। সে বলে, হ্যাঁ কাকিমা ফিরেই এসেছি। আর ফিরে যেতে হবে না।

কাকিমার চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। আপন মনেই যেন ব'লে যান. হ্যাঁ বাবা. সেই ভাল। মায়ের মন অতশত বোঝে না। ছেলেমেয়ে কাছে না থাকলে মনটা হুহু করতে থাকে। সে যেন এক কাঁটার মত সর্বদাই খচ্‌খচ্ করে বিঁধতে থাকে।

সনত চোখ তুলে কাকিমার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কাকিমাকে ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ে কমলার ওপর। কৌতুকের সে হাসি কখন যেন মিলিয়ে গেছে। ব্যথায় তার সমস্ত মুখখানা করুণ হয়ে উঠেছে।

কাকিমা ঘাড়টা পেছনে হেলিয়ে বললেন. যা মা, রেফ্রিজারেটর থেকে সনতের জন্যে কিছু মিষ্টি আর ঠান্ডা জল এনে দে। যে গরম পড়েছে।

কমলা বললে, তার আগে ওই ধরাচুড়াগুলো ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দিক্।

আবার সেই কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে কমলার মুখে চোখে। মুখটা নামিয়ে এনে মায়ের কানে কানে বললে, অন্তত আজকের দিনটা থাকবার মত একটা ব্যবস্থা তো করতে হয় সনতদার জন্যে।

কথাটা সনতের কানে গিয়েছিল। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে। তাকে নিয়ে তাহলে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার জন্যে এ বাড়ীতে যে জায়গাটা এক যুগ ধরে ছিল, সেটি আর নেই!

কাকিমার মুখের দিকে চেয়ে সনতের বড় মায়া হয়। তাঁর মুখখানা কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠেছে।

সনত বললে, আমি ভাবছি, আজ বিকেলেই দেশে যাব। কিছুদিন সেখান থেকে তারপর না হয় ফিরে আসবখন।

কাকিমার মুখখানা প্রশান্ত হয়ে ওঠে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি কোচে গা এলিয়ে দিলেন।

কমলা কিন্তু তখনও মুখ টিপে হাসছে।

সেই দিনই সনতের দেশে যাওয়া হ'ল না।

কাকিমাই বারণ করলেন। রমানাথবাবু সেদিন বিশেষ কি এক কাজে সকালে বেরিয়েছেন, ফিরতে সম্ভবত রাত হবে। সাধারণ ভব্যতার চেয়ে ব্যবস্থাটার পাকাপাকি হওয়াটাই ছিল কাকিমার কাছে প্রধান প্রশ্ন।

কাজেই কাকিমার নির্দেশমত সনতের জন্যে স্বল্প মেয়াদী একটি আলাদা ঘর আবিস্কার করতেই হ'ল। সেটি হ'ল তেতলার ছাদে করগেট্ টিনের ছাদবিশিষ্ট আড়াই ইঞ্চি দেয়ালের একটি ঘর।

এ ঘরটা আগে ছিল না। সনত যখন এ বাড়ীতে বাড়ীর-ছেলের মতই ছিল, তখন এ বাড়ীতে স্থানাভাবের কোন আশঙ্কা কোন দিনই দেখা দেয়নি। এ ঘরটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সনত ইতিপূর্বে কিছুই জানতো না।

চাকর-বাকরেরা কোথা থেকে খুঁজেপেতে সনতের সেই পুরনো তক্তাপোষটা তুলে দিয়ে গেছে। বোধহয় ঘরটাতে ঝাঁটপাটও দিয়েছে একটু-আধটু। ঘরের মধ্যে ঢুকে সনত প্রথমে কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। ঠিক ঘর ব'লে তো মনে হচ্ছে না! অনেকটা যেন গুদামের মত! হাত দশেক চওড়া আর বিশহাত লম্বা এক দালান বিশেষ! একখানার

ওপর একখানা ইট খাড়া ক'রে পেতে গাঁথা। ইটের খাঁজগুলো সিমেন্ট বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া। আর প্রায় ছাদের কাছাকাছি দু'ফুট লম্বা-এক ফুট চওড়া কয়েকটা ঘুলঘুলি মোটা তারের ঘন জাল দিয়ে ঢাকা।

দুপুরের খাওয়ার সময় কাকিমা সামনে এসে বসেছিলেন। সনত কোন প্রশ্ন না করলেও তিনিই কৈফিয়তের সুরে বলেন, দেখ সনত, ব্যাপারটা হয়েছে কি, উনি ঠিক করেছেন এক তলার সমস্তটাই ভাড়া দেবেন। তারই জন্যে একটু-আধটু অদল বদল করতে হচ্ছে। আর, লড়াই থেকে ফিরে তুমি যে আর এখানে থাকবে না, এইটাই উনি ধ'রে নিয়েছেন। আর কেনই বা এখানে থাকতে যাবে বল! মিলিটারী থেকে ফিরেছ, এবার ভাল চাকরী বাকরী পেয়ে যাবে। বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হবে। বেচারী তোমার মা, হয়তো এবার একটু সুখের মুখ দেখবে।

সনত মুখে গ্রাস তোলার ফাঁকে একবার কাকিমার মুখের চেহারাটা দেখে নেয়। নিজের দুর্দৈবের চেয়ে তাঁর জন্যেই ভাবনাটা তাকে পেয়ে বসে। সরল সাদাসিধে বাঙলা দেশের মা, হঠাৎ বড়লোক হয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন! সদিচ্ছা আর সুকৌশল, এই দুয়ের মাঝে কেমন যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন!

সনত বললে, আমিও তাই ভেবেছিলাম কাকিমা। তেমন চাকরী যদি পাই, তাহলে কলকাতায় বাসা নেব। আর তা না হয়তো দেশ থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করব।

কাকিমার বুক খালি করে আবার সেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। ওতেই সনত খুশী হয়। হোক্ না, সে একটা মন-রাখা মিথ্যে কথাই বলেছে।

খাওয়ার পর বিশ্রামের জন্যে সনত যখন তেতলার ঘরে পদার্পণ করল, তখন তার মাথায় হিসেবটা ঘুরছিল, তাহলে তার মেয়াদ এই ঘরেই বা আর কতদিন! একতলার কাজ শেষ হলেই, দোতলায় সামান্য টুকিটাকি সেরে মিস্ত্রীরা উঠে আসবে তেতলায়।

এ হেন সময়ে ঘরে এসে ঢুকল কমলা।

সনত ঠিক এমনটি আশা করেনি। আকস্মিক এই ঘটনায় কেমন যেন সে থতমত খেয়ে যায়। কিছুটা ভয়ও পায়।

সনতের ওই ভাব বৈলক্ষণ্য দেখে কমলার মুখখানা রাগে আর ক্ষোভে লাল হয়ে ওঠে। আরক্ত মুখে বলে, ভয় নেই সনতদা, তেমন কোন মতলব নিয়ে আসিনি। এসেছিলাম তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলতে।

সনতের আড়ষ্টতা তবুও যেন কাটে না। তার মোটেই ভাল লাগছে না, এই নির্জন দুপুরে এমনভাবে একলা কমলার তার ঘরে আসা! কি দরকার পড়ছে! সব দরকারই তো মিটে গেছে। সে চাইছে কঠিণ হয়ে উঠতে। চাইছে দৃঢ় কণ্ঠে কমলাকে নেমে যেতে বলতে। তবুও পারছে না। বহুদিনের অভ্যাস। এ বাড়ীর সকলেই তার আশ্রয়-দাতার পর্যায়ে।

তক্তাপোষটার ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সনত বলল, বস।

বসার কোন লক্ষণ না দেখিয়েই কমলা বলল, যদিও এসেছিলাম অন্য কথা বলতে. কিন্তু এখন দেখছি, আগে তোমার ভয়টা ভাঙা দরকার। তুমি হয়তো আমার রকম-সকম দেখে ভাব, হয় আমি পাগল, নয় রোমাণ্টিক। নিজের কথা নিজের মুখে বলা বড় শক্ত সনতদা, আর বললেও হয়তো বিশ্বাস করবে না। তবুও তোমার কাছে আমাকে বলতেই হবে। পাঁচ বছর আগে তোমার মিলিটারীতে যাওয়ার কথা শুনে আমি যে ছেলেমানুষি করেছিলাম, তার ওপর কোন আস্থা বেথ না। কিন্তু আজ যখন আমার মত বড়লোকের মেয়ে তোমাব মত এক ভ্যাগাবণ্ডের কাছে উপযাচিকা হয়ে আসে. তখন প্রথমেই তোমার মনে হবে বড়মানুষি খেয়ালের কথা। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর আমার মনেব কাছে আমি যে আজও নিজেকে বড়লোক ভেবে খুশী হতে পারছি না। বাবা যেভাবে বড়লোক হয়েছেন এবং ক্রমশই হচ্ছেন, তাতে আমি এই বড়লোকের মেয়ে হওয়া থেকে মুক্তি চাই। কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে আমি, আমাদের মুক্তির কথা আজও রূপকথার গল্প! তাই আমি চাই আমার পরিচয়ের পরিবর্তন। আমি হতে চাই গরীবের বউ।

সনত যেন আর্তনাদ করে ওঠে, এ কি বলছ তুমি কমলা!

কমলার মুখখানা স্নেহমাখা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, ভয় পেয়ো না সনতদা, আমাকে ছেলেমানুষ মনে কর না। মনে কর না যেন, আমি তোমার সেই প্রথম ছাত্রী। সে সব দিনকাল,

মানুষে মানুষে সে-সব সম্পর্ক ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেছে। আজ যেমন আমাদের বাড়ীতে সবই নতুন, তেমনি এই নতুনের মধ্যে আমিও আর এক নতুন। আমার ভাল লাগে তোমাদের মত মানুষদের, যারা মরণপণ সংগ্রাম করে জীবনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে, বাঁচার-মত-করে-বাঁচার জন্যে মরণের মুখোমুখি হতেও ভয় পায় না। তোমার হাত ধরে সনতদা, আমি যে কোন অবস্থার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

বিস্ফারিত চোখে সনত কমলার দিকে চেয়ে থাকে। কমলা, সেই ছোট্ট বেণীদোলানো কমলা, তার ছাত্রী কমলা, পিতার নীচতায় ব্যথায় মুহ্যমান কমলা। সেই কমলা আজ দাঁড়িয়ে তার সামনে জীবনকে জয় করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিজয়িনীর দৃপ্তভঙ্গিতে।

এক পা এগিয়ে যায় সনত। অসহায় হাত দুটিকে নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে, হাত কচলাতে থাকে। ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে, এ কোথায় এসে তুমি পৌঁচেছ কমলা! সত্যি বলছি, তোমার সমস্ত কথা আর ব্যবহারকে এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছেলেমানষিই মনে করেছিলাম। কিন্তু, এখন তোমার কথার জবাবে কিই বা আমি বলতে পারি!

—বলতে পারতে সনতদা, সনতেরই কথার রেশ টেনে বলে যায় কমলা, যদি দেখতে পেতে এই যুদ্ধের আচমকা আঘাতে আমাদের দেশের মেয়েরা কতটা মানুষ হয়ে উঠেছে। তুমি বলতে পারতে, নতুন যুগের মেয়ে তুমি—নোলকপরা বউ না হয়ে, এসো তুমি আমার চিরজীবনের সাথি হয়ে।

সনত গভীর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আর কিছুক্ষণ আগেও জীবনটাকে যত সমস্যাসঙ্কুল বলে মনে হচ্ছিল, এখন তো আর তা হচ্ছে না। তার জীবনের একাকীত্ববোধই তাকে দুঃখবাদী করে তুলেছিল। সে একাকীত্ববোধ যেন ভোরের আলোয় অন্ধকার সরে যাওয়ার মত ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে করছে কমলার আরও কাছে যেতে। কমলা যেমন একদিন তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে-ছিল, তেমন করে কমলার কোলে মুখ গুঁজে একটু কাঁদবার জন্যে মনটা লালায়িত হয়ে উঠেছে।

কমলা তক্তাপোষটার ওপর বসে পড়ে।

সনত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে তার সামনে।

কমলা মুখটা তুলে বলতে সুরু করে, যাক্ এসব কথা। যে কথা বলতে এসেছিলাম, সেইটা এবার শোন। একতলায় তিনটে ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে দু'কামরার। প্রতিটার ভাড়া আশী টাকা আর সেলামী পাঁচশো। আর এই যে ঘরটায় তোমায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, দুর্ভিক্ষের সময় এইটাই ছিল চালের গুদাম। আর বস্ত্র সংকটের দিনগুলোতে এই ঘরে থাকতো গাঁটগাঁট কাপড়।

সনত ঘরের চারিদিকটা আবার একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। প্রথম দর্শনে তারও তো এই ঘরটাকে গুদাম বলে মনে হয়েছিল!

হঠাৎ কমলা সনতের একটা হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আব্দারের সুরে বলে ওঠে, এ ঘরে তুমি বেশী দিন থাকতে পারবে না সনতদা। আমাকে কথা দাও, দেশ থেকে ফিরেই তুমি অন্য কোথাও ঘরের চেষ্টা দেখবে। তুমি এ ঘরে থাকবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

সনতের মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কমলার সস্মিত মুখখানার দিকে অপার বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

সনতের হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে কমলা উঠে দাঁড়াল। আরও কাছে এসে দাঁড়াল সনতের। এতক্ষণের মধ্যে এই বুঝি প্রথম কমলার স্বর কেঁপে উঠল। বললে, অনেকদিন ধরে অনেক কষ্ট পেয়ে আসছি সনতদা। আজ বড় ভাল লাগছে, সব কথা অকপটে তোমাকে বলতে পেরেছি।

কমলার চোখ দুটো বোধহয় ছলছল করে ওঠে। মাথাটা সে নিচু করে নেয়।

সনত কমলার একটা হাত তুলে নেয় নিজের হাতের ওপর। গভীর আবেগে সে চেপে ধরে হাতখানা। কি যেন বলতে যায়। কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না। কেবল তার ঠোঁট দুটো থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে। কম্পমান সেই ঠোঁট দুটো সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কমলার ধরে থাকা হাতখানার শিকর শীতল করপত্রের ওপর চেপে ধরে।

কমলা নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সনত আবেগরঞ্জিত মুখখানা তুলে ধরা-গলায় ডাকে, কমলা—

কমলা যেন চমকে ওঠে। সে চমক এক মুহূর্তের জন্য। তারপর বলে, হ্যাঁ সনতদা, আমিও চাকরীর চেষ্টা করছি. হয়তো শিগ্‌গীরই পেয়ে যাব।

নীরদ আর অতীশ যখন এসে সনতকে ডাকল. তখন বেলা প্রায় চারটে।

বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই আট থেকে পাঁচের মধ্যে গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করে, কাকে চাই?

নীরদ বলল, সনত আছে?

জ্যেষ্ঠটি সরাসরি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলে, আছে তো, কিন্তু ঘুমোচ্ছে যে।

অতীশ বললে, এখনও ঘুমোচ্ছে. সে কি!

কথাটা বোধহয় জ্যেষ্ঠটির মনের মতন হয়। সারা একতলাটা জুড়ে কত কাণ্ড কারখানা চলেছে, আর এমন সময় সনত কিনা ঘুমোচ্ছে। অতীশের বিস্ময় তার মনের মতন করে তারও মনে লাগে। নাকে সুরে বলে ওঠে, সেই কখন থেকে ঘুমোচ্ছে।

নীরদ বললে, যাও দেখি, কে আগে সনতকে ডেকে তুলতে পারে।

নীরদের কৌশল কাজে লাগল না। জ্যেষ্ঠটি তার ছোট বোনটির ওপর হুকুম জারি করলে. বুঁচি, যা তো, সনতদাকে ডেকে দে।

বুঁচি দৌড়ে চলে গেল।

নীরদ জ্যেষ্ঠটির আরও কাছ ঘেঁষে এসে বললে, তুমি তো দেখছি খুব ব্যস্ত!

জ্যেষ্ঠটি হাতের কর্ণিকটি তুলে ধরে বললে. বুঁচি আর বাটুমকে বাড়ী তৈরী করা শিখিয়ে দিচ্ছিলাম।

নীরদ বাটুম নামধেয় পঞ্চম বর্ষীয় শিক্ষার্নবিশটিকে তার দাদার পেছন থেকে টেনে বার করে এনে বললে, বাড়ী তৈরী করতে শিখতে

হলে বুঝি প্রথমে চূণ, সুরকি খানিকটা করে খেতে হয়।

অতীশ আর নীরদ যেভাবে ওদের সামনে উবু হয়ে বসে কুটুম্বিতা সুরু করে দিয়েছে, তাতে ওস্তাদজী প্রমাদ না গুণে পারে না। কাজেই আপদ বিদায় করার উদ্দেশ্যে সে বাটুমকে হুকুম করে, বাটুম, এদের ওপরে ড্রইং রুমে নিয়ে যাও।

বাটুম সসঙ্কোচে এগিয়ে যায়।

কিন্তু এবার প্রমাদ গোণে নীরদ আর অতীশ। নীরদ সন্ত্রস্ত ভাবে বলে ওঠে, না না, ওপরে ড্রংইরুমে নয়। আমাদের নিয়ে চল সনতের ঘরে।

জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে, সনতদার ঘর তো কবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সনতদা এখন তেতলার ঘরে আছে। দোতলাতেই তো এখন বসবার ঘর হয়েছে। সকলেই ওখানে বসে।

বাটুম কিন্তু নীরবে দলপতির হুকুম তামিল করে চলেছে। গুটি-গুটি এক পা, এক পা করে সে এগোচ্ছে আর থেকে থেকে পেছন ফিরে ফিরে দেখছে অভ্যাগতরা তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

নীরদ আর অতীশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অগত্যা বাটুমকে অনুসরণ করে।

ড্রইংরুমে, অর্থাৎ দোতলার ঢাকা বারান্দায় এসে নীরদ আর অতীশ আরও একবার দৃষ্টি বিনিময় করে। সোফা কৌচের জৌলুষ লক্ষ্য করে বসার কথা মাথায় আসার আগে কত তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়া যেতে পারে, সেই চিন্তাই অগ্রাধিকার পেয়ে বসল।

বাটুম তাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে কোন ফাঁকে যে নিচে নেমে গেছে সেটা ওরা কেউই লক্ষ্য করেনি।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অতীশ নীরদের কানে কানে বলল, ব্যাপার কি বলতো!

অসহায়ভাবে কাঁধ কুঁচকে নীরদ বলল, কেমন কেমন যেন লাগছে।

ভেতরের দরজা দিয়ে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল কমলা। নীরদ আর অতীশকে দেখে সোল্লাসে বলে উঠল, ও মা, আপনারা এসেছেন!

যে চতুর্দশী কিশোরীকে নীরদ আর অতীশ শেষবারের মত দেখে-

ছিল. সে কমলা যে এ নয়, এই ঘটনাই ওদের সচকিত করে তোলে।

নীরদ বললে, ওঃ, তুমি যে ভীষণ বড় হয়ে গেছ!

কমলা অভিমানের সুরে বলল, এত বড় মনে হত না, যদি এই পাঁচটা বছর আমাকে একেবারে ভুলে না যেতেন।

নীরদ আর অতীশ দু'জনেই বিব্রত বোধ করে। ঠিক এ ধরণের একটা উত্তর যে কমলা দিতে পারে. এইটাই তারা কেউই আশা করতে পারেনি। হয়তো দু'জনেরই মনে একটি কথাই আনাগোনা করছিল. সনতের মাধ্যমে কমলার দাদা হিসাবে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তিতে হয়তো আসা চলতে পারতো। কিন্তু সনতেরই বা কি পরিচয় এই বাড়ীতে!

বুঁচির সঙ্গে সনত এসে হাজির হল চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

কমলা বলল. এই দেখ সনতদা, তুমি ফিরে এসেছ, আবার যেন পুরনো জীবন একে একে ফিরে আসছে।

নীরদ কুশল বার্তা সুরু করল, তারপর কেমন আছ বল কমলা। পড়াশুনা করছ তো?

সলজ্জ হেসে কমলা বলল. বি, এ, পরীক্ষাটা তো এবার দিলাম।

অতীশ যেন বিস্ময়ে বেসামাল হয়ে পড়ে। বলে ওঠে, বল কি! তাহলে শুধু তুমি দেখতেই বড় হওনি। সত্যি সত্যিই বড় হয়েছ!

সনত কমলার মুখের দিকে চেয়েছিল। সে দেখছিল কমলার আর এক রূপ। এ রূপ সে দৃপ্ততেজ বিজয়িনীর নয়। এ যেন এক শিশু। সেই লজ্জা আর খুশীর সংমিশ্রনে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, যে লজ্জা আর খুশী এক বালিকাকে মা বলে ডাকলে সে অনুভব করে।

খুশীতে উচ্ছ্বল কমলা বললে. তাহলে আপনারা তিন বন্ধুতে গল্প করুন। আমি যাই।

পুরনো জীবন! তিন বন্ধু! কমলা যেন আবহাওয়াটা করুণ রসে রসিয়ে দিয়ে চলে গেল। নীরদ. অতীশ আর সনত সেই কথাটারই জের টেনে চলেছিল মনের মধ্যে।

পুরনো জীবন! সনত ভাবছিল. কিসের মধ্যে কমলা পুরনো জীবনের স্বাদ ফিরে পেলে! কমলা নিজেই যে আনকোরা নতুন। তারা

তিন বন্ধু! কিন্তু তারা তো এমন কার্পেট বিছানো ঘরে সোফা কৌচে বসতো না।

নীরদ এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এখানকার সবই তো দেখছি নতুন। ব্যাপার কি হে!

সনত মুচকে হেসে বললে, ব্যাপারও সবই নতুন।

অতীশ বলে ওঠে, নতুন তো বটেই। তা না হলে তোমার সেই তক্তাপোষ আর তেলচিটে সতরঞ্চির বদলে আমরা কিনা বসে আছি সোফা কৌচে!

নীরদ বললে, তা যা বলেছ অতীশ। এই সোফা কৌচে বসাটা ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েছে মিলিটারী থেকে ফিরে আসার মতই অস্বস্তিকর।

ভ্রূ কুঁচকে সনত প্রশ্ন করে, বল কি হে, মাসখানেক আগে ফিরেও হালে পানি পাচ্ছ না!

—হালে পানি কি বলছ সনত, অতীশ উত্তর দেয়, ইতিমধ্যেই হাঁপানি ধরে গেছে। ভাল করে নিঃশ্বাসই নিতে পারছি না। মনটা সর্বদা পালাই পালাই করছে।

সনত আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললে, তাহলে এই একটা মাস করলে কি!

—করব আর কি, সনতের কথার উত্তরে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে অতীশ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে এসেছি। সপ্তাহে একবার করে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছি, 'কি হল দাদা।' কিন্তু তাদের দরদ কত! বলে, এত গরম গরম চাকরী করবেন কি করে! একটু সবুর করুন, পাখার বাতাস দিয়ে জুড়িয়ে দিই।

সনত আর নীরদ দুজনেই হেসে ওঠে। সেই সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় অতীশ। মিলিটারী ক্যাম্প ছেড়ে বেরোনোর পর এমন করে হাসবার মত পরিস্থিতি আর বোধহয় সনত পায়নি। প্রাণখোলা খানিকটা হাসি। হঠাৎ তারও মনে হল, পুরনো দিনগুলো বুঝিবা এমনি করেই ফিরে আসবে।

উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করে সনত। তারপর নীরদের সামনে এসে বলে, তুমি কি করছ নীরদ?

নীরদ বললে, আঁকাকে এখনও আঁকড়ে রয়েছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আঁকাকেই তোমার প্রফেসন করতে হবে নীরদ।

নীরদ হেসে ওঠে, তাহলেই হয়েছে! আঁকাকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে আমি বিড়ির লেবেল্ আঁকতে সুরু করেছি। বেচারা অবনীন্দ্রনাথ এখনও বেঁচে আছেন, শুনলে হয়তো তিনি আত্মহত্যা করে বসতেন।

অতীশ বলে ওঠে, অবনীন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করবেন কিনা জানি না, কিন্তু তোমাকে তার অনেক আগেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে নীরদ। ওসব ভাবের ঘোরে থাকা চলবে না।

সনত সবিস্ময়ে অতীশের মুখের দিকে তাকায়।

অতীশ আবার বলে, ওসব আর্ট-ফার্ট ছেড়ে দাও সনত। একটি কথা সাফ জেনে নাও, টাকা চাই, মোটা টাকা। টাকার কদর চিরদিনই ছিল, কিন্তু এমন টাকাসর্বস্ব যুগ কোনকালে ছিল না।

—ব্যাপার কি অতীশ! সনত গভীরভাবে অতীশের রাগত মুখখানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

—ব্যাপার আর কি, আমি তো পাগল হওয়ার জোগাড়, অতীশ রুদ্ধ আবেগে বলে যায়—এখন দেখছি ফিরে না আসাই ছিল ভাল। তখন পাঁচ সাত, দশ দিনের জন্যে আসতাম, সকলকেই স্নেহ, মায়া, ভালবাসার অবতার বলে মনে হত। মনে হত আমারই পথ চেয়ে তাঁরা কোনরকমে প্রাণটাকে ধরে রেখেছেন। কিন্তু এখন তো দেখছি উল্টো। ইতিমধ্যেই আমার ছোটমামাটি বল্টু টাইট্ দিতে সুরু করেছেন। হয় মাসের টাকা বাড়াও, নয় পথ দেখ। আচ্ছা বলতো, এরা মানুষ না কি! কৃতজ্ঞতা বলে কোন বালাই নেই! মিলিটারীতে ঢোকার সুরু থেকে রেগুলার টাকা দিয়ে এসেছি মাসে মাসে। তখন তো আর বিয়ে করিনি। আর এখন শুনেছে, কিছু নগদ টাকা আছে হাতে, অমনি কাঁদুনি গাইতে সুরু করেছে।

সনত চুলের মধ্যে দুটি হাত ডুবিয়ে দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে।

ক্ষণেক চুপ করে থেকে অতীশ আপন মনেই ভেঙচে ওঠে, ভারী তো টাকা! ও ছ'সাতশো টাকায় কি হবে! ফিরে এসে সিভিলিয়ান সাজতেই তো বেরিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা। জানো, মামাটা এমন চসম-

খোর, মালতীর জন্যে একখানা আটপৌরে শাড়ীও কিনে দেয়নি। সে বেচারি পড়ে পড়ে বিয়ের সময় পাওয়া দামী দামী জামা কাপড়গুলো পরে বেড়াচ্ছে। মাসে পঞ্চাশটি করে টাকা পাঠিয়েছি, তাতে একটি লোকের খাওয়ার পর এক বছরে একজোড়া কাপড় হয় না! জানো সনত. ফিরে এসে দেখছি, মানুষগুলো অনেক নোংরা হয়ে গেছে!

সনত বলল, কিন্তু অতীশ, এক কথায় মানুষগুলোকে এমনভাবে বাতিল করে দিলে আমরাই বা থাকি কোথায়! অনেক ঝড়ঝাপটা এদের ওপর দিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট, চড়া-দাম. এই সবের সঙ্গে এদের প্রতিদিন যুঝতে হয়েছে। এসবের কোনটাই আমাদের পোহাতে হয়নি। আমরা হয়তো আমাদের পুরনো মন নিয়ে এদের ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঁচি এসে খবর দিলে সনতকে, মা তোমাকে ডাকছে সনতদা।

সনত উঠে গেল।

কাকিমা বললেন, মহা মুস্কিল হয়েছে সনত। কি করা যায় বল তো?

সনত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কিসের মুস্কিল কাকিমা!

—রেশনের চিনি তো প্রায় শেষ হয়েছে। বাচ্চাকাচ্চাগুলোরই হয়তো কাল থেকে জুটবে না। ওদের তো চা দেওয়া যাচ্ছে না।

সনত মুহূর্তের তরে স্তম্ভিত হয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে অতীশের শেষ কথাটা। কিন্তু সে ভাব সে কাটিয়ে দেয় পলকের মধ্যে। বলে, তাতে আর কি হয়েছে! আমরা তো এখনই বাইরে যাব। কোন দোকানে খেয়ে নেবখন।

বাইরে বেরোনোর জন্যে একেবারে তৈরী হয়ে সনত ঢাকা-বারান্দায় ফিরে এল। বললে, চল, তিনজনে মিলে সেই আগেকার মত রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরে আসি।

অতীশ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে সনতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কিন্তু আগেকার মত সেই মুড়ি আর চা!

সনতের মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তিন কাপ চা যে কাকিমা তাদের দিতে পারতেন

না, এ কথা সে কোন যুক্তি দিয়ে মানতে পারছে না।

নীরদ লক্ষ্য করেছিল সনতের ভাব বৈলক্ষণ্য। অতীশের পিঠে একটা চাপড় মেরে সে বললে, লোকের বাড়ী আব্দার করে চেয়ে খাওয়ার দিন চলে গেছে অতীশ। মুড়ি আর চা খাওয়ানো এখন সোজা কথা নয়।

অতীশ বারান্তরে নীরদ আর সনতের মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে একটু বেশী জোর দিয়েই বললে, তা যা বলেছ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীরদ বললে, আর সবার ওপর হয়েছে এই জিনিসের দর। এই একমাসে এখনও রপ্ত করতে পারলাম না। দর শুনলে কি ইচ্ছে করে জানো? দোকানদারের গালে টেনে একটি চড় মারতে। আর এই নিয়ে হয়েছে আর এক জ্বালা। অনীতার সঙ্গে নিত্য খিটিমিটি, রাগারাগি লেগেই আছে। শেষ পর্যন্ত এই বাজার দর নিয়ে না দাম্পত্য প্রেমে ফাটল ধরে যায়!

সনত বললে, আহা ব্যাপারটা কি খুলেই বল না।

—খুলে বলার তো কিছু নেই। তুমি পারবে চার আনা গজের একটা ছিট্ পাঁচসিকে দিয়ে কিনতে? অনীতা সেদিন দেখি বাচ্চাটার জন্যে ওইরকম একটা ছিট্ কিনছে। দাম শুনে আমার মাথায় গেল আগুন চড়ে। তেড়ে গেলাম ফেরীওয়ালাটার দিকে। অনীতা তার সামনেই আমাকে বললে, মিলিটারী মেজাজ ফলানোর জায়গা এটা নয়। এই-ই বাজার দর। এই নিয়ে লেগে গেল তর্ক। রাগের মাথায় বলে বসলাম, জানের বিনিময়ে আমরা করেছি পয়সা রোজগার, আর ঘরে বসে তোমরা উড়িয়েছ সেই পয়সা। ব্যাস্, কথা বন্ধ তারপর দু'দিন।

চায়ের একটা দোকানে ঢুকে সনত হাঁকল, চা দিন তো তিন কাপ।

অতীশ সনতের কানের কাছে মুখ এনে বললে, দু'আনা করে কাপ, মনে থাকে যেন।

সনত বললে, তার মানে ছ'আনা। তাহলে আগেকার মত মুড়ি আর চা খেতে কত খরচ হতে পারতো! কতটা মুড়ি আমরা তিনজনে খেতাম অতীশ?

অতীশ মাথা চুলকায়, সের হিসাব করে মুড়ি তো কোনদিন খাইনি সনত। আর তার ওপর ওটা এমন একটা বেয়াড়া জিনিষ যে ওর ওজন আন্দাজ করা আমার দ্বারা হবে না।

নীরদ বললে, এই মুড়ি নিয়েও একদিন অনীতার সঙ্গে এক পক্কড় হয়ে গেছে। আমার কাছে পয়সা চাইলে সাড়ে চারআনা। জিজ্ঞেস করলাম, কি হবে। বললে, মুড়ি আনাব। আমি তো আঁতকে উঠলাম, মুড়ি সাড়ে চার আনার! সে তো এক বস্তা! যেই না বলা অমনি অনীতা ফোঁস করে উঠল, সে বোধহয় তোমাদের মিলিটারী ক্যানটীনে। আমাদের এখানে সাড়ে চার আনায় মোটে তিন ছটাক। মুড়ি যখন এল, আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। বড় জোর দুটো লোকের সৌখিন জলখাবার!

সনত তার প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ছেঁকে নিলে নীরদের কথা থেকে, তাহলে আমরা মাথা পিছু, ধর দু'আনার করে মুড়ি খেতাম। তাহলে মোট খরচ হত বারো আনা। ধরলাম, এ'রা না হয় পারতেন এ পয়সাটা খরচ করতে। কিন্তু নীরদ, তোমার বাড়ীতে গিয়ে যদি এইরকম তিন-চারজন মুড়ি আর চা খেতে চায়, তাহলে তো সাধারণ সৌজন্যটুকু বজায় রাখতে গিয়ে এক বেলার খাওয়া ছাঁটাই করতে হয়।

চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে সনতের চক্ষুস্থির। ভেলিগুড়ের উৎকট গন্ধটাই চায়ের ফ্লেভারের কাজ করছে। ঘুরে বসে ছোকরা বয়টিকে ডাকে, শুনে যাও তো ভাই।

নীরদ মুচকে হেসে সনতের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, মিলিটারী মেজাজ হইতে সাবধান।

হয়তো কথাটার প্রয়োজন ছিল সনতের পক্ষে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে গিয়ে সনত কড়া গম্ভীর গলায় বললে, দু'আনা কাপেও কি চিনি দেওয়া যায় না?

ছোকরা হাত কচলে বললে, আজ্ঞে চিনি যে ব্ল্যাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

—কেন, ব্ল্যাকেরও কি ব্ল্যাক হচ্ছে নাকি!

নীরদ ছোকরাটিকে যেতে ইসারা করে বললে, কি যে হচ্ছে সনত,

সেইটাই তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই তো আমরা এমন দিশেহারা!

পাঁচ

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দপ্তরে লাইনের বহর দেখে বিকাশ ভ্যাবা-চাকা মেরে যায়।

সনতেরও আসবার কথা আছে, কিন্তু তখনও সে এসে পৌঁছায়নি। লোক ক্রমান্বয়েই বাড়ছে, পিল্‌পিল্‌ করে যেন কোন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। সকলেই যে মিলিটারী ফেরৎ, এমন মনে হচ্ছে না। অনেকেই মিলিটারী পোষাকে এসেছে, আবার অনেকে এমন পোষাকে এসেছে যাদের দেখলেই বোঝা যায় কোন-না-কোন কারখানায় তারা কাজ করতো।

বিকাশের কাছে ওইটাই একটা প্রশ্ন হয়ে ওঠে, ওরা কেন?

গেট তখনও খোলেনি। আপিসের দরজা জানলা খোলা হচ্ছে, ভেতরে টেবিলচেয়ার ঝাড়-পোঁছ চলেছে। একজন, দুজন করে কেরাণী-বাবু পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকছেন।

গেটের সামনে ভীড়ে তখন উষ্মা জেগেছে। নানান মন্তব্য, টিপ্পনি, বচসা সুরু হয়ে গেছে। বিকাশও ওই ভীড়ের মধ্যে আটকে পড়ে আর সকলেরই মত ঠেলাঠেলি করছে আগে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে।

মিলিটারী পোষাকে বিরাট লম্বা চওড়া একটি লোক বিকাশের কাঁধটা চেপে ধরে ধমক দিয়ে ওঠে, শুধু শুধু ঠেলাঠেলি করছেন কেন! ভেবেছেন বুঝি আগে গিয়ে দাঁড়ালেই আগে চাকরী! ওসব কিছু হবে না মশাই। এ শালা হচ্ছে বৃটীশ গভমেণ্ট। যেমন ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দিয়ে লড়িয়ে লড়াই জিতে নিলে, তেমনি এখানে ধর্ণা দিইয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করে রাখবে।

পাশ থেকে সাধারণ পোষাকে আর একজন মন্তব্য করে ওঠে, বুঝলেন না দাদা, এটি হচ্ছে গব্‌মেণ্টের আর একটি গোঁড়াকল।

বিকাশের কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। মনে পড়ে যায় বছর পাঁচেক

আগেকার আর একটি দিনের কথা। সেদিনও সে এমনি ভীড় ঠেলে আগে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল রিক্রুটিং অফিসারের কাউণ্টারের সামনে যাওয়ার জন্যে। সেদিনও এমনি নানান মন্তব্য, নানান ধরণের টিকা-টিপ্পনি চলছিল অবাধে বুটীশ সরকারের উদ্দেশ্যে।

অবিশ্বাস! এক তিলও বিশ্বাস করে না এই মানুষগুলো এই সরকারকে। তবুও তারাই এসে বারম্বার মাথা কোটে এই সরকারের দরজায়! এক তিলও আস্থা নেই, তবুও এরাই বুকভরা আশা নিয়ে ছুটে আসে। অদ্ভুত এক অবস্থা!

বিকাশ বলে ওঠে, এতই যদি অবিশ্বাস, তবে এখানে এসেছেন কেন!

সাধারণ পোষাকে ছেলেটি মিইয়ে যায়, তবে আর যাবই বা কোন চুলোয়!

মিলিটারী পোষাকে লোকটি খেঁকিয়ে ওঠে, বিশ্বাস আর কাকেই বা করব! অমন একটা বাঁধিয়ে দিলাম আর, আই এন'এ—এই মশাই আপনাদের নেতারা যদি বুটীশের হয়ে দালালী করতে না আসতো, তাহলে আমরাই এই শালা বুটীশদের দিতাম পগার পার করে। কিন্তু তা তো হল না। আবার এই শালা জোচ্চোরদের দরজায় এসেছি ধর্ণা দিতে!

ওই বিরাট বপুওয়ালা মানুষটাকে কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো মনে হয় বিকাশের। ও যে নেভি'র লোক, এইবার সে পরিস্কার বুঝতে পারছে। যে মানুষটা মরণপণ লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল বুটীশ সরকারের বিরুদ্ধে, সেই মানুষটাই এখানে এসে এমন অসহায় কেন!

বিকাশ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে প্রাক্তন নেভি ওই মানুষটির দিকে। লোকটি দাঁতে দাঁত চেপে সবার মাথার ওপরে জেগে থাকা চোখ দুটো দিয়ে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে চেয়ে দেখে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দেয়ালের ইট, কাঠ, পাথরগুলোর দিকে। সে চাহনিতে কি নিদারুণ জ্বালা।

বিকাশ তার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারে না। ও যেন মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছে, কি বিরাট শক্তি নিয়ে ওই লোকটাই চেপে ধরেছিল ব্রেন-গানের গ্রিপ্‌টা, হয়তো অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে ভরে নিচ্ছিল

ড্রাম ম্যাগাজিন, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না তার। আরব সাগরের নীল জলের কোলে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল ভারতের মাটির বুকে। সেদিন তার চোখে এ জ্বালাধরা চাহনি ছিল না। ছিল দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প।

সনত এসে বিকাশের কাঁধে হাত রাখে।

বিকাশ অস্বাভাবিক চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকায়।

সনত বললে, কি হল বিকাশ?

বিকাশ স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে বললে, না কিছু না। ভাবছিলাম আর. আই, এন'এর সেই দিনগুলোর কথা।

সনত আর বিকাশ ভীড়ের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বিকাশ বললে, সনতদা, এখানেও তো সেই একই হাল!

বিস্মিত সনত প্রশ্ন করে, কিসের হাল?

—চাকরীর হাল। মিলিটারীতে ঢোকার সময়ে মানুষে যে কথা বলেছিল, আজও তারা সেই একই কথা বলছে। সকলের মনে সেই একই অবিশ্বাস।

বিকাশের কাঁধে হাত রেখে সনত বললে, এই অবিশ্বাসের রাজত্বেই আমাদের বাঁচতে হবে বিকাশ। চল না. দেখাই যাক—

আবার তারা ভীড়টার দিকে এগিয়ে যায়। গেটের মধ্যে থেকে জনৈক দারোয়ান চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, লড়াই ফেরৎ লোকদের জন্যে আলাদা লাইন, ডান দিকে গলির মুখে।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা, তারপর ধীরে ধীরে একটা গুঞ্জন ভেসে ওঠে। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে—কে মিলিটারী-ফেরৎ আর কে নয়। চাহনির মধ্যে খানিকটা সন্দেহের আভাষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমাট ভীড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হঠাৎ জনকয়েক দৌড়ে যায় ডান দিকের গলির মুখে। তারপর আরও কয়েকজন। দেখতে দেখতে সমস্ত ভীড়টা বিভক্ত হয়ে পড়ল শ্লেষে বিদ্বেষে জরজর দুই দলে।

সনত বললে, এ জিনিসটা কিন্তু আমার ভাল লাগছে না বিকাশ।

এতদিন তো দেশশুদ্ধ মানুষের কাছ থেকে আলাদাই ছিলাম। আবার এখনও কেন!

বিকাশ বললে, বাঃ, তা বললে চলবে কেন। আমাদের দাবি সকলের আগে।

সনত কি যেন বলতে যায়, কিন্তু থেমে গেল একটা চিৎকার শুনে।

জনৈক প্রাক্তন সৈনিক অসামরিক লাইনটায় দাঁড়াতে যাচ্ছিল। লাইনের মধ্যে থেকে একজন বেরিয়ে এল হাত জোড় করে। বিনীত ভাবে নিবেদন করলে, আপনাদের জন্যে এখানে নয় স্যার। আপনারা হলেন সরকারের পুষ্যিপুত্তুর; আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থাই আলাদা। যান ওই ডান দিকের গলিটায়—মোগলাই কায়দায় কুর্নিশ করে অসামরিক ব্যক্তিটি পোজ্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

লাইনের মধ্যে থেকে অট্টরোলে হাসি ফেটে পড়ে।

থতমত খেয়ে যায় প্রাক্তন সৈনিকটি।

কে যেন একজন লাইন থেকে মন্তব্য করে, তা আর না, ছিলেন তো এতদিন গব্মেণ্টের দুধে-ভাতে। এবার চাকরীবাকরীও জুটবে ও'দেরই আগেভাগে। জান্ দিয়ে ও'রাই তো বৃটীশকে বাঁচালেন।

বিকাশের দাঁত কড়মড় করে ওঠে। ছিটকে এগিয়ে যায় লোকটার দিকে।

খপ্ করে সনত ধরে ফেলে বিকাশকে. কোথায় যাচ্ছ?

রাগে ফুলতে থাকে বিকাশ। ফোঁস ফোঁস করে বলে, একটি ঘুষিতে ওই লোকটার দাঁতগুলো ভেঙে দেব। এই পাঁচটা বছর আমরা দুধে-ভাতে থেকেছি!

বিকাশের হাত ধরে সনত একটু দূরে সরে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে বলে, এই কথাটাই তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম। তুমি তো জান, বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়ে দেশের লোক আমাদের ঘরশত্রু বিভিষণ বলেছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে মনে করেছে. শুধু আমাদের স্বাচ্ছন্দ আর আরামের জন্যেই লাখে লাখে লোক না খেতে পেয়ে মরেছে।

বিকাশ তখনও ফুসছে, কিন্তু চুরি না করেই আমরা চোর হয়ে থাকব!

উত্তর দেওয়ার অবসর মিলল না সনতের।

গেট খুলে গেল। নতুনভাবে চাঞ্চল্য জাগল লাইনে। সনত আর বিকাশও সামিল হয়ে গেল।

বিকাশ কেমন যেন গুম্ মেরে আছে। সনতও আর কোন কথা বলছে না। সুদীর্ঘ লাইন। প্রাগৈতিহাসিক এক সরীসৃপের মত ধীর মন্থর গতিতে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে।

সনতের চোখে ভেসে ওঠে অন্তহীন এই লাইনের অনন্ত রূপ। 'অন্ন দাও' বলে একদিন যারা লাইন দিয়েছিল রিক্রুটিং অফিসের দরজায় দরজায়, ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে যারা ঘুরে এল পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, ইরাকে, ইরাণে, আফ্রিকায়, ইতালিতে, ভারতের গ্রামে গ্রামে শহরে নগরে, ইমফল, কোহিমা, রথিডং, বুথিডং—তারাই, ঠিক সেই মানুষ-গুলোই, জঠরে সেই একই ক্ষুধা নিয়ে আবার এসে দাঁড়িয়েছে 'অন্ন দাও' বলে এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দরজায়। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে তারা মরেছে, তবুও তাদের ভিক্ষার পাত্র পূর্ণ হয়নি—ভিক্ষার সেই অন্তহীন পাত্র আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে! তাহলে যারা মরলো, তাদের ভাগের অন্নটুকু গেল কোথায়!

হঠাৎ সনত প্রশ্ন করে, আচ্ছা বিকাশ, পাঁচ বছর আগে যে মানুষ-গুলো মিলিটারীতে ঢুকেছিল, সেই মানুষগুলো আজও কি সেই পাঁচ বছর আগেকার মানুষই আছে?

ঘাড় ফিরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে বিকাশ সনতের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে বলে, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না সনতদা।

ওদের সামনে কোথা থেকে রফিক এসে উদয় হল ধূমকেতুর মত। বিকাশের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, আরে বিকাশ, একটা হপ্তাও তর্ সইল না, এরই মধ্যে লাইন দিয়েছিস! কিন্তু বাবা, ছাপ্পান্ন দিনের আগে কোন চাকরী দিচ্ছে না তা বলে।

বিকাশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন?

—কেন? গবমেণ্ট যে ছাপ্পান্ন দিনের মাইনে রিলিজের সময় দিয়ে দিয়েছে। তুমি কি ভাবছ, তোমাকে দোকড় করে মাইনে দেবে?

সনৎ হেসে ওঠে, ঠিক বলেছ রফিক, এ কথাটা তো খেয়াল হয়নি। যাক্, নামটা তো লিখিয়ে আসা যাক্।

রফিক বলল, শুনেছি তো ছাপ্পান্ন দিন পার না হলে নামই লিখবে না।

বিকাশ বললে, তাহলে তুই এখানে এসেছিস কি করতে ?

—আমি ? এমনভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে রফিক, যেন বিকাশের প্রশ্নটা নিতান্তই অবান্তর। তারপর নিজেই উত্তর দেয়, আমি তো ফেরার পরদিন থেকে রোজই এখানে আসি এই সময়টায়। কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। কোম্পানির লোকদের জন্যে বড় মন-কেমন করে।

সনত রফিকের স্নেহাতুর মুখখানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু বিকাশের সে অবসর নেই। আজই, এখনই চাকরী হবে না, এই পরম সত্যটিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সনতের একটা হাত চেপে ধরে বলে, ওই ছাপ্পান্ন দিনের মাইনেতে এখানে তো ছাপ্পান্ন বেলাও অন্ন জুটবে না।

হেসে উঠে রফিক বলে, একটা চাকরী কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দপ্তর ছাড়াই খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

বিকাশ উতলা হয়ে ওঠে, কি চাকরী রে ?

গম্ভীর হয়ে ওঠে রফিক, চোখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, দারোয়ানের চাকরী। মিলিটারী ফেরৎ লোক দারোয়ানের কাজটা নাকি ভালই পারে। তাদের চলাফেরা, সেলাম ঠোকা তো খুবই স্মার্ট, তার ওপর কর্তারা আরও বেশী পছন্দ করেন তাদের, যাদের মেডেল্ আর ডেকরেসন্ যত বেশী।

সনত যেন আর্তনাদ করে ওঠে, রফিক !

জ্বালা ধরা চোখ দুটো সনতের মুখের ওপর তুলে ধরে রফিক বললে, হ্যাঁ সনতদা, আমি একটা দারোয়ানীর কাজ পেয়ে গেছি। কাল থেকে কাজে লাগব।

বিকাশ রফিকের হাতটা চেপে ধরে বলে, এই পরিণতির জন্যেই কি আমরা মিলিটারীতে ঢুকেছিলাম রফিক !

রফিক ধীরে ধীরে বলে, কি করব বল্ বিকাশ, কিছুদিন যে যুঝব, এমন সময় পেলাম না। আমার বাবার জমিজমাও ছিল না আর আমরা ঠিক যাকে ভদ্দরলোক বলে, তাও নই। বুড়ো বাপের জিম্মায় মা, বউ আর ছোট একটা ছেলেকে রেখে মিলিটারীতে ঢুকেছিলাম। দুর্ভিক্ষের বাজারে বুড়ো বাপ যুঝতে পারল না। মা ভেঙে পড়ল দুনিয়ার হাল-চাল দেখে। আর বউটার ঘাড়ে পড়ল সমস্ত ঝক্কি। যে ভাবে ওরা বেঁচে আছে. ভদ্দরলোক হলে তোর কাছেও বলতে পারতাম না বিকাশ। বউটা দিনে গতরে খেটেছে, রাতে লোক এনেছে ঘরে। মা সবই দেখেছে, তবুও মুখ খোলেনি। প্রাণে ওরা সকলে বেঁচে আছে। কিন্তু বউটা হয়ে উঠেছে রোগের একটি ডিপো। আমাকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

বিকাশের হাতটা থর্থর্ করে কেঁপে ওঠে। ফ্যাকাশে মুখে সনতের দিকে তাকায়। সনত ধীরে একখানি হাত রফিকের কাঁধে রাখে।

রফিকের গলাটা ভারি হয়ে ওঠে। সনতের দিকে ছল্ছল্ চোখে চেয়ে বলে, এই জন্যেই কি মিলিটারীতে গিয়েছিলাম! এইভাবেই কি আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম! যা মাইনে পেয়েছি, তাতে গোটা চল্লিশ টাকার বেশী ফ্যামিলি এ্যালটমেণ্ট করতে পারিনি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বাজারে ওই চল্লিশটা টাকা তো কেবল একমণ চালের দাম। তারপর? তুমিই বল সনতদা, অন্য আর কোন উপায়ে ওরা বাঁচতে পারতো?

সনত নীরব। চোখ দুটো তার স্থির হয়ে গেছে। আবার তার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে সেই লাইন। সেই মানুষের সারি. যে সারিতে তারা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ বছর আগে ভিক্ষার পাত্র হাতে। শুধু চেয়েছিল দুটি অন্ন, যে কোন উপায়ে উদরপূর্তি, প্রাণবায়ুটাকে বুকের মধ্যে কোন রকমে ধরে রাখতে। তাদের মত মানুষের এই-ই তো জীবন। সেদিনও ছিল তারা ভিখারি, আর আজও সেই একই দশা। রফিকের বউ আর তাদের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কোথায়! তারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়ার জন্যে হয়েছিল সৈনিক। সেই সৈনিক হয়ে তারা দুনিয়াটাকে পুড়িয়ে ছারখার করেছে, বিবেককে বিকিয়ে

দিয়ে তারই মত আর একটা মানুষের বুকে আমূল বেয়নেট বসিয়ে দিয়েছে। তাদের পদভরে কত পর্ণকুটির, কত শত সুখের গৃহ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। উদরপূর্তির বিনিময়ে তারা ধ্বংসের যজ্ঞে ইন্ধন যুগিয়েছে।

কিন্তু রফিকের বউ তো কারও কোন ক্ষতি করেনি। সে আত্মদান করে দুটো প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সমাজের নীতিশাস্ত্র ব্যাভিচারের অভিযোগ এনে রফিকের বউকে হয়তো নস্যাৎ করে দেবে। কিন্তু দধিচির ঐতিহ্যকে যদি কেউ আজও জাগরূক করে রাখে, সে ওই রফিকের বউ। রফিকের বউ মহৎ।

লাইন এগিয়ে চলেছে। ওরাও ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের পাশে পাশে চলেছে রফিক। রফিকের ওপর পেছনের লোকের কড়া নজর, কোন এক ফাঁকে সে লাইনের মধ্যে ঢুকে না পড়ে।

সনত বললে, তুমি লাইনের মধ্যে দাঁড়ালে না কেন রফিক, তারপর না হয় দেখা যেত, ওরা কি বলে।

রফিক ফুঁসে ওঠে, এদের দেওয়া চাকরী আমি আর করব না সনতদা। হিম্মৎ যদি থাকে নিজের তাগদে আমি বাঁচব।

সনতের মনটা হঠাৎ যেন কিছুদিন পেছিয়ে যায়।

খুব তো বেশী দিনের পুরনো কথা নয়! এই আক্রোশ, পুঞ্জিভূত এই ক্রোধ সেদিনও পথ খুঁজেছিল। দেশ দুনিয়ার মানুষের ঘৃণা আর অভিশাপকে মাথায় তুলে নিয়েও যেদিন তারা বাঁচবার পথ বেছে নিল, সেদিনের পথ তো শুধু তাদের বাঁচার আশ্বাস জাগায় নি। আশা জাগিয়েছিল দুশো বছরের দাসত্বের শৃঙ্খলমোচনের, শুধু তাদের নয়—সমস্ত জাতির। কিন্তু দেশের যারা কর্ণধার, সেদিন কূট রাজনীতির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে তাঁদের কেউ দেখলেন, এ পথ মারাত্মক, হিংসাত্মক পথে আসবে না দেশের মঙ্গল! আর কেউ কেউ বুঝলেন, শুধুই খানিকটা উত্তাপ, একটু পিঠ চাপড়ানিতেই এদের যথেষ্ট বাহবা দেওয়া হবে। দেশের যাঁরা ভাগ্যনিয়ন্তা, তাঁরা কেউই খবর রাখেন নি, কি পরিমান বারুদ জমা হয়েছে বৃটীশ সৈনিকের পোষাক পরা বিশলক্ষ ভারতের মানুষের মনে মনে। সেদিনের সেই বিজাতীয় ঘৃণা, দুরন্ত আক্রোশ আর দুর্নিবার ক্রোধ থেকে যারা বৃটীশদের বাঁচাল, তারা আজ

কাদের স্বাধীনতার জন্যে কেবিনেট মিশনের কাছে দরবার করছে!

বিকাশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কি যেন সে গভীরভাবে চিন্তা করছিল। হঠাৎ রফিকের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললে, আরও কাছে আয় রফিক, একটা কথা শোন।

রফিক এগিয়ে আসে বিকাশের কাছে।

বিকাশ গলাটা নামিয়ে বলে, দেখ রফিক, বউয়ের চিকিৎসা এখনই সুরু করে দে। ওর কোন দোষ নেই। ওর ওপর যেন কোন খারাপ ব্যবহার করিসনি।

সনত বিস্মিত দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চেয়ে আছে। অভিনব এক অভিজ্ঞতায় তার সর্ব শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। সে দেখছে, পুরনো সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, পুরনো ধ্যান-ধারণা নূতন সূর্যালোকে কুয়াশার মত সরে যাচ্ছে। নতুন শক্তি, ধ্যান-ধারণা কোথায় কোন্ অতল থেকে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে। তাইতো বিকাশ হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বলতে পারে, রফিকের বউ নির্দোষ! আর সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে কমলার কথা। কমলার সেই দৃপ্ত-তেজ বিজয়িনী রূপটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে, তার সেই স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কথাগুলো যেন শুনতে পায়, 'আমি চাই আমার পরিচয়ের পরিবর্তন। আমি হতে চাই গরীবের বউ।'

রফিকের মুখটা মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। ভারী গলায় বলে, ঠিক কিছু বলতে পারছি না বিকাশ। ফিরে আসতেই, প্রথম রাত্রে ছেলেটাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বউ বললে, এই নাও তোমার ছেলে। আমার সর্বস্ব দিয়েও ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এইবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব।

একটু চুপ করে থাকে রফিক, চোখ দুটো তার সজল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, বউটার জন্যে খুব কষ্ট লাগছে বিকাশ। সবই বুঝি। চেষ্টাও করব ওকে সারিয়ে তুলতে, যদি না ও নিজে ওইরকম কিছু একটা করে বসে। সে ভয় এখনও যায়নি। কিন্তু আমার কি হয়েছে জানিস, কিছুতেই ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না।

বিকাশ প্রশ্ন করে, আগে কিছু জানতে পারিসনি?

—কি করে জানব বল! দিন-দশ-পনেরোর জন্যে ছুটিতে এসেছিলাম সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে, তারপর কি আর বাড়ী এসেছি! ওরা তো জানে, ফিরে আমাকে যেতেই হবে। নইলে পুলিশে মারধর করে নিয়ে যাবে। তাই কিছুই বলেনি, ঝুটমুট আমার মনে অশান্তি হবে মনে করে।

হঠাৎ দাঁত কড়মড় করে ওঠে রফিক, তখন যদি ঘুণাক্ষরেও জানাতো! ওই শালার ক্যাম্পে তাহলে কোন্ শালা আর ফিরে যেত।

কোলাপ্‌সিবল্ গেটের সামনে এসে পড়েছে সনত আর বিকাশ। ওদের সামনের দুজন চলে গেছে ভেতরে। এইবার তাদের পালা।

বিকাশ রফিককে বললে, ওই গেটের সামনে একটু অপেক্ষা কর না, আমরা তো এখনই ফিরে আসব।

চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে রফিক বললে, না ভাই চলি। এসেছিলাম নামটা লেখাব বলে। কিন্তু এখানে এসে মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে গেল। যাক, তোদের সঙ্গে কথা বলে বুকটা যেন একটু হাল্কা লাগছে। বাড়ী ফিরে যাই। বউটার কাছে একটু থাকা দরকার। না হলে কখন যে কি করে বসবে আল্লাই জানে।

বিদায় সম্ভাষণের অপেক্ষা না করেই রফিক হাঁটা দিলে।

বিকাশ কি মনে করে রফিককে আবার ডাকতে যায়।

সনত বিকাশের হাতে একটা চাপ দিয়ে বললে, ওকে যেতে দাও।

ঝণাৎ শব্দে আবার কোলাপ্‌সিবল্ গেট খুলে যায়।

বিকাশ আর সনত ভেতরে ঢুকে গেল। ঘণ্টা দুই এ-টেবিল, ও-টেবিল, সে-টেবিল ঘোরাঘুরি করে একখানা করে কার্ড হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল। দরজার সামনে চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে থাকা এক কেরাণীবাবু অত্যন্ত সহৃদয় স্বরে বললেন, তিনমাস বাদে আবার ওই কার্ডখানা রিনিউ করিয়ে নিয়ে যাবেন।

বেরিয়ে আসতে আসতে বিকাশ বললে, তার মানে এই তিনমাসের মধ্যে কোনই আশা নেই!

সনত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, মনে আছে বিকাশ, মিলিটারীতে

ভর্তি করার সময়ে রিক্রুটিং অফিসার বলেছিল, আমাদের জন্যে চাকরী রিজার্ভ করে রাখা হবে।

রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর আবার ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক-গুলো মানুষের গোল একটা কুণ্ডলি তৈরী হয়ে গেছে ফুটপাথটা জুড়ে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে কে একজন চিৎকার করে কি সব যেন বলছে।

বিকাশ সনতের মুখের দিকে তাকায়, কি ব্যাপার সনতদা?

সনত এগিয়ে গিয়ে বললে, চল না দেখি।

কুণ্ডলির প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে পড়ে সনত আর বিকাশ। ওখান থেকেই পরিস্কার শুনতে পাওয়া যায় বক্তার কথা, বন্ধুগণ, যুদ্ধশেষে আবার আমরা বাড়ী ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি কি আশা নিয়ে? রুজিরোজগারের একটা সুবন্দোবস্ত সরকার আমাদের জন্যে করবে। এ-প্রতিশ্রুতি সরকার মিলিটারীতে ভর্তি করার দিন থেকেই দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় মাসের পর মাস, কারও কারও ক্ষেত্রে ছ'মাসেরও বেশী, ধর্ণা দিয়ে চলেছি। বৃটীশ সরকারের এ ধাপ্পাবাজিকে পরাস্ত করতে হলে, আমাদের, প্রত্যেকটি প্রাক্তন সৈনিককে একত্র জমায়েত হতে হবে, সংগঠিত হতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। তারই জন্যে আমরা, প্রাক্তন সৈনিকেরা, সংগঠিত হয়েছি প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের মধ্যে। আপনারাও দলে দলে এসে যোগ দিন। সঙ্ঘকে শক্তিশালী করুন। আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলুন। আমাদের দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করুন।

প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের দপ্তর হিসেবে নিজস্ব একটা ঘর আছে। সেই ঘরে বসে সঙ্ঘের সম্পাদক ফণীবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় সনত জিজ্ঞেস করেছিল, এ-ঘরটার জন্যে কত ভাড়া দিতে হয়।

ফণীবাবু বলেছিলেন, ত্রিশ টাকা। সঙ্ঘের যা অবস্থা, সেদিক থেকে বড্ড বেশী। কিন্তু উপায় নেই। সকলের মিলবার একটা কেন্দ্র তো চাই।

চট্ করে সনতের মাথায় কথাটা খেলে গেল। বললে, আমি যদি

এই ঘরে এসে থাকি এবং ভাড়ার কিছুটা অংশ বহন করি, তাতে কি কোন বাধা আছে?

এমন একটা প্রস্তাবে ফণীবাবুর প্রলুব্ধ হওয়ারই কথা। কিন্তু প্রলোভনের চেয়ে বিস্ময়ই তাঁকে পেয়ে বসে। প্রশ্ন করেন, এই ঘরে আপনি থাকতে পারবেন?

ঘরটার চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সনত বললে, না পারার তো কিছু নেই। ঘর হিসেবে মন্দ কি! চারটে দেয়াল আছে. তার ওপর একটা ছাদ আছে আর দেয়ালে কতকগুলো ফোকরও তো রয়েছে। ঘর বলতে যা বোঝায়, তার কোন কিছুরই তো কমতি নেই।

সনতের উৎসাহের আতিশয্য দেখে ফণীবাবু একটু কৌতুহল অনুভব না করে পারেননি। আবার প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো। অবশ্য বলতে যদি কোন আপত্তি না থাকে।

সনতের উৎসাহের আতিশয্যেরও কারণ ছিল।

কমলাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার এমন একটা সুযোগ যে হঠাৎ মিলে যেতে পারে, সে-কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। বরং হতাশার দিকটাই দিন দিন ওজনে ভারী হয়ে উঠছিল।

স্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রথমে সে সন্ধান করেছিল সাবেকী মেসগুলোর। যুদ্ধের আগে এ-জাতীয় সংস্থার যে পরিমাণ প্রাচুর্য ছিল, সে প্রাচুর্য তো তার নজরেই পড়ল না. উপরন্তু দেখল সেগুলোর অধিকাংশই কেতাদুরস্ত হোটেলে পরিণত হয়ে গেছে।

সনতের ধারণা ছিল, যুদ্ধপূর্ব যুগে যেখানে মাসিক বারো টাকায় একটি মেসে থাকা এবং খাওয়ার সংস্থান হত, সেখানে যুদ্ধোত্তর যুগে না হয় কুড়ি টাকাই লাগুক! কিন্তু সবচেয়ে এঁদো হোটেলে যখন শুনলে, সর্বনিম্ন চার্জ হচ্ছে মাসিক পঞ্চাশ টাকা, তখন সত্যিই সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

অন্য আর সকলের মত তারও দুশ্চিন্তার কারণ কিছু কম ছিল না। রিলিজের টাকা ব্যাঙ্কে বা পোস্ট আপিসে রেখে হিসেব মত মাসে মাসে খরচ করার মত সৌখিন জীবন তার নয়। ওই টাকার মোটা একটা অঙ্ক সে ইতিমধ্যেই পিতার হাতে তুলে দিয়েছে। বাকীটুকু থেকে আর যদি

কিছু না-ও দিতে হয়, তাহলে তার মেয়াদ, পুরাকালের হিসাব অনুসারে এক বছর হলেও, বর্তমান কালের মেস বা হোটেলের চার্জ অনুসারে মাত্র মাস তিনেক!

সনত তার সমস্যার কথা যতটুকু বলা শোভন ও সমিচীন, ততটুকু ধীরে ধীরে বলে যায়।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে ফণীবাবু সবই শোনেন। শেষে বলেন, বেশ তো থাকুন না। না হয় গোটা দশেক করে টাকা দেবেন। এতে আমাদের সংঘই লাভবান হবে। প্রথমত, দশটাকা তার আয় বাড়ল। তার ওপর আপনার মত একজন উৎসাহি কর্মিকে এত কাছাকাছি পেলে সঙ্ঘের কাজেরও অনেক উন্নতি হবে।

সনত নীরব। তার আশা পূর্ণ। তবুও মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। তার জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস যেন বন্ধ এই অন্ধকার ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে মরছে। পিতা স্বপ্ন দেখলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। তাকে গৃহছাড়া করলেন। তার ভবিষ্যৎ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেল। সুদীর্ঘ কালের আশ্রয় ছেড়ে সে গেল মিলিটারীতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের একটা সুবন্দোবস্ত হওয়ার আশা নিয়ে। জীবন কাটাল সেখানে যাযাবরের মত। কোন স্থায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে উঠল না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ফিরে এল পুরনো আস্তানায়। সেখানেও আশ্রয় মিলল না। আজ সে আশ্রয় নিতে চলেছে এক সঙ্ঘের দপ্তরে। যে সঙ্ঘের ভবিষ্যতও তার অজানা।

তারপর—

তার পরের ভাবনা অভিনব। কমলা আসছে তার জীবনে। তার মানে, তার একক জীবনের পরিসমাপ্তি। একাকীত্বের দুর্বহ মনোবেদনার উপশম। জীবনে জীবন যোগ করা। নতুন জীবনের আবির্ভাব। নতুন আশা। নতুন ভাবনা। নতুন জীবন—

আবার একবার সনত ঘরটার কোণে কোণে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এ-ঘর তো তার কাছে স্বর্গ!

মাথা গোঁজবার ঠাঁই যখন সংগ্রহ হল, তখন সনতের কাছে যেটা

সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, সেটা হচ্ছে, রমানাথবাবুর বাড়ী থেকে চলে আসার পর যে ঘটনাগুলো ঘটতে চলেছে, তারই জটিলতা।

কাকিমা এবং রমানাথবাবুর কাছে বিদায় নেওয়াটা তার কাছে তত শক্ত কাজ বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সে বিব্রত বোধ করে তার নিজের কাছেই, যখন তার এই গতিবিধির পরিণতি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। আর ছ'মাস কি এক বছর বাদে যখন কমলা ওই বাড়ীর সমস্ত মর্যাদা দু'পায়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে আসবে তারই কাছে তার পরিণীতা স্ত্রী হয়ে, এসে উঠবে হয়তো বিকাশের মত এক বাসায়, ওর চেয়ে ভাল বাড়ী পাওয়া যেহেতু এখন দুষ্কর—তখন কাকিমা এবং রমানাথবাবু কি একবারও ভাববেন না যে সে বিশ্বাসহন্তা! একবারও কি তাঁদের মনে হবে না যে তাঁরা দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলেন!

এও যেমন সত্য, আবার ততোধিক সত্য হচ্ছে কাকিমার নোটিস দেওয়া। সে-ব্যাপারে দ্বিধার কোন অবকাশ নেই। কমলা আজ মাঝ-খানে এসে না পড়লেও, ও-বাড়ী থেকে তাকে বিদায় হতে হতই।

কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে কমলা। কমলা তার স্ত্রী হতে চায়! তাকে বিয়ে করে সে জীবনটা নিয়ে বোঝাপড়া করতে চায়। সে-বোঝাপড়া সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যে নয় —তার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে জীবনদর্শন।

সনত প্রথমেই সংবাদটা জানায় কমলাকে।

কমলা খুশীতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। বিস্মিত সুরে বলে, আজকের এই দুর্দিনে কোথায় তুমি ঘর পেলে সনতদা!

সনত একটু ইতস্তত করে। কেন যেন তার মনে হয়, প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের ঘরটাকে কমলা তার নিজস্ব ঘর বলে মেনে নেবে না। হয়তো সে মনে করবে, এক আশ্রয় থেকে সে আর এক আশ্রয়ে গিয়ে পড়ল।

তবুও সনত খোলাখুলি সমস্ত কথাই বললে।

সব শুনে কমলা কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সনতের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সনত আবার অবাক হয়। কমলার চোখে এ-চাহনি সে এর আগে

আর কখনও দেখেনি। নিজে সে যেটুকু মিইয়ে গিয়েছিল, ওই চাহনির স্পর্শে সে নিস্তেজ ভাব মুহূর্তে উবে যায়।

কমলার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত সস্নেহে ধরে বলে, তুমি কষ্ট পেয়ো না কমলা। এই পাঁচ বছরে খাওয়া আর শোয়ার ব্যাপারে আমরা একেবারে পরমহংস হয়ে উঠেছি। সারাদিন ধরে গাধার মত মোট বওয়ার পর যে-সব জায়গায় শুয়ে পরম আরামে ঘুমিয়েছি—সে-সবের তুলনায় ও-ঘর তো আমার কাছে স্বর্গ।

মুখটা তুলে কমলা বললে, ওঘরে বাস করার ফলে যে কষ্ট তোমাকে প্রতিদিন ভোগ করতে হবে, তার জন্যে আমাকেই তো দায়ী মনে হবে?

কমলার ব্যথাতুর মুখ আর নিরলম্ব হাত সনৎকে যেন নতুন এক আনন্দে উদ্বেল করে তোলে। ব্যথা. দুঃখ, কষ্ট যে এত মধুর হতে পারে, এই তার প্রথম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির আবেগে সে বলে ওঠে, তার চেয়ে ঢের বেশী করে মনে পড়বে তোমার এই ব্যথাতুর মুখখানা আর মনে পড়বে তোমার সেই কথা, তুমি গরীবের বউ হতে চাও। গরীব হওয়ার জন্যে যে দুঃখ, কষ্ট, সে তো আমার কাছে গৌরব হয়ে উঠবে কমলা।

আরও খানিকটা এগিয়ে যায় কমলা সনতের সান্নিধ্যে। সনত টেনে নেয় তাকে বুকের মধ্যে। সেই বুকের মধ্যে কমলা ক্ষণেকের জন্যে মুখটা চেপে ধরে থাকে। তারপর মুখ তুলে বলে, আমার ভয় হয়েছিল সনতদা. তুমি হয়তো আমায় ভালবাসতে পারবে না।

কমলার চোখে জল। সনত তার দুটি হাতে কমলার মুখটিকে আলতোভাবে চেপে ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে নেয়। তারপর তার কম্পমান ঠোঁট দুটো মিলিয়ে দেয় কান্নায়-স্ফীত কমলার ওষ্ঠাধরে। সুগভীর এক চুম্বনে মিলে যায় দুটি হৃদয়ের অভিন্ন আবেগ।

তেতলার গুদাম ঘরে তার সেই এক যুগের বিশ্বস্ত বাহন তক্তাপোষটার ওপর ধীরে ধীরে বসিয়ে দেয় কমলাকে। তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, আর কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার নিজেরই ওই ভয় ছিল কমলা। আজকেই যখন প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের ঘরে আমার আস্তানার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল, তখনই মনে পড়েছিল তোমার কথা।

মনে পড়েছিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছ, সে তো শুধুই একটা বোঝাপড়া. আজকের এই নতুন দিনের নতুন জীবন দর্শন!

প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে কমলা প্রতিবাদ করে, না না সনতদা, মোটেই তা নয়। কোন একটা থিওরিকে মাথার মধ্যে রেখে ভাবের বিলাস করার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি। আমি চেয়েছি বাঁচতে, সরল সাধারণ একটা মেয়ে হয়ে বাঁচতে। সে প্রতিশ্রুতি তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার মনের গতিপ্রকৃতির মধ্যে আছে। কিন্তু আমার বাবার আজকের যে সমাজ. সেখানে আমার মূল্য বড় জোর একটা ফ্লাইট্র্যাপের মত। আমাকে মাঝখানে রেখে নতুন এই সমাজের স্বামী বড় বড় কনট্র্যাক্ট ধরবার চেষ্টা করবেন, আবার আমাকেই ঘুষ দিয়ে সমস্ত চুরি, জুয়াচুরি সাফ করে ফেলবেন। এমনভাবে আমি বাঁচতে চাইনা সনতদা।

সনত হতবাক হয়ে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কমলা আবার বলে, আমার কথা হয়তো তোমার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি বলছি তুমি বিশ্বাস কর, সে ট্রেনিং আমার এ-বাড়ী থেকেই সুরু হয়ে গেছে। বাবা কোথা-না-কোথা থেকে হোমরা-চোমরা অফিসারদের নেমন্তন্ন করে আনেন, আর আমাকে সেজেগুজে তাদের এন্টারটেইন করতে হয়।

সনত বলে, তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত যে-কোন লোককেই তো তোমাকে আদর-আপ্যায়ন করতে হবে। এইটাই তো আতিথেয়তার রীতি।

—যে-কোন লোক আর এই সব হোমরা-চোমরা অফিসার এক জিনিস নয় সনতদা। সেইটা বুঝতে পেরেই তো আমি মরেছি।

সনত ঘরটার মধ্যে বারকয়েক পায়চারী করে। তারপর কমলার সামনে দাঁড়িয়ে বলে. কিন্তু কমলা, আমাকে বিয়ে করা মানে কাকাবাবু কাকিমাকে প্রচণ্ড আঘাত করা।

অকম্পিত কণ্ঠে কমলা বললে, তার জন্যে আমি নিজেকে তৈরী করেছি। এ আঘাত আমাদের করতেই হবে, আর আঘাত করতে হলে আঘাতের ওজনটা ঠিক যতটা দরকার ততটাই হওয়া উচিত। মোলায়েম করে আঘাত করা যায় না।

কমলা উঠে দাঁড়ায়।

সনত কি যেন বলতে যায়।

কমলা তার আগেই বলে ওঠে, আঘাতটা যদি মোলায়েম করতে চাও তাহলে একটা উপায় আছে। বাবার অনেকগ্নলো চোরাকারবারের একটা যৌতুক নিয়ে আমাকে বিয়ে করতে পার।

সনত বলে ওঠে, না না কমলা, তা আমি চাই না।

—সেই জন্যেই তো তোমার ওপর এত আস্থা. কমলা সপ্রেম দৃষ্টিতে সনতের মুখের ওপর চোখ রেখে বলে। একটু চুপ করে থেকে আব্দারের সুরে বলে, কিছু দিনের জন্যে এ কষ্ট তুমি সহ্য কর সনতদা। ইতি-মধ্যে আমাদের কাজ হচ্ছে, তোমার এবং আমার একটা করে চাকরী যোগাড় করা, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসার খোঁজ করা।

কাজটাকে সনত যতটা দুরূহ মনে করেছিল, কার্যকালে দেখা গেল —সেটাও তার পুরনো কালের ধ্যান-ধারণা।

কাকিমা বললেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চলেছ. এতো সুখের কথা বাবা। এস বাবা এস। দেখো যেন তোমার কাকাবাবু, কাকিমা আর ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে ভুলে যেও না।

রমানাথবাবু কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অল্প দু'চারটে কথা বললেন, তাহলে তুমি যাচ্ছ সনত। তা বেশ, তা বেশ। আমার দু'চার দিনের মধ্যে ছাদের ঘরটা দরকার পড়বে। এবার কিছু কাগজ তুলব ভাবছি।

নিশ্চিন্ত মনে সনত গেট পার হয়ে এল। নফর কুণ্ডু লেনের পালা শেষ। শেষই তো বটে। কাকিমা বা রমানাথবাবুর কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আর কমলার কাছে তার যে প্রয়োজনীয়তা নতুন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তার ক্ষেত্র অন্তত এখানে নয়। অন্য কোথাও তাদের মিলিত শক্তিতে নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করতে হবে।

মতি শীল স্ট্রীটের সবচেয়ে পুরনো বাড়ীটার এক হাত চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সনতের প্রথম কথা যেটা মনে পড়ল. সেটা হচ্ছে, কমলা যে বলেছে মাঝে মাঝে এখানে আসবে, কিন্তু তার আসার মত জায়গা তো এটা নয়!

বিছানাটা ছিল কাঁধের ওপর আর স্যুট্‌কেসটা হাতে। উঠতে উঠতে বিছানায় দেয়ালে ঠোকাঠুকি খেতে লাগল। আর তারই মধ্যে তার নতুন আস্তানা আর কমলার আসার অসুবিধা—এই দুয়েও যেন ঠোকা-ঠুকি খেতে থাকে।

অদ্ভুত এই পাড়াটা। দুনিয়ার সমস্ত দেশের সমস্ত জাতের মানুষই বুঝি এখানে বাস করে। সকলেই এরা কাজ করে। নানান জাতের কাজ। দোকান পসরা করার লোকই বেশী। তারা অধিকাংশই দিন আনে দিন খায়। তাই তাদের অবসর বড় কম।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাদে এসে দাঁড়াতেই, একটা লোক তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিচে নেমে যায় তর্‌তর্‌ ক'রে।

সনত একবার তার দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে। ঠিক ওই ধরণের চটকদার পোষাকপরা লোক এবাড়ীতে এব আগে আর কোন দিন চোখে পড়েনি।

ছাদের কোলে সারি সারি ঘর। প্রায় সব ক'টা ঘরেই লোক রয়েছে। এক এক ঘরে এক এক ধরণের জীবন। কোন ঘবে দপ্তরীর কাজ চলেছে, কোন ঘরে কাগজের ফুল বানাচ্ছে, আবার কোন ঘরে ফেরীওয়ালা তার পসরা সাজাচ্ছে।

ছাদের শেষ প্রান্তে সব-শেষের ঘরটি প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের দপ্তর। সনত আশপাশে দেখতে দেখতে চলেছে। কাঁধে তাব বিছানা আর হাতে ঝোলানো স্যুটকেশ, পোষাকটাও ভদ্রলোকের, অর্থাৎ ধুতি, পাঞ্জাবী. পায়ে চপ্পল। এমন পোষাক প'রে একজন মানুষ মোট ব'হে নিয়ে গেলে কলকাতাব লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এ বাড়ীর ঘরঘর বাসিন্দারা বারেক চোখ তুলে তাকায় মাত্র, কিন্তু হাতের কাজ থামায় না।

সনতের মনে হ'ল, তাহলে সে মিছেই উদ্বেগ বোধ করছিল কমলাব জন্যে। কমলা এখানে এলে, বড় জোর এরা চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখবে. কিন্তু হাত কামাই দেবার অবসর এদের নেই।

প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের দরজার সামনে মোট নামিয়ে তালায় চাবি লাগাতে গিয়ে সনত ক্ষণেকের জন্যে থমকে দাঁড়ায়। তাদের পাশের ঘরের বাসিন্দাদের রান্না চড়েছে একটা তোলা-উনানে ঘরের কিনারে ওই

খোলা ছাদের ওপর। এক ভদ্রলোক খাটিয়ার ওপর বসে ইংরেজী দৈনিক পড়ছেন। খাটিয়ার পাশে বাচ্চা একটা ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে ইট্, কাঠ, ধুলোবালি নিয়ে মহা আনন্দে খেলা করছে। অল্প বয়সী একটি বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনানের ওপর হাঁড়িটার সরা খুলে দিলে, ডাল উথলেছে।

হয়তো সনতকে একইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বউটি চোখ তুলে চায়।

সনত দেখল, সে চাহনিতে বিস্ময়।

এর আগে কোনদিন সনত সকালে এই বাড়ীটায় আসেনি। সে এসেছে দুপুরে বা বিকেলে। সে সময়ে এ বাড়ীর ঘরে ঘরে দরজায় তালা ঝোলে।

বউটির চাহনির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় সনত। তার মনে হয়, এ পাড়ার লোকেরা অন্যের কাজকর্ম, আচার ব্যবহার, চালচলনের দিকে অমনভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে না।

তালার মধ্যে চাবিটা ঘুরিয়ে দিলে সনত।

সন্ধ্যের পর এল নীরদ আর অতীশ।

সনত হঠাৎ যেন অত্যধিক খুশী হয়ে ওঠে। সারাটা দিন তার নিজেকে এমন মর্মান্তিক নিঃসঙ্গ লেগেছে যে, সে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছে।

নীরদ বললে, ব্যাপার কি! এরই মধ্যে এমন হঠাৎ তুমি এখানে চলে এলে?

সনত বললে, এর চেয়ে সুবন্দোবস্ত আর কিই বা করতে পারতাম বল! তবুও খুশীর কথা এইটুকু যে, ও'রা তাগাদা দেওয়ার আগেই আমি ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পেরেছি। কাকাবাবু বললেন, এবার তিনি কাগজ তুলবেন, আর গুদাম তো তাঁর ওই ঘরটাই। ওই ঘরে হাজার হাজার রীম্ কাগজ কিছুদিন আটকে রেখে টিপে টিপে ব্ল্যাকে ছাড়তে পারলে দু'এক মাসেই তাঁর দশবিশ হাজার টাকা ঘরে আসবে। সে জায়গায় আমাকে ওখানে আশ্রয় দিয়ে তাঁর লাভ কতটুকু! বড় জোর একজন প্রাইভেট টিউটরের মাইনে। ধর পঁচিশ টাকা।

অতীশ খেঁকিয়ে ওঠে, মোটে পঁচিশ টাকা! ওই পাঁচ সাতটা ছেলে-মেয়েকে দু'বেলা পড়াতে মোটে পঁচিশ টাকা! এখন একটা ছেলেকে অ, আ পড়াতেই নেয় পঁচিশ টাকা।

সনত হাসছিল। সে হাসি অতীশের প্রতি বিদ্রূপ নয়, তাতে ছিল নিজের প্রতি করুণা।

নীরদ জবাব দিল অতীশের প্রশ্নের, হিসেব যখন করছই অতীশ, তখন পুরোপুরিই কর। ওই সঙ্গে ধরে নাও একটা মানুষের থাকা খাওয়ার খরচ।

অতীশ যেন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, সে হিসেবটাও করতে হবে একটা মানুষের বেলায়, যে মানুষটা ওই বাড়ীতে আজ বারোটি বছর কাটিয়ে এল বাড়ীর ছেলের মত!

সনত বলল, উপায় কি বল।

অতীশ বললে, উপায় আমি যা খুঁজে পেয়েছি, তাতে আমাদের বনে জঙ্গলে বাস করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। সত্যি বলছি সনত, আমি আর পারছি না মামার বাড়ীতে থাকতে। আমি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকব, ততক্ষণ মামা মামীর কি দরদ মালতীর ওপর। অথচ মালতী প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কাঁদছে। খেতে বসে খোঁটা শুনে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে আসছে। আমাকে বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে, মালতী অবুঝ, অন্যায় তার আব্দার। আর কিছুদিন এ ভাবে চললে, আমাতে মালতীতে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে।

দশ পাঁওয়ারের বাল্‌বের লালচে আলোয় ধোঁয়ায় চিটেপড়া দেয়াল-গুলো আরও কালো দেখাচ্ছিল। আর ফুটিফাটা লাল মেঝেটা হয়ে উঠেছে সুমেরু বা কুমেরুর একটা রিলিফ ম্যাপ। এমনই একটা আব-হাওয়ার মধ্যে বসে আলোচনা চলছিল জীবনভরা তিক্ততার। তার মাঝখানে একটা মানুষ যদি কোন সাড়া না দিয়ে এসে দাঁড়ায় দরজায়, হঠাৎ চোখ পড়লে তাকে ভূত বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সনতের হল তাই। দরজায় চোখ পড়তেই আঁতকে উঠে বললে, কে? কে?

বিকাশ ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। বিকাশের মুখটা যখন পরিস্কার

দেখা গেল, তখন সনত সলজ্জ স্বরে বললে, ও, বিকাশ!

—হ্যাঁ সনতদা, তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলাম।

মেঝের ওপর বিছানো মাদুরটায় বসতে বসতে বিকাশ তার কথার জের টেনে চলল, মনে আছে সনতদা, আর. সি, মেল'এ বসে বলেছিলে, তোমার জীবনটা এমনই সরল রেখায় যে, তার শেষ প্রান্তটা সব সময়েই চোখে পড়ে। সে কথা কি তোমার এখনও মনে হচ্ছে?

সনত কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। সেদিনকার সে আবেগ যেন বহুযুগ অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন যত সহজে জীবন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেছিল, আজ তো আর সে তা পারছে না। একদিকে যেমন ভাঙছে, অন্যদিকে আবার যে তেমনি গড়ে উঠছে! আজ সে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার একাকীত্ব গেছে ঘুচে। তারই বুকের মধ্যে নতুন করে ঘর বাঁধার আশা দিন দিন সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে।

কিন্তু তত্ত্ব আলোচনার সময় এটা নয়। এখন শুধু ঘটনা। ঘটনার কালস্রোতে নতুন নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি হবে।

সনত বললে, ও আলোচনা এখন থাক বিকাশ।

অতীশ বলে ওঠে, হ্যাঃ, গুলি মারো ও সব বড় বড় কথায়। এখন জান্ নিয়ে টানাটানি, প্রাণ বাঁচানো যায় কি করে তারই একটা মতলব কর।

বিকাশ বললে, মতলব তো করতেই হবে। কিন্তু আমি ভাবছি. আমাদের মতলব কি কোনদিন কাজে লাগবে!

অতীশ বললে, কেন লাগবে না! মতলব করে ঘরে বসে থাকলে অবশ্য ওই রকমই হবে। শুধু মতলব করলে তো চলবে না। তাকে হাসিল করার জন্যে জান্-প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে।

বিকাশ বললে, এই তো আসছিলাম একটা মতলব করতে করতে। অবশ্য আমার মতলবটা তেমন বড়সড় কিছু নয়। নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছি। তারই একটু উপশম হওয়ার মত একটা মতলব মাথায় এসেছিল।

নীরদ বলে ওঠে, তা তুমি অত ভণিতা করছ কেন? সাফ্ সাফ্ বলে ফেল।

বিকাশ সসঙ্কোচে বলে, একা তো আমি কোন বাসাই সুবিধে করতে

পারছি না। এখন সনতদা যদি ভাগীদার হন, তাহলে হয়তো একটু সুবিধে হতে পারে।

সনত সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়, এ তো বেশ ভাল মতলব। আর তাতে আমারও তো সুবিধে।

নীরদ সনতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সনতের রাজী হওয়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব তার নজরে পড়ে। বললে, তোমার আবার বাসা করার ঝক্কি পোহানো কেন সনত! একলা মানুষ, মেসে হোটেলে কাটিয়ে দাও, কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না।

সনত নীরদের একটা হাত চেপে ধরে বলে, তোমার কথা বুঝেছি নীরদ। কিন্তু একলা মানুষ হয়তো আর বেশী দিন থাকছি না।

অতীশ সোল্লাসে বলে ওঠে, ব্যাপার কি হে! বল, বল, খুলেই বল। এ তো একটা রীতিমত সুখবর।

নীরদ বিস্মিত চোখে সনতের দিকে তাকায়।

সনত মাথা নিচু করে নিয়েছে। অস্থির আঙুল দুটো তার কোঁচার একটা খুঁট ধরে আঙুলে জড়াচ্ছে আর খুলছে।

বিকাশ বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে সনতের মুখের দিকে।

অতীশ এগিয়ে বসেছে সনতের আরও কাছ ঘেঁষে।

সনত বললে, সেও এক তত্ত্ব কথা। জীবনের নতুন তত্ত্ব। এ তত্ত্বের সন্ধান পেলাম ফিরে এসে। যখন, যে মুহূর্তে মনে হয়েছিল, মিলিটারী থেকে যে ফিরলাম, কিন্তু এ কোথায় এলাম! এ যেন আমাদের সেই ফেলে-যাওয়া জগতটার যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ! মিলিটারী জীবনে একবার এমনই নিঃসংশয়ে মানুষের মধ্যে যা কিছু মানবিক, তার ওপর আস্থা হারিয়ে ছিলাম—সে হচ্ছে বর্মা ইভ্যাকুয়েসনের সময়ে। সেদিন দেখেছিলাম, শুধু বেঁচে থাকা, যে কোন উপায়েই হোক প্রাণটাকে বুকের খাঁচার মধ্যে ধরে রাখার জন্যে মানুষ কি সাংঘাতিক অমানুষ হয়ে উঠতে পারে! আর এবার দেখলাম, শুধু টাকা! যার যা আছে তার ওপর আরও কিছু যোগ করার জন্যে এ কি বিভৎস কদর্যতা! কিন্তু এরই মাঝখান থেকে শুনলাম নতুন কথা। টাকাকে তুচ্ছ করে জীবনের জন্যে

সংগ্রাম। এমন সংগ্রামে কেউ যদি আমাকে সাথি হিসেবে ডাকে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য নীরদ।

নীরদ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সনতের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার হাতটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে, কে ? কমলা !

সলাজ খুশীর ভারে সনতের মাথা আনত হয়ে পড়ে।

ছয়

বিমলের কাছেও বিকাশ কথাটা পেড়েছিল।

বাড়ী বাড়ী করে যখন সে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল, আর পাগলের মত যেখানে সেখানে গিয়ে ঢু মেরে কেবল ধাক্কাই খাচ্ছিল, সেই সময়ে মতিশীল স্ট্রীটে প্রাক্তন সৈনিক সংঘের দপ্তরে বসে সেদিন সন্ধ্যায় সনত, নীরদ আর অতীশের সঙ্গে আলোচনায় সে যেন নতুন করে প্রাণ পেল।

সনতের তখনই বাসার দরকার। নীরদ আর অতীশের প্রয়োজনটা সমস্যায় গিয়ে না দাঁড়ালেও, তারাও সেই ভাবে চিন্তা করছে। বিশেষ করে অতীশের আগ্রহটা অন্তত নীরদের চেয়ে বেশী।

সব কিছু মিলে বিকাশের কাছে ভাবনাটা দাঁড়িয়েছিল এই ধরণের ঃ বড় একটা বাড়ী যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সকলে মিলে ভাড়া আর সেলামীটা ভাগ করে নিলে, যে অঙ্কটা এক একজনের ভাগে পড়বে, সেটা বোধহয় কারও পক্ষে তেমন মারাত্মক হয়ে উঠবে না।

ভাবনাটাই এত আরামপ্রদ যে, সেই থেকেই বিকাশের মনটা হাল্কা হয়ে ওঠে। বাড়ী ঢুকে দোতলায় না উঠে সোজা গিয়ে ঢুকল বন্দনার ঘরে।

বন্দনা তখন তোলা উনানে ঘরের কোণে বসে রান্না করছে। বিমল তারই এক হাত তফাতে পাতা তক্তাপোষটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কি যেন লিখছে। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে তার পাশে।

বিকাশ রোয়াকে উঠেই বললে, ছোড়দি একটু চা খাওয়াও।

বিস্মিত চোখে আর খুশী মুখে বিকাশের দিকে চেয়ে বন্দনা বললে, ভেতরে এসে বস্, চা করে দিচ্ছি।

বিমলও মুখ তুলে চেয়েছিল বিকাশের দিকে। এমন ঘটনা ইতি-পূর্বে ঘটেনি।

বিকাশ এসে বিমলের পাশে বসে পড়ল। সরব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বুঝলে ছোড়দি, এতদিনে বুঝি একটা হিল্লে হল।

বন্দনা মুখ ফিরিয়ে সেই একই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কিসের হিল্লে রে?

—বাড়ীর. কথাটা বলার মধ্যে বিকাশ যেন এক অভূতপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করে। মনের সেই লঘুতা থেকেই বিমলকে বলে, আপনি ত্তো কিছু করলেন না বিমলদা। কিন্তু এইরকম বাড়ীতে বেশীদিন বাস করলে শুধু স্বাস্থ্যই খারাপ হয় না, মনটাও নিচু হয়ে যেতে থাকে।

বিমল বললে, সে কথা আমি বুঝি বিকাশ। আর বাড়ীর জন্যে চেষ্টা আমি অন্য কোন কিছুর চেয়ে এক তিলও কম করছি না।

বিকাশ বললে, একখানা, দু'খানা ঘর বা ছোটখাট বাড়ীর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। দেখলাম তো ঘুরে ঘুরে. ও পাওয়া যাবে না। আর পাওয়া গেলেও আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে না।

—তাহলে কি করতে হবে? বিমলের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাষ ফুটে ওঠে।

বিকাশের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। নিজের আবেগেই সে মশগুল। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, অন্তত পাঁচ ছ'খানা ঘরওয়ালা পুরো একটা বাড়ী নিতে হবে। পাঁচজনে মিলে আমরা নিশ্চয়ই তার ভাড়া আর সেলামী ম্যানেজ করতে পারব।

চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে বন্দনা ঘুরে বসেছিল বিকাশের কথা শোন-বার জন্যে। বিকাশের পরিকল্পনা শুনে তার বিস্মিত দৃষ্টিটা আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আর বিমল কৌতুকের ভাব নিয়ে বিছনাটার ওপর কনুইয়ের ভার রেখে আরও খানিকটা সোজা হয়ে বললে, পাঁচজন!

বিকাশ বললে, হ্যাঁ পাঁচজন। সনতদা, নীরদদা, অতীশদা, আমি আর আপনি।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসল বিমল। সোজা হয়ে বসে বললে, দেখ বিকাশ, এমন কোন পরিকল্পনার মধ্যে যেতে আমি মোটেই রাজি নই।

বিস্মিত হওয়ার পালা এবার বিকাশের। প্রশ্ন করলে, কেন!

ধীরে ধীরে উত্তর দেয় বিমল, কেন. তার উত্তরটা সহজ নয়। ব্যাপারটা কিছুটা বোঝাপড়ার, আর জানই তো, কোন কিছুর বোঝাপড়া করতে গেলে চাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা। এই সহজ সাধারণ জিনিসটার অভাব হয়ে পড়েছে আমাদের মধ্যে। আমাকে তুমি মনে কর একটা স্কাউণ্ড্রেল, আর খুড়িমা আমাকে সহ্য করেন, যেহেতু বন্দনার জীবন আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় আমাদের কারও পক্ষে একসঙ্গে বাস করা সমিচীন নয় বিকাশ, তাতে ফল কারও পক্ষে ভাল হবে না।

এরপর বিকাশ কিছুক্ষণের জন্যে নিঝুম মেরে গিয়েছিল। যে খুশীতে সে উপছে পড়েছিল. যে আশা আর আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, যে অধীর আগ্রহ নিয়ে সে ছুটে এসেছিল বিমলের কাছে—সব যেন চুপসে যায় এক মুহূর্তের মধ্যে।

তার খুশীভরা ভাবনার ওপর প্রথম আঘাত দিল বিমল। এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে সে বিমলকে পাচ্ছে না। আঘাত যখন লাগল, সে আঘাতের বেদনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নীরদকে তো তত উৎসাহিত মনে হয়নি। আর অতীশেরও ততটা গা ছিল না, যতটা ব্যাকুলতা ছিল তার নিজের। শুধু সনত!

এতক্ষণে তার সন্দেহ জাগে, তাহলে আজকের এই যে আলাপ আলোচনা, এটা নিছক আড্ডার গল্প! এর ওপর কোন আস্থাই রাখা চলে না!

বিকাশ ঝপ্ করে উঠে পড়ে একেবারে রোয়াকে বেরিয়ে আসে।

বন্দনা ডাকে, বিকাশ চা হয়ে গেছে, খেয়ে যা।

বিকাশ কোন জবাব না দিয়ে ততক্ষণে উঠান পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে!

বারান্দায় জুতো খুলে ঘরের মধ্যে দেয়ালের পেরেকে সেগুলোকে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বিকাশ দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল, ওই স্কাউণ্ড্রেলটার জন্যেই শেষ পর্যন্ত এই নরককুণ্ডে পচে মরতে হবে!

হাতের সেলাই নামিয়ে রেখে মায়া বিকাশের মুখের দিকে তাকাল। বিকাশ মাদুরের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, মা কোথায় গেল?

মায়া বললে, মা গেছেন ছোট মামাবাবুর বাড়ী।

তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসে বিকাশ মায়ার মুখের সামনে হাত নেড়ে খেঁকিয়ে উঠল, ওদের বয়ে গেছে। তুমি দেখ, ওরা একজনও এসে দাঁড়াবে না। মা তাদের দোরে দোরে ধর্ণা দিয়ে বেড়ালে কি হবে!

মায়া বিকাশের মাথাটা টেনে নিয়ে কোলের ওপর শুইয়ে দিলে। চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, অত মাথা গরম কর কেন?

—মাথা কি আর আমি গরম করছি। যেখানে যাই সেখানেই এত গরম যে সেই তাপে মাথা আপনা থেকেই তেতে উঠছে।

মায়া আর কোন কথা বলে না। ধীরে ধীরে বিকাশের চুলে, মুখে হাত বুলোতে থাকে।

এক সময়ে বিকাশ থিতিয়ে যায়। ধীরে ধীরে সব কথা একের পর এক মায়াকে বলে। পরিশেষে নিজের মন্তব্যটুকু জুড়ে দেয়, এখন যা দেখছি, শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। কখন কার কি মত হয় কে জানে!

মায়া প্রতিবাদ করে, কক্ষণো না। সনতদার মত কখনই বদলাবে না। আর নীরদদা, অতীশদাও দেখ এতে রাজি হয়ে যাবেন।

বিকাশ আবার খেঁকিয়ে ওঠে, আর যত মানের পাখা গজিয়ে উঠল ওই স্কাউণ্ড্রেলটার। দেখ, ছোড়দিকে শেষ পর্যন্ত প্রাণে না মেরে ছাড়বে না।

মায়া কিন্তু বিকাশের কথায় সায় দিতে পারে না। বলে, ছোট-জামাইবাবু কিন্তু ঠিকই বলেছেন। আমরা কেউই তো ও'কে ভাল চোখে দেখি না। সে ক্ষেত্রে ও'র আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে না থাকাই ভাল।

তারপর ধীরে ধীরে কখন যেন বিমল আর বন্দনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় ওদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে থেকে। মায়া খুঁটিয়ে

খ‍ুঁটিয়ে খবর নেয় নীরদ আর অতীশের। কমলার খবর বিকাশও দিতে পারেনি। কারণ নীরদের মুখ থেকে কমলার নামোল্লেখ ছাড়া আর কোন আলোচনাই হয়নি তার সম্বন্ধে।

পরামর্শ শুরু হয়ে যায়। পরিকল্পনা এগিয়ে চলে।

মায়া বলে ওঠে, তাহলে আমাদের চাই চারখানা ঘর।

বিকাশ বললে, তাতো চাই-ই, উপস্থিত একমাত্র সনতদা ছাড়া আমরা সকলেই যখন বিবাহিত। এই ঘরের মত মশারী খাটিয়ে তো আর ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে থাকা যাবে না।

হঠাৎ মায়া খুশীতে হাত তালি দিয়ে ওঠে। কি মজাই না হবে। তোমরা যেমন হবে চার বন্ধু এক জায়গায়, তেমনি আমরা চার বউও বন্ধু হয়ে উঠব।

কখন যেন দুজনেই চুপচাপ হয়ে যায়। কত সুখের কল্পনা মনের ওপর দিয়ে ছায়াছবির মত ভেসে ভেসে এগিয়ে চলতে থাকে।

হঠাৎ এক সময়ে মায়া বিকাশের মুখের কাছে মুখটা এনে ফিস-ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, এইরকম একটা বাড়ী ভাড়া নিলে আমাদের ভাগে কত পড়বে ?

বিকাশ বললে, ভাড়াটা ধর গোটা পঁচিশ, আর সেলামী শ'খানেক।

মায়ার মুখখানা প্রথমে একটু ম্রিয়মান হয়ে ওঠে, বড্ড বেশী মনে হচ্ছে না ?

বিকাশ বলে, এর কম যে কল্পনাও করা যায় না মায়া।

মায়া তখনই আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তা হোক গে একটু বেশী। কিন্তু কি মজায় থাকা যাবে বলতো !

আবার দুজনেই চুপচাপ। সুখের কল্পনা পেছনে ফেলে রেখে এবার তারা নেমেছে টাকা পয়সার হিসাবে।

মায়া ধীরে ধীরে হিসেব দেয়। বিকাশের লড়াই-ফেরৎ টাকা আছে তখনও প্রায় শ'চারেক। মায়ার গায়ে যা গয়না আছে, তার দাম খুব কম হলেও পাঁচশো। সংসারের মাসের খরচ চালানো যেতে পারে একশো টাকায়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, গোটা ছয়েক মাস বেশ ভালভাবেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে ওই ভাড়া আর সেলামী দিয়েও। তার মধ্যে

বিকাশের একটা চাকরী তো হবেই, আর প্রকাশও ইতিমধ্যে কোন না কোন কাজে লেগে গেলে, দু'ভাইয়ে মিলে কোন্ না দেড়শো টাকা ঘরে আনতে পারবে। তাহলেই তো সংসার বেশ ভালভাবেই চলে যাবে।

বিকাশ নিবিষ্ট চিত্তে শুনছিল। শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই তো, এমন করে গুছিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সে একবারও ভাবেনি। সব সময়ে একটা-না-একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। কখনও বাড়ী, কখনও চাকরী! আর সে-ও ক্রমেই যেন ক্ষেপে উঠেছে।

সব কথার শেষে মায়া তার উজ্জ্বল চোখ দুটোতে খুশীতে ভরপুর নরম দৃষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আমি কোন কাজ করতে পারি না ?

এমন প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না বিকাশ। প্রথমটা থতমত খেয়ে যায়। তারপর বলে, তুমি আবার কি কাজ করবে মায়া !

মায়ার সে নরম দৃষ্টি মুহূর্তে দৃপ্ত তেজে তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। রণং দেহি স্বরে বলে, কেন ! এই যুদ্ধের বাজারে মেয়েরা কি না করেছে। গুণ্ডা, বদমায়েসদের মাঝখানেও লাইন দিয়ে কন্‌ট্রোলের চাল, কাপড় এনেছে। কত রকম হাতের কাজ করে পয়সা রোজগার করেছে। কত মেয়ে আপিসে চাকরী করেছে।

হঠাৎ যেন বিকাশ চমকে ওঠে। কেন যেন তার মনে পড়ে যায় রফিকের বউয়ের কথা। মায়ার কথায় তার মনে হয়, তাহলে তো এই যুদ্ধের কালে ওই রফিকের বউ কেবল একাই নয়—আরও অনেক মেয়েরই ঘাড়ে ওইভাবেই জীবনের বোঝা নেমে এসেছে, আর যে কোন উপায়েই হোক সে বোঝাকে তাদের বহে নিয়ে যেতে হয়েছে !

এরই পাশাপাশি মনে পড়ে সনত আর কমলার কথা। ওরা স্থির করেছে, দু'জনেরই চাকরী হলে, তবে তারা বিয়ের কাজটা পাকা করবে। বিকাশেরও মনে হয়, ওরা ঠিকই করছে। জীবনের বুনিয়াদকে পাকা করে তবেই তার ওপর মজবুত ইমারৎ গড়া যায়। তা না হলে প্রেয়সী হয়ে ওঠে দুর্বহ বোঝা। আর স্বামী হয়ে ওঠে মালিক !

বিকাশ কেমন যেন এক আবেগে তন্ময় হয়ে ওঠে। সত্যিই যদি মায়া কিছু রোজগার করার মত একটা কাজ করতে পারতো, তাহলে তাকে বোধহয় থেকে থেকে চিন্তায় ভাবনায় এমন ক্ষেপে উঠতে হত না।

বিকাশ বললে, কেন পারবে না তুমি! লেখাপড়া আরও খানিকটা শিখে নিলেই পারবে।

বিকাশের সান্নিধ্যে আরও খানিকটা ঘনিয়ে আসে মায়া। একটা হাতে জড়িয়ে ধরে বিকাশের গলা, অপর হাতে তুলে ধরে তার মুখখানা। বিকাশের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার দিকে স্নেহাতুর দৃষ্টি মেলে বলে, জানো, আমি ঠিক করেছি বাড়ীতে বসে এখনই কিছু কিছু সেলাই-বোনার কাজ করব, তাতে দশ-পনেরোটা টাকা অনায়াসেই আসবে। আর যখন আমাদের ওই বাড়ী পাওয়া যাবে, তখন কমলাদির কাছে পড়াশুনা করে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে দেব।

এত খুশীর চিন্তা, এত আনন্দের আবেগে বিকাশ যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। দুটি হাতে মায়াকে বুকের ওপর তুলে নিতে যায়।

তখনই আবার যেন চমকে ওঠে. চকিতে থমকে যায়। মায়ার পাঁজরার প্রতিটা হাড় হাতে ঠেকছে, তার বুকের লোল চর্ম যেন কোন মতে এক আঁটি হাড়ের ওপর লেগে রয়েছে! বিকাশ দুটি হাতে মায়ার মাথাটা তার বুকের ওপর অতি সাবধানে চেপে ধরে, ভারাক্রান্ত গলায় বলে, কিন্তু তোমার শরীর যে বড় খারাপ মায়া। সবার আগের কাজ হচ্ছে তোমাকে সারিয়ে তোলা।

বিকাশের বুকের ওপর মুখটাকে ধীরে ধীরে ঘষতে ঘষতে মায়া বললে, এ বাড়ী থেকে বেরোতে পারলেই আমার শরীর আবার ঠিক হয়ে যাবে।

•

বিকাশ বাড়ী খোঁজে আর চাকরী খোঁজে।

বাড়ী আর চাকরী, এই দুটির ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তার জীবনের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়।

বাড়ী খোঁজে বিকাশ পাগলের মত। টু-লেট্ কথাটা কলকাতা শহর থেকে উবে গেছে। বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা রীতিমত একটা ব্যবসা হয়ে উঠেছে। তার জন্যে গড়ে উঠেছে এজেন্সি, তার জন্যে দালাল ঘুরছে পথের মোড়ে মোড়ে, একটা ঘর সংগ্রহ করার জন্যে সেলামী,

দালালী, বক্‌সিস্‌, তারপরও আরও কত কি যে দিতে হয়, এসব জানা নেই বিকাশের।

তাই কোন একটা বাড়ীর জানলা বন্ধ দেখলেই তার মনে হয়, বুঝি বা বাড়ীটা খালি। ঢুকে পড়ে বাড়ীর মধ্যে। কোথাও রসিকতা, কোথাও গালিগালাজ, আবার কোথাও কোথাও সহানুভূতির দুটো একটা মিষ্টি কথা শুনে ফিরে আসে।

বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে চাকরীর কথা মনে থাকে না। কারণ, বিকাশের মনে হয়েছে বাড়ীটাই চাই আগে, না হলে মায়াকে বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু সংসারের অমোঘ নিয়মে কোন এক সময়ে সেই বিশ্রী কথাটা চেতনায় ধাক্কা দেয়। টাকার অঙ্ক কমে আসছে ধীরে ধীরে। হয়তো এ খবরটা পায় সে মায়ার কাছ থেকেই। হিসেব করতে বসে খাতা পেন্সিল নিয়ে। মায়ার হিসেব মত একশো টাকায় সংসার চলছে না। সন্দেহ জাগে, রন্ধ্রহীন এই হিসাবনিকাশের বেড়াজালের ফাঁক দিয়েই বুঝিবা খানিকটা সখ বা সাধ কোন অজানা অসতর্ক মুহূর্তে খানিকটা বেহিসেবী হওয়ার বিলাসিতার জোগান্‌ দিয়েছে। দৈনিক বাজার, গাড়ীভাড়া, আর সপ্তাহের র‍্যাসন—এই কটি যোগ দিতেই শ'য়ের অঙ্ক ডিঙিয়ে যায়। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে বিকাশ মায়ার মুখের পানে চেয়ে থাকে। সে চাহনি দেখে মায়ার চোখে কখন যেন জল এসে যায় তার নিজের অজান্তে।

বিকাশের কেমন যেন ভয়ভয় করতে থাকে। বাড়ীতে আর বেশীক্ষণ সে থাকতে পারে না। মায়ার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। মৃত্যুর ছায়া যে ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠছে মায়ার মুখের ওপর, সেটা সে তার মুখের ওপর চোখ না রেখেও দেখতে পায়। চোখ বুজিয়েও সে দেখতে পায়, তার সাধের সংসার, স্বপ্নের মত সুন্দর জীবন ভেঙে ভেঙে, ঝরে ঝরে, গুঁড়িয়ে পড়ছে। মিলিটারী ক্যাম্পে বাঁশের মাচায় চিৎ হয়ে শুয়ে যে সব কথা সে ভাবতো, যে সব চেহারা সে চোখে দেখতো, সে সব গেল কোথায়!

যখন আর কোন কিছুই করার মত মনের অবস্থা থাকে না, তখন

বিকাশ গুটিগুটি এসে ঢোকে মতি শীল স্ট্রীটের দোতলার সেই এঁদো, অন্ধকার, স্যাঁত্‌সেঁতে ঘরটায়, অর্থাৎ প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের আপিসে।

বিকাশ ঢুকেই দেখে, সেদিনকার সেই বক্তা আর সনত একটা চ্যাটাইয়ের ওপর বসে আছে।

বিকাশকে দেখে সনত খুশী হয়ে ওঠে। বিকাশকে কিছু বলবার আগে বক্তাকে বলে, এই হল বিকাশ, যার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম।

তারপর বিকাশকে কাছে ডেকে বললে, আর ইনি হচ্ছেন ফণীবাবু, আমাদের সঙ্ঘের সম্পাদক।

বিকাশ এসে বসল ছেঁড়া চ্যাটাইটার ওপর। করজোড়ে নমস্কার বিনিময়ের পর বললে. একখানা ঘর জোগাড় করেছেন বটে! আমার অমন যে বাসা, তাকেও হার মানায়। তাই না সনতদা!

সনত হেসে ওঠে।

ফণীবাবু বলেন. এটা যে ভাই বেকারদের আড্ডা। প্রাক্তন সৈনিক মানেই যে বেকার।

বেকার কথাটাই যেন কেমন। ওই কথাটা শুনলেই ওই দলের মানুষগুলো কেমন যেন হ্যাংলা হয়ে ওঠে।

কোন কিছু না ভেবেই বিকাশ বলে ওঠে, তা আপনারা চাকরী-বাকরীর কোন সুবিধে করে দিতে পারেন না?

মৃদু মৃদু হাসেন ফণীবাবু, আস্তে আস্তে বলেন, প্রথম কথা হল. আমবা আপনার থেকে পৃথক কেউ নই। কাজেই সঙ্ঘের আপিসে বসে আমাদের সকলকে সব কিছুই ভাবতে হবে একটি কথার ভিত্তিতে। সেটি হল 'আমরা'। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে. আমাদের এটি কোন সরকারী আপিস বা সংগঠন নয়। বরং আমরা হলাম সরকার বিরোধী। সরকার আমাদের জন্যে চাকরীর কোন সুবন্দোবস্ত করতে চায় না। আমাদের কাজ হচ্ছে লড়াই, আন্দোলন করে সেই সুবন্দোবস্তটি করতে সরকারকে বাধ্য করা।

বিকাশ প্রশ্ন করল, যতদিন এই সুবন্দোবস্ত করতে সরকারকে বাধ্য করতে না পারছি. ততদিন কি হবে?

ফণীবাবু বলেন, ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণের জন্যে বিকাশ ফাঁকা দৃষ্টিতে ফণীবাবুর দিকে চেয়ে থাকে। এ কথার মধ্যে আশ্বাস কোথায়! আজ, এখনি যার হাঁড়ি শিকেয় উঠেছে, সে এই ভবিষ্যতের পানে চেয়ে দিন গুণবে কেমন করে।

যারান্তরে সনত আর ফণীবাবুর মুখের দিকে বিকাশ তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ প্রশ্ন করে সনতকে, আচ্ছা সনতদা, তুমি কি মনে কর, এইভাবে কিছু হবে?

সনতকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফণীবাবু বলেন, হবে কিনা বলতে পারছি না, কিন্তু হওয়ানোর আশা নিয়েই আমাদের এই সংগঠন গড়া। অনেক বাধা বিপত্তি আসবে বিকাশবাবু। হয়তো অনেকেরই কোন কাজে লাগব না আমরা। কিন্তু অধিকাংশ প্রাক্তন সৈনিকের সুবিধেই হবে আমাদের আন্দোলনের ফলে।

অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ ন্যাড়া ছাদের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। সনত ঝপ্ করে উঠে পড়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

ফণীবাবু বলে যান, আমাদের এখানে এখনও তেমন লোকজন আসছে না। হয়তো তারা আপনার মতই বিশ্বাসই করতে পারছে না, এমন একটা সংগঠনের দ্বারা কিছু করা সম্ভব। ওই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে রোজই আমরা যাই। আমাদের সংগঠনের কথা প্রচার করি। জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো আমাদের কোন খবর ছাপতে চায় না, কতকটা বোধহয় ভয় পায় সৈনিকদের ব্যাপার বলে, আর কতকটা সম্ভবত আমাদের প্রতি ঘৃণা থেকে, যা আজও তাদের মধ্যে রয়ে গেছে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের জেরস্বরূপ। আমাদের কর্মি বড় কম বিকাশবাবু।

সনতের সঙ্গে ঢোকে জন চার-পাঁচ লোক উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে।

ফণীবাবুকে দেখিয়ে সনত তাদের বলল, ইনিই হলেন সঙ্ঘের সম্পাদক ফণীবাবু।

জনৈক মিলিটারী পোষাক পরা যুবক চিৎকার করে ওঠে, আমাদের নিয়ে কি এরা খেলা পেয়েছে না কি!

ফণীবাবু বললেন, বসুন আপনারা।

বসতে বসতে আর একজন বলে ওঠে, দ্যুর, আমাদের নিয়ে খেলা করবে কেন! আমরা যে সরকারের জামাই, তাই আমাদের সঙ্গে একটু মস্করা করলে।

ফণীবাবু প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

প্রচুর উত্তেজনা, উষ্মা, শ্লেষের মধ্যে দিয়ে যে ঘটনাটা বেরিয়ে এল, সেটা হল: ওদের সকলেরই এর মধ্যে একবার করে কার্ড রিনিউ করা হয়ে গেছে। নাম রেজেস্ট্রি করার আজ পঞ্চম মাসে ওদের কাছে প্রথম ইন্টারভিউ কার্ড যায়। লিলুয়ার এক কারখানায় প্রায় জন ত্রিশ গিয়ে হাজির। কারখানার দপ্তরে ডাক পড়ল। একে একে যায় আর তখনই বেরিয়ে আসে। কর্তাদের নাকি মুসলমান চাই। দেখা গেল, যে ত্রিশ-জনকে ইন্টারভিউয়ের জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে একজনও মুসলমান নেই। কারখানার ম্যানেজার বেরিয়ে এসে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কাছে তাঁরা পাঁচজন মুসলমান চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভুলক্রমে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ একজনও মুসলমান পাঠায় নি। তাদের এই অহেতুক নাজেহাল হওয়ার জন্যে তিনি খুবই দুঃখিত।

ব্যাপারটা হয়তো ওইখানেই চুকে যেত। জনকয়েক নীরবে চলেও গেল। কিন্তু কয়েকজন আবার হুজুগ তুলে বসল, তাদের এইভাবে নাজেহাল করার জন্যে দায়ি যখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, তখন চলো সকলে সেখানে গিয়ে লিলুয়া যাতায়াতের খরচ আদায় করতে হবে।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দপ্তরে এসে তারা দাবি করে সংশ্লিষ্ট অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। স্লিপও পাঠিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু ভেতর থেকে কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে যারা লাইন দিয়ে আছে, তাদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেছে ব্যাপারটা। এই নিয়ে রীতিমত একটা হৈচৈ চলেছে। কিন্তু এরপর কি করা যায়, তা আর তারা ভেবে ঠিক করতে পারছে না। তাই তারা চলে এসেছে প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের আপিসে।

ক্ষণেক ভেবে নিয়ে ফণীবাবু বললেন, আচ্ছা চলুন, আমি যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। সন্তবাবু, আপনি না হয় ততক্ষণ আপিসে বসে

বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। আর বিকাশবাবু. যদি পারেন আপনিও একটু থেকে যাবেন। তেমন যদি কিছু দরকার পড়ে, খবর পাঠাব।

বিকাশ সনতের কথাটাই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরছিল। সনতের কথাটা ঠিক কি বেঠিক, তা নিয়ে তুলাদণ্ডে বিচার করতে বসার ঝোঁক তার আসেনি। আসলে, কথাটা তার মনে লেগেছিল এই জন্যে যে, এই অবস্থায় ওর চেয়ে ভাল কোন ব্যবস্থা তার মাথায় আসেনি। সনত যে পরামর্শটা দিয়েছে, তাতে নতুন করে কিছু ভাববার বা একটা ব্যবস্থা করবার পথ সে পেয়ে গেছে।

একটু জোরে হেঁটেই সে বাড়ীর গলিতে ঢুকেছিল। অন্ধকারের মধ্যে একজনের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগেছিল আর কি! নিজেকে সামলে নিয়ে দোরগোড়ায় পা দিতেই সে চমকে ওঠে। সেই খেমটা গান! গত কয়দিন কেন যেন বন্ধ ছিল। আজ আবার সেই একই গান. একই সুর. আর থেকে থেকে শ্রোতাদের স্খলিত কণ্ঠের বাহবা!

ঝড়ের বেগে সিঁড়ি কটা পার হয়ে. কড়া আলোর জোয়ার ডিঙিয়ে এসে ঢুকল নিজের ঘরে। নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যে বারান্দায় জুতো খুলে ঘরে ঢোকার রীতিটাও গেল ভুলে।

সুহাসিনী আর মায়া দুজনেই ছিল ঘরের মধ্যে। বিকাশ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বাইরে এসে জুতো খুলে. ঘরে ঢুকে দেয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখলে।

বিকাশ যখন এসে মাদুরটার ওপর দাঁড়িয়েছে. ততক্ষণে মায়া প্রায় দরজার কাছে এগিয়ে গেছে।

সুহাসিনী উঠবার উদ্যোগ করে বললেন, তুমি বস বউমা. বিকাশের চা আমি নিয়ে আসছি।

বিকাশ মাকে বাধা দিয়ে বললে, তুমিও বস মা। চা আমি সনতদার কাছে খেয়ে এসেছি।

জামা কাপড় বদলে বিকাশ যতক্ষণে মাদুরটার ওপর বসল, ততক্ষণে সে মিইয়ে গেছে। যে প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে বাড়ীর দরজা থেকে তার নিজের ঘরের দরজা পর্যন্ত ছুটে এসেছিল, সে আক্রোশ এই করুণ

আবহাওয়ার মধ্যে থিতিয়ে গেল। মা আর স্ত্রী—এদের মাঝখানে এসে পড়ে সে যেন নিজের অস্তিত্বটাকে অনুভব করতে পারছে। এ ঘরটা যেন আলাদা একটা জগৎ! এই বাড়ীর পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে এই মুহূর্তে ঘরটাকে যেন একটা দ্বীপ বলে মনে হচ্ছে। রূঢ়, কঠিণ, হৃদয়হীন এই দুনিয়ার মাঝখানটায় শুধু এই ঘরটার মধ্যেই আছে স্নেহ. প্রেম, সহানুভূতি!

সুহাসিনী বললেন, বউমার শরীরটা আজ বিকেলে হঠাৎ খুব খারাপ করেছিল। বুক ধড়ফড় করে প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিল। ওকে তো একবার ডাক্তার দেখাতে হয়।

বিকাশ ক্ষণেকের জন্যে মায়ার দিকে চেয়ে দেখল। মুখখানা যেন কালো হয়ে উঠেছে। নাসারন্ধ্র তখনও স্ফীত, বোধহয় জোর দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। ক্লান্তিতে তার সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে উঠেছে।

চোখ ফিরিয়ে এনে চাইলে মায়ের মুখের দিকে। মায়ের মুখেও আশঙ্কা! দুশ্চিন্তায় চোখের চাহনি ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

বিকাশ ধীর স্বরে বলে, অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম মা, তোমাদের দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমার চাকরী পেতে যে কতদিন লাগবে তার কোন আন্দাজই করতে পারছি না। এর চেয়ে ভাল বাড়ী ভাড়া নেওয়ার মত সামর্থ আমাদের নেই। সকলে মিলে যে-বাড়ী ভাড়া করার কথা হয়েছে. সে কথা কোনদিন কাজে হয়ে উঠবে কিনা বুঝতে পারছি না। বিমলদাও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চান না। এদিকে মায়ার শরীর দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য ওই কটা টাকা, তাও তো ফুরিয়ে আসছে। এর ওপর যদি ডাক্তার ডাকতে হয়, তাহলে তো খাল কেটে কুমীর আনার মত অবস্থা হবে। এমন অবস্থায় আর তো অন্য কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না মা।

সুহাসিনীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তিনি মাথা নিচু করে থাকেন।

মায়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিকাশের দিকে। মাত্র কয়েকদিন আগেকার কথাবার্তা, অত জল্পনাকল্পনা, তার কোন কিছুরই রেশ নেই বিকাশের মধ্যে!

বিকাশ আবার চেয়ে চেয়ে দেখে সুহাসিনী আর মায়ার মুখের দিকে। দেখে, মা সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে উঠেছেন আর মায়া বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

বিকাশ বলে, কিছু একটা বল মা।

সুহাসিনী মুখ তোলেন। সসঙ্কোচে বলেন, কি বলব বলতো!

বিকাশ বললে, তা বললে তো চলবে না। ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে।

হঠাৎ মায়া বলে ওঠে, আমি দেশে যাব না।

অপ্রত্যাশিতভাবে বিকাশ ধমক দিয়ে ওঠে, ছেলেমানুষি কর না মায়া। দুনিয়াটা এখনও আমাদের ইচ্ছেমত চলছে না।

বিকাশ এই প্রথম রূঢ় কণ্ঠে কথা বলে মায়ার সঙ্গে।

মায়া চোখে আঁচল চাপা দেয়।

সুহাসিনী ধীরে ধীরে বলেন, আমিও তো যেতে পারব না বিকাশ।

বিকাশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন?

—কেন যে, সে তুই বুঝতে পারবি না বিকাশ। তবুও বলছি। বন্দনাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারব না। অন্তত ওদের বিয়েটা নিয়মমাফিক না হওয়া পর্যন্ত।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলে বিকাশ। রুক্ষ কণ্ঠে বলে, তা সে ব্যাপারটা তো যে কোন দিনই চুকিয়ে ফেলা যায়।

ধীর গম্ভীর স্বরে সুহাসিনী বলেন, তা হয় না বিকাশ। নিজেদের আঁখিঠারা আমি দিতে চাই না। আত্মীয়স্বজন যদি এ বিয়েতে এসে না দাঁড়ায়, তাহলে বন্দনা তার কোন অধিকারই পাবে না, আর বাচ্চাটারও সমাজে কোন স্থান হবে না।

বিকাশ অস্থির হয়ে ওঠে, কিন্তু মা—

শান্ত সুরে সুহাসিনী আস্তে আস্তে বলেন, জানি বিকাশ, এর জন্যে তোর অনেকখানি ক্ষতি হবে। কিন্তু তুই ছেলে, পুরুষমানুষ—তোর পথ যে কোন দিনই হোক তুই করে নিতে পারবি। তোদের জন্যে সমাজের সমস্ত রাস্তাই খোলা, তোদের তো সাতখুন মাপ। কিন্তু

বন্দনা যে মেয়ে। ওর এই অবস্থায় একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউই যে ওর পাশে এসে দাঁড়াবে না।

তবুও বিকাশ বলে, কিন্তু মায়ার সম্বন্ধে তোমার দায়িত্ব কি ছোড়দির চেয়ে কিছু কম। তার দিকে একবার তাকাবে না?

সুহাসিনী ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলেন, তাকাতে যে পারছি না বিকাশ। সবই বুঝি, তবুও কিছু করতে পারছি না। এতদিনে বুঝতে পেরেছি, বিমল খারাপ ছেলে নয়। কিন্তু ও যে পুরুষমানুষ। কেমন করে ওকে বিশ্বাস করব। বন্দনার সুখের কথা আমি ভাবছি না বিকাশ। আমি ভাবছি ওর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা, যার জোরে ও বিমলের বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে ওর ভিটেতে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে। বন্দনাকে এখানে ফেলে রেখে, কেমন করে আমি দেশে ফিরে যাব বল্?

বিমলের দাম্ভিক মুখখানা বিকাশের চোখের ওপর ভেসে ওঠে। যে আক্রোশে সে বাড়ীর দোর-গোড়া থেকে ঝড়ের বেগে তার ঘরে উঠে এসেছিল, সেই আক্রোশ আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রূর মুখভঙ্গি করে বলে, তাহলে ওই স্কাউন্ড্রেলটার জন্যে আমাদের সকলকেই মরতে হবে!

সুহাসিনী আঁতকে ওঠেন, বিকাশ!

বিকাশ ততক্ষণে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ঝপ্ করে উঠে পড়ে বলে, তাহলে তোমার ওই গুণধর জামাই আর আদরের মেয়েকে নিয়েই তুমি থাক। আমার পথ আমি বেছে নিই।

হন্‌হন্ করে বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সাত

শহর থেকে দূরে তাল, নারকেলের ছায়ায় ঘেরা নীরদের বাড়ীতে সেদিন ছিল পিক্‌নিকের ব্যবস্থা। আসবে ওরা সকলেই। সনত, আর সম্ভব হলে কমলা। অতীশ আর মালতী। মায়া আর বিকাশ। ভোর

থেকেই আসা শুরু হবে, সারাদিন ধরে চলবে হৈহুল্লোড়। সন্ধ্যের পর আবার যে যার ডেরায় ফিরে যাবে।

ব্যবস্থাটা হঠাৎ হলেও, ব্যাপারটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

সেদিনের সন্ধ্যায় মতি শীল স্ট্রীটে বিকাশের প্রস্তাবে সনতের এক কথায় রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, তার উপসংহার হিসাবে পরিস্কার একটি সিদ্ধান্ত গৃহিত না হলেও, সকলেই কথাটা মন দিয়ে ভাবছিল, সকলে মিলে শহরের মধ্যে একটা বাড়ী নিলে কেমন হয়!

বলা চলতে পারে, সূত্রটা এইখানেই। সেদিনের আলোচনায় নীরদ ততটা উৎসাহ বোধ না করলেও, কথাটাকে মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। তার জীবনেও সমস্যা আছে। আবার তেমনই আছে নিজের জীবনের শতদল মেলে দিয়ে ফলে ফুলে ভরে ওঠার আকাঙ্ক্ষা।

কথাচ্ছলে এক সময়ে নীরদ সমস্ত কথাই বলেছিল অনীতাকে।

অনীতা প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি বলেছ?

নীরদ উদাসীন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, আমি আবার কি বলব। ওতো শুধুই খানিকটা আলোচনা হল।

অনীতা কিন্তু কথাটাকে একেবারে লুফে নিলে। কর্তাবিহীন এক একান্নবর্তি পরিবারের বউ হয়ে সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এই ব্যবস্থাটীর স্বরূপ। প্রতি মুহূর্তের নীচতা আর নোংরামীর মধ্যে অনন্যোপায় হয়ে নিজেকে আগলে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেখেছে, 'আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা' কথাটা নিছক একটা ধাপ্পা। পরিবেশের যে প্রভাব, তার মধ্যে নিজেকে সব সময়ে সামলে চলতে পারেনি। যে নীচতার কথা সে কোনদিন নিজের মধ্যে কল্পনাও করতে পারে না, সেই নীচ চিন্তা নিজেকে করতে দেখে সে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। এটুকু সে এতদিনে সাফ্ বুঝতে পেরেছে, যে মানুষগুলোকে নিয়ে তাদের একান্নবর্তি পরিবার, তাদেরই এক পরিবারভুক্ত করাটা বোধহয় একটি-মাত্র কাজ, যা আজকের এই দুনিয়ায় সত্যিই অসম্ভব।

অনীতা আঁকড়ে ধরল ওই পরিকল্পনা। সে বুঝেছিল, সকলে

মিলে এক জায়গায় থাকার অর্থ এই নয় যে, একটি ছাঁচের মধ্যে সব কিছুকেই ঢালাই করে ফেলতে হবে। প্রত্যেকেই, যে যার নিজের জীবন নিয়ে চলবে, থাকবে সকলের সঙ্গে সকলের সদ্ভাব, পারস্পরিক সহযোগীতা—তাতে সকলেরই মঙ্গল হবে।

এ ব্যাপার নিয়ে অনীতা নীরদের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত নীরদকে রাজিও করালো। আর তার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে তাদের বাড়ীতে একদিন পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করে ফেলল।

পিক্‌নিকের আসর হিসেবে জায়গাটা চমৎকার। বাড়ীর সামনেই মস্ত পুকুর। পুকুরের উঁচু পাড়ে বড় বড় গাছ। যে কোন একটা গাছের গোড়ায় বসে রান্নাবান্না করা চলতে পারে। তার পাশে ঘাসে ঢাকা জায়গায় বসে চলতে পারে গল্পগুজব।

নীরদ হল বার্তাবহ।

কথাটা কেবল পাড়ার অপেক্ষা। নীরদের মুখে শুনেই সনত লাফিয়ে উঠল, বাঁচালে নীরদ, এখনই যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। এখনও তো আস্তকাল পড়ে রয়েছে।

খবরাখবর দেওয়ার কাজ ভাগাভাগি হয়ে গেল। সনত ছুটল বিকাশের বাড়ী, আর নীরদ গেল অতীশের কাছে।

সনত ছুটে গিয়েছিল কমলার কাছে। কমলাও আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল- ছেলেমানুষের মত। সেটা মুহূর্তের উত্তেজনা। তারপরই ছলছল চোখে বলেছিল, সে হয় না সনতদা, আমার পরিচয়ের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আমি এ'দের ঘাঁটাতে চাই না। তুমি জান না, এসব ব্যাপারে এ'রা কতদূর নির্মম হতে পারেন।

অগত্যা সনত একাই গিয়ে হাজির হল সকলের আগে।

অনীতা তখন গাছ-কোমর বেঁধে একরাশ বাসনকোসন নিয়ে বসেছিল পুকুরের ঘাটে। সনতকে দেখে সে উঠে এল।

সনত বললে, তুমি যে একা অত বাসনের কাঁড়ি নিয়ে বসেছ! আর সব গেল কোথায়?

সকৌতুক হেসে অনীতা প্রশ্ন করল, কাদের কথা বলছ?

—কেন, বাড়ীর আর সমস্ত লোক।

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে অনীতা, তোমরা তো তাদের কেউই নও সনতদা, তোমরা যে শুধু আমাদেরই বন্ধুবান্ধব।

সনতের মুখখানা মুহূর্তে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

অনীতার মুখের হাসি মিলিয়ে যায় সনতের কালো হয়ে ওঠা মুখ-খানা দেখে। ক্ষণেকের জন্যে চোখটা নামিয়ে নিয়ে বললে, ওসব কথা নিয়ে মন খারাপ কর না সনতদা, তোমার জন্যে এক কাপ চা করে দিই।

সনত বললে, না না থাক এখন, আবার আলাদা করে করবে কেন! ওরা আসুক, সকলে মিলে এক সঙ্গেই চা খাওয়া যাবেখন।

অনীতা হেসে বললে, এটা তো আর তোমাদের মিলিটারী ক্যাম্প নয় যে, একবারের বেশী চা তৈরী করলে আমার কোয়ার্টার গার্ড হয়ে যাবে!

সনত হেসে উঠল।

অনীতা চলে গেল বাড়ীর ভেতর।

নীরদ তার ঘরের মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলে, এস সনত, ঘরের মধ্যে এস। ওই বাসনকোসন নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওটা অনীতার নিজস্ব এক্তিয়ারের এলেকা।

সনত ঘরের মধ্যে আসতেই নীরদ প্রশ্ন করল, অনীতা অমন হন্‌হন্‌ করে গেল কোথায়?

সনত বললে আমার জন্যে চা করতে।

—যাক্‌, তোমার দৌলতে তাহলে আমারও একটু জুটবে, নীরদ সরবে এক হাই তুলে খানিকটা আড়ামোড়া ভাঙে। তারপর বলে, জানো সনত, তোমার জন্যে অনীতার বড় ভাবনা।

সবিস্ময়ে সনত প্রশ্ন করে, আমার জন্যে! কেন?

হেসে নীরদ বললে, আর কেন, বাড়ীঘর ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠেকেছ তো হাটের মাঝে। ওর ভাবনা, শেষ পর্যন্ত 'অপরম্‌ বা কি ভবিষ্যতি' না হয়।

নীরদের কথায় সনত প্রাণ খুলে খানিকটা হেসে নেয়। তারপর বলে, তা যা বলেছ। প্রায় তাই-ই তো হতে চলেছিল। ভাগ্যে কমলা হাল ধরেছিল, তাই তো আশা হচ্ছে ঘর হয়তো একদিন বাঁধবই।

নীরদ বললে, সে কথা তুমিই ওকে বুঝিয়ে বলো। আমি যতটুকু বলেছি তাতে ও খুব ভরসা পাচ্ছে না। সমস্যাটা এখন ওরই। তোমার কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত ফুরসতই পাই না। সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যাই। কোথায় বিড়ির কারখানা, কোথায় চুলের তেলের ফ্যাক্টরী, কোথায় বটতলা মার্কা বইয়ের দোকান, সারাদিন ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করি। সন্ধ্যের পর ফিরে হ্যারিকেন জেবলে কাজ করতে বসি।

সনত বললে, এ রাস্তায় তো ইলেক্‌ট্রিক রয়েছে। তবে তোমাদের ইলেক্‌ট্রিক নেওয়ার অসুবিধেটা কি!

ম্লান হেসে নীরদ বলে, অসুবিধে যে সবটাই। সমস্ত ব্যাপারটাই যে ভাগের মা। কাজেই গা নেই কারও। আর এত কম রোজগারে অন্য ব্যবস্থাই বা কি করব। এভাবে যেন আর চলছে না। একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি, কি বল ?

হেসে ওঠে সনত, কোথায় দেখবে! এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ? নাম তো লিখিয়ে এসেছ বহুদিন! চাকরী পাবে কোথায়! চাকরী তো এখন উবে যাওয়ার দিন। লড়াইয়ের বাজারে কাজের অভাব ছিল না, কাজেই চাকরীরও অভাব হয়নি। কিন্তু এখন তো কারবার গুটানোর পালা। মিলিটারী থেকে বিলিজ করে দিচ্ছে। আর যুদ্ধকালীন কারখানাগুলোও দিচ্ছে বন্ধ করে। চতুর্দিকে কেবল ছাঁটাই।

অনীতা চা নিয়ে এল।

সনত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললে, আমি কি বোকা! ভাগ্যে তুমি আমার কথা শোননি।

সস্নেহে হেসে সনতের দিকে চেয়ে অনীতা বললে, আমরা ঠিকই বুঝতে পারি, তোমাদের কোন কথাটা শোনা উচিত আর কোনটা উচিত নয়।

নীরদ গরম চায়ে হুস্‌স্‌ করে এক টান দিয়ে বলে ওঠে, তা বলে রোজ রাত্তিরে আমার কাজ শেষ হওয়ার আগেই, আমার কথা না শুনে আলো নিভিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই উচিত কাজ নয়।

সনতকে সালিশ মানলে অনীতা, আচ্ছা সনতদা, তুমিই বল, ওই

কেরোসিনের আলো নাকের ডগায় নিয়ে বেশীক্ষণ কাজ করলে চোখ নষ্ট হবে কি না?

নীরদকে তারপর ঝাঁঝিয়ে ওঠে অনীতা, আর রোজ ভোরে যে চায়ের কাপটি মাথার শিয়রে রেখে ডেকে দিই, সেটা বুঝি কিছু নয়!

সনত কিছুক্ষণ অনীতার সরল মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। তার-পর কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, তাহলে তোমারও তো এখানে অসুবিধে হচ্ছে নীরদ।

নীরদ বলে ওঠে, আমাদের সুবিধে আর এ দুনিয়ায় কোথাও হবে না সনত। ওই মিলিটারীতে ঢুকেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। আর্টিষ্টেরও অভাব নেই। আর আমাকেও নতুন করে পরিচয় দিতে হচ্ছে। প্রায় ওই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মতই ভীড় একটা পার্টির দরজায়। আর এরই সুযোগ নিয়ে রেট্ এখন পার্টিরাই বেঁধে দিচ্ছে। আর্টিষ্টের কিছু বলবার উপায় নেই। মুখ যদি খুলেছি, অমনি অন্য আর একজনকে কাজটা দিয়ে দেবে।

অনীতা তার ওপর যোগ করল, রোজ বাসভাড়াই বেরিয়ে যাচ্ছে আট আনা থেকে বারো আনা। কাজের ধান্দায় ঘুরে ঘুরে নিজের আঁকা একেবারেই ঘুচে গেছে। ও বোধহয় ভুলেই গেছে, ও একজন আর্টিষ্ট—কমার্সিয়াল ডিজাইনার নয়!

অনীতার কথায় এমন একটা ব্যথার সুর বেজে ওঠে যে, চমকে উঠে সনত তার মুখের পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পাবে না। দেখে, অনীতার চোখের কোলটা চক্‌চক্ করছে।

সনতের তীক্ষ্ম, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি অনীতার চোখে পড়তেই সে ছুটে চলে যায় পুকুরঘাটের দিকে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকে সনত। নীরদ মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে খুঁটতে থাকে।

হঠাৎ সনত নীরদের একটা হাত চেপে ধরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে ওঠে, না নীরদ, এভাবে নিজেকে মেরে ফেলতে পারবে না তুমি। এ কি করেছ বল দেখি! অনীতার মন একেবারে ভেঙে দিয়েছ!

নীরদের মুখখানা তখনও থম্‌থম্ করছে। একবার চোখ তুলে

চাইলে সনতের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ এসব কথা থাক সনত। চল, বাইরে গিয়ে বসি।

ঘর থেকে বেরিয়ে রোয়াকে এসে দাঁড়াতেই, দূরে দেখা গেল অতীশ আর মালতীকে। অতীশ আসছে আগে আগে, আর তার পেছনে পেছনে আসছে মালতী নাতিদীর্ঘ ঘোমটা দিয়ে।

অতীশ আর মালতী ওদের সামনে এসে দাঁড়াতেই পুকুরঘাট থেকে উঠে এল অনীতা। একেবারে জড়িয়ে ধরল মালতীকে। উচ্ছল খুশীতে বলে উঠল, ভাগ্যে এমন একটা ব্যবস্থা করা গিয়েছিল, তাই তো তোমায় দেখতে পেলাম ভাই। তা না হলে কেবল তো ওর মুখ থেকে তোমার কথা শুনি।• তুমি নাকি ভীষণ লাজুক!

মালতীর আনত মুখখানার দিকে চাইতে গিয়ে অনীতার দৃষ্টি ঠেক্ খেয়ে যায় তার ঘোমটায়। যেন চমকে উঠে অনীতা বলে, এত বড় ঘোমটা দিয়ে আছ কেন!—বলেই মাথার কাপড় নামিয়ে দেয়। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে মালতীর সুন্দর মুখখানার দিকে।

সন্ত্রস্ত মালতী কেমন যেন জড়সড় হয়ে ওঠে।

সনত বলে ওঠে, বেশ করেছ অনীতা, ওর ওই লম্বা ঘোমটাটা খুলে দিয়ে। ওর সামনে কি আছে, চোখ মেলে একটু দেখতে শিখুক।

শ্রদ্ধানত দৃষ্টিতে অনীতা চেয়ে দেখে সনতের মুখের দিকে। মুখখানা তার ম্লান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, ঠিক বলেছ সনতদা. ঘোমটা টেনে হোঁচট খেয়ে খেয়েই আমাদের জীবনটা গেল। নিজের পথ আর আমরা চিনে নিতে পারলাম না।

এতক্ষণে অতীশ মুখ খোলে, তুমি তো দেখছি এক জবরদস্ত সাকরেদ পেয়ে গেছ সনত।

নীরদও যোগ দেয় সনতের সংগে, তা আর না! সনত এসে লেকচার ঝেড়ে যাবে, আর তার প্রয়োগ চলবে আমার ওপর। ওরা যেন দুনিয়াটাকে ঢেলে সাজতে চায়।

অনীতা হেসে উঠল, দেখলে তো সনতদা. কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। তুমি কমলাদিকে নিয়ে এলে না কেন, তাহলে এদের ঠান্ডা করে দিত।

সনত বললে, সে এলো না অনীতা। আমি তাকে বলেছিলাম। সে বললে, বড়লোকের মেয়ে অবস্থায় সে তোমাদের মাঝখানে আসতে চায় না, সে আসবে পুরোপুরি গরীবের বউ হয়ে।

অনীতা বলে ওঠে, বাঃ, এ কথা যে মেয়ে বলতে পারে, সে মানুষটা না জানি কত সুন্দর!

অতীশ আবার টিপ্পনি কাটে, দেখলে তো নীরদ, একা সনতেই রক্ষা নেই, তার ওপর আবার কমলা দোসর। আর আমরা সব বানের জলে ভেসে গেলাম!

মালতীর একটা হাত ধরে অনীতা বললে, চল ভাই, আমরা এখান থেকে চলে যাই। এইবার ওদের যে সব কথাবার্তা শুরু হবে, তার মাঝখানে আমাদের না থাকাই ভাল।

মুচকে হাসে মালতী।

নীরদ বলে ওঠে, এই তো! সবই তো বোঝ দেখছি! তবে কেন মুখ টিপে থাক?

মালতীর মুখখানা হঠাৎ আরক্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগের সুরে বলে, আপনারা এত বোঝেন, আর এইটুকু বোঝেন না কেন যে, আপনাদের কারও সঙ্গে যখন আমি কথা বলি, তখন ছোটমামিমা দরজার আড়ালে আড়ি পেতে থাকেন।

মুহূর্তের মধ্যে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতীশের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। নীরদ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সনত মালতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

অনীতা মালতীর হাতে টান দিয়ে বললে, চল ভাই, কাজকর্ম আমরা শুরু করে দিই। মায়ার শরীরতো শুনলাম খুবই খারাপ। তার জন্যে আর অপেক্ষা করে লাভ কি।

চলে যায় অনীতা আর মালতী।

অতীশ বলে ওঠে, শুনলে তো নিজের কানে। ওই মালতীকে নিয়ে হয়েছে যত অশান্তি।

নীরদ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, মালতীকে নিয়ে অশান্তি!

অতীশ কাঁধ কুঁচকে বলে, তা ছাড়া আর কি। সনত তো বলে এল

মালতীকে আবার নতুন করে পড়াশুনো শুরু করতে। আমিও দিলাম কিছু বইপত্তর যোগাড় করে। কিন্তু ওই পড়া নিয়েই বেধে গেছে লঙ্কাকাণ্ড! ছোটমামিমা সহ্য করতে পারেন না মালতীর পড়াশুনো— বউ মানুষ, তার আবার লেখাপড়ায় কি দরকার। আর মালতীরও নেশা ধরে গেছে পড়াশুনার ওপর। একদিক থেকে ছোটমামিমার একটানা অভিযোগ, মালতী বাড়ীর কাজকর্ম কিছুই করে না, সব সময়েই বই মুখে করে বসে আছে। আর মালতীর নালিশ, তার হাতে বই দেখলেই ছোটমামিমার একটা-না-একটা কাজ মনে পড়ে যায়। এই নিয়ে দিনরাত ঘ্যান্‌ঘ্যান্ প্যান্‌প্যান্ লেগেই আছে। এখন আমি যাই কোথায়!

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে থাকে।

হঠাৎ নীরদ বলে ওঠে. এই-ই হ'ল আমাদের সমাজের মজা। আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, মালতী পড়াশুনা করবে কি করবে না, সেটা মালতী আর অতীশের ব্যাপার। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সবচেয়ে বেশী ওদের ছোটমামিমা, যিনি মেয়েদের লেখাপড়া পছন্দ করেন না। এই রকম একটা পরিবেশের মধ্যে থাকলে আমাদের পক্ষে সভ্য হয়ে ওঠা অসম্ভব।

সনত বললে. সেই জন্যেই তো সমাজের এই কাঠামোটা সকলে মিলে ভেঙে ফেলা দরকার।

অতীশ মুখভঙ্গি করে বলে ওঠে, তুমি আছ কোন ভাবের ঘোরে সনত! তাই স্বপ্ন দেখছ, সকলে মিলে সমাজটাকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়বে। জান, আমার ছোটমামাই ছোটমামিমার সব চেয়ে বড় সহায়।

সনত বললে, কিন্তু এ কথাও তো সত্যি যে, আমরা কেউই একা একা কিছু করে উঠতে পারছি না। মাঝখান থেকে আত্মঘাতি আক্রোশে নিজেদেরই আমরা নষ্ট করে চলেছি। কাজেই সকলে মিলে সমাধানের একটা পথ বার করতেই হবে।

সনতকে বাধা দিয়ে নীরদ বলে, কিন্তু সকলকে মেলানোটাই তো এক সমস্যা। মানুষতো সকলে একরকম নয়।

সনত বললে. না, সব মানুষ এক রকম নয়। কিন্তু এমন কতকগুলো অবস্থা আছে যেখানে অঙ্কের হিসেবে সব মানুষ না হলেও, অধিকাংশ

মানুষই এক। যেমন ধর, অতীশ চাইছে তার মনের মত জীবন। নীরদ, তুমিও তো সেই একই জিনিস চাও। আমিও তাই চাইছি। অথচ যে অবস্থার মধ্যে রয়েছি, সে অবস্থার মধ্যে আমাদের কারও আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হচ্ছে না। তাহলে এইখানে আছে আমাদের মিল। চেষ্টা করলে, এই সমস্যাটার সমাধান আমরা সকলে মিলে করতে পারি।

বিকাশ প্রায় ধরে ধরে মায়াকে নিয়ে আসছে।

নীরদ খানিকটা এগিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ওরা সনত আর অতীশের সামনে এসে দাঁড়ায়।

মায়া হাঁপাচ্ছে।

নীরদ আর অতীশ এই প্রথম দেখছে মায়াকে। কিন্তু বিস্ময় তাদের সে জন্যে নয়। বিস্ময় জেগেছে মায়ার কাগজের মত সাদা মুখখানা দেখে, অস্বাভাবিক চকচকে চোখের সর্বগ্রাসী চাহনি দেখে, আর দেখে তার হাঁপানোর ধরণ। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা দুজনেই সনতের মুখের দিকে তাকায়।

সনত মায়াকে কাছে ডাকে, এখানে এসে একটু বস মায়া।

মায়ার চোখ দুটো হঠাৎ কেন যেন জলে ভরে ওঠে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সনতের পাশে বসে পড়ে। ক্ষণেকের জন্যে মাথা নিচু করে থেকে ছেলেমানুষি সুরে বলে, সনতদা, এঁদের মধ্যে কে নীরদদা আর কে অতীশদা, আমায় চিনিয়ে দিলে না তো!

নীরদ বলে ওঠে, খবরদার সনত, তুমি বলে দিও না। মায়াকে নিজেকেই চিনে নিতে হবে। দেখি, বিকাশ তার কাছে আমাদের কেমন পরিচয় দিয়েছে।

মায়ার চোখেমুখে অপরূপ এক হাসি ফুটে ওঠে। সারা মুখখানা যেন কি এক গভীর তৃপ্তিতে ছেয়ে গেছে। আর চোখের কোলের টল্‌টলে অশ্রুবিন্দুর মধ্যে দিয়ে সেই হাসির কণা ঠিকরে পড়ছে।

মায়া সেই চোখ তুলে নীরদকে বললে, আপনিই নীরদদা, না?

নীরদ প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল, তুমি দেখছি একজন পাকা জহুরি!

মায়া সে-কথায় কান না দিয়ে অতীশকে বললে, আপনি বুঝি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না, অতীশদা?

অতীশ থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে ওঠে, তোমার সঙ্গে কথা বলব না, এ কখনও হতে পারে! তুমি যে আমাদের ছোট্ট বোনটি।

মায়া সনতের দিকে ফিরে বললে, জানো সনতদা, তোমার প্রথম কথায় কেন আমার চোখে জল এসেছিল? তোমার মতন অমন করে কেউ কোনোদিন আমাকে কাছে ডাকেনি। তাই তোমার ডাক শুনেই আমার বড্ড কষ্ট হয়েছিল।

বিকাশ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মায়ার মুখের দিকে। কেমন যেন অচেনা অচেনা মনে হচ্ছে মায়াকে। এত সরল, এত স্নেহের কাঙাল মায়াকে সে আর কখনও দেখেনি। তার কলকাতা বাসের প্রথম পর্বে মায়া ছিল সাথি, পরামর্শদাত্রী। বিয়ের পর মায়া ছিল উচ্ছল, উদ্দাম। মিলিটারী থেকে খালাস হয়ে ফিরে দেখলে, সে মায়া ফুরিয়ে গেছে! ক্বচিৎ কখনও জীবনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। সে-ও তো দুর্যোগের রাত্রে মসীবর্ণ আকাশের বুক চিরে চকিতে খেলে যাওয়া বিদ্যুতের মত!

বিকাশ ভেবে পায় না, মায়ার মধ্যে এত প্রগলভতা এল কোত্থেকে! স্নেহের একটু স্পর্শ পেয়ে এমন কাঙাল হয়ে উঠল কেমন করে!

নীরদ ভেতরে গিয়ে অনীতা আর মালতীকে ডেকে আনে।

কোমরে আঁচল জড়ানো অবস্থায় অনীতা আর মালতী বেরিয়ে আসে। ঢাকা বারান্দায় পা দিয়েই অনীতা বলে ওঠে, বাঃ মায়া, বেশ তো! তুমি বুঝি মজা করে এখানে গল্প জমিয়েছ! আর আমরা দুটিতে মরছি খেটে খেটে।

পেছন ফিরে চায় মায়া। ততক্ষণে অনীতা মায়ার পেছনে এসে তার কাঁধে একটা হাত রেখেছে। মায়ার ডাগর দুটি চোখের চাহনির দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই চমকে ওঠে অনীতা। মালতী ধীরে ধীরে এসে অনীতার পাশে বসে।

অনীতা চোখ সরাতে পারছে না মায়ার মুখ থেকে। আপন মনেই স্বগতোক্তি করে ওঠে, এমন সুন্দর মুখখানা! কিন্তু এত শুকনো কেন!

মায়া বারান্তরে অনীতা আর মালতীর দিকে চেয়ে বলে ওঠে, অনীতাদি, মালতীদি—

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বিকাশকে বলে মায়া, দেখ, দেখ, আমার কত দাদা, দিদি। আমার আর ভাবনা কি।

মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়াটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ওর মধ্যে মায়াই একমাত্র সজীব, প্রাণবন্ত। আজ যেন সে সকলের মধ্যে থেকে প্রাণ সেচে নিয়ে নিজের শুষ্কপ্রায় জীবনীশক্তিকে সরস করে নিয়েছে।

মায়া আব্দার ধরে, অনীতাদি, মালতীদি, তোমরা সকলে একটু আমার কাছে বস না, তোমাদের সকলকে একটু একসঙ্গে দেখি।

মালতী নীরবে মায়ার পাশে বসে তার পিঠে একটা হাত রাখে।

নীরদ বলে, ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নিয়ে বসলে হত না। তাহলে বেশ জমাটি আড্ডা দেওয়া যেত, কি বল সনত ?

সনত কিছু বলবার আগেই মায়া বলে ওঠে, না নীরদদা, এখন কেউ আমার কাছে থেকে উঠে যেতে পারবে না। আমার বড্ড ভাল লাগছে তোমাদের সকলকে। আর কোনদিন তোমাদের সকলকে এমনভাবে পাব কি না কে জানে! তাই ইচ্ছে করছে, আজকের এই প্রথম দেখাটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে নিই।

অনীতা তখনও চোখ সরায়নি মায়ার মুখের ওপব থেকে। মুখের অমন চেহারা তার বড় বেশী চেনা। তার মায়ের মুখখানা কবে যে হঠাৎ অমন সাদা হয়ে গিয়েছিল, কবে যে চোখদুটো অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠেছিল, অনীতা জানতে পারেনি। হঠাৎ যেদিন তার নজরে পড়েছিল, সে মাকে বলেছিল, মা তুমি কি সুন্দর হয়েছ! মা মুচকে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যাঁরে, প্রদীপ নেভার আগে একটু বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে-কথার তাৎপর্য অনীতা সঠিক বুঝতে পারেনি। তার অল্প দিনের মধ্যেই মা বিছানা নিলেন। রীতিমত চিকিৎসা সুরু হওয়ার আগেই প্রদীপ নিভে গেল।

মায়া ক্ষণেক চুপ করে থেকে একটু দম নিয়ে আবার বলতে সুরু করে, জানো সনতদা, সেই যে সেদিন তুমি বলে এলে এখানে আসার

কথা, সেইদিন থেকে আমি কেবল দিন গুণে এসেছি, কবে, কখন এখানে আসব। সারা দিনরাত যখনই ওকে কাছে পেয়েছি, বার বার জিজ্ঞেস করেছি নীরদদা কেমন দেখতে, অতীশদা কেমন দেখতে, অনীতাদি আর মালতীদিকে ও দেখেছে কি না। কে কি রকম, কে কি ভাবে কথা বলে, আরও কত কি! ও বিরক্ত হয়েছে, রাগ করেছে। আমি কিন্তু একটুও অভিমান করিনি ওর ওপর। ও তো বুঝতে পারেনি, আমি কি জানতে চাইছিলাম।

আবার সকলের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। সবকটা চোখ এক সঙ্গে মায়ার মুখের ওপর নিবন্ধ হয়।

সকালের সূর্য ততক্ষণে গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে। সেই রোদ পুব দিক থেকে এসে পড়েছে রোয়াকের কোল ঘেঁষে ওদের পায়ের তলায়। পুকুরের বুকে ছায়া ছোট হয়ে এসেছে, কয়েকটা শালুক ততক্ষণে দল মেলেছে। গাছের তলার অন্ধকার ততক্ষণে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর পুকুরের ওপারে ন্যাড়া একটা তাল গাছের গায়ে বসে একটা কাঠঠোকরা নিবিষ্ট চিত্তে ঠুকবে চলেছে।

হঠাৎ মায়া সনতের একখানা হাত আঁকড়ে ধরে সোজা তার চোখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করে, তোমরা সকলে মিলে আমাকে বাঁচাতে পার না সনতদা?

চমকে ওঠে সনত। ফ্যাকাশে হয়ে যায় বিকাশের মুখখানা। অতীশ মুখ ঘুরিয়ে নেয় পুকুরের দিকে। নীরদ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে মায়ার মুখের দিকে।

অনীতা মায়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ধমক দেয়, ছিঃ মায়া, অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে নেই।

মায়া হঠাৎ ঘুরে বসে অনীতাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে, আমার যে কেবলই মনে হয়, মরে গেলে বাঁচি!

আট

বাড়ীর খোঁজটাই আবার বিকাশ উঠে-পড়ে লেগে গিয়ে করছিল।

সেই সূত্রে একদিন তার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ধীরেনবাবুর সঙ্গে। ধীরেনবাবু তার দেশের লোক। কলকাতায় আছেন বহুকাল। নীতিশবাবুর অর্থাৎ মায়ার বাবার বাসা ছেড়ে বিকাশ যখন গিয়ে ওঠে মেসে, তখনই ধীরেনবাবুর সঙ্গে পরিচয়টা গাঢ় হয়েছিল। ধীরেনবাবু তখন কি করতেন বা কেমন করে দিন চলতো, সে-বিষয়ে বিকাশের সে-দিনগুলোতে কোনই কৌতুহল জাগেনি। তবে খানিকটা সহানুভূতি আপনা থেকেই জেগে উঠেছিল, তাঁর ক্লায়ক্লেশে দিন গুজরান করার নগ্ন রূপটা দেখে।

ধীরেনবাবু জানতেন বিকাশের মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার কথা। শিয়ালদার মোড়ে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনিই প্রথম প্রশ্ন করেন, কিহে বিকাশ, ফিরলে কবে ? এমন সিভিলিয়ান পোষাকে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছ, তখন নিশ্চয়ই পাকাপোক্তভাবে ছাড়া পেয়েছ ?

জবাব দিতে গিয়ে বিকাশ বারম্বার ধীরেনবাবুর সুটটার দিকে নজর না করে পারে না। এমন প্রশ্নের উত্তরে যে সহজ উত্তরটা মুখে আসে, সেটা কেমন যেন ঘুলিয়ে যায়। একটু যেন আনমনা ভাবে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, কাজ ফুরিয়ে গেলে কে আর কবে রেখে দেয় বলুন !

কথা বলতে বলতে বিকাশের চোখের ওপর ভেসে ওঠে ধীরেনবাবুর সেই একখানি ধুতি আর লুঙ্গি। আর চাঁদনি থেকে কিনে আনা টুইলের সেই হাফ সার্টটা, যেটা তিনি বারো আনায় কিনেছিলেন। সপ্তাহে একবার সাবান দিয়ে কেচে, শুকিয়ে, বিছানার তলায় রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ওপর যোগাসনে বসে থেকে ইস্ত্রি করার কাজটা সেরে নিয়ে যাঁকে বাইরে বেরোতে হতো, সেই লোক এমন ঝকমকে সুট পরছেই বা কোথা থেকে ! আর কেনই বা পরছে !

বিকাশের এ-বিস্মিত দৃষ্টি ধীরেনবাবুর নজর এড়ায়নি। হেসে পকেট থেকে ক্যাপস্টানের টিনটা বার করে ঢাকনা খুলে এগিয়ে ধরলেন বিকাশের দিকে।

বিকাশ কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। তার চেয়ে বয়সে বড় গ্রাম সুবাদে দাদার হাত থেকে সিগারেট নিতে সঙ্কোচ বোধ না করে পারে না। সে যে তাঁকে ধীরেনদা বলত, আর এ দাদা-ভাই সম্পর্কের মধ্যে দূরত্বও যে ছিল বেশ খানিকটা।

খোলা টিনটা আরও খানিকটা এগিয়ে ধরে ধীরেনবাবু বলেন, আরে আমার কাছে লজ্জা কিসের! আমি তোমার গুরুজন নই বিকাশ, আমরা ছিলাম রুমমেট।

এ সরল স্বীকৃতি ভাল লাগে বিকাশের। সন্তর্পণে একটা সিগারেট তুলে নেয়।

আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের ওপর ঠুকতে ঠুকতে ধীরেনবাবু সুপ্তোত্থিতের মত বলে ওঠেন, ওঃ সে-সব কি দিন-কালই না গেছে বিকাশ! ওই মেসের খুপরির মধ্যে দেড় হাত চওড়া নড়বড়ে তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন কড়িকাঠ গুণেছি আর ভেবেছি, কি দুঃসময়ই না এসেছে আমাদের জন্যে!

ক্ষণেকের জন্যে চুপ করে থাকেন ধীরেনবাবু। বোধহয় এন্টনি-বাগান লেনের মেসবাড়ীর সেই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে দিন-দুপুরে তক্ত-পোষেব ওপর বসে, দুটি হাঁটু মুড়ে তার ওপর থুতনিটাকে রেখে, সেদিনকার সেই ভাবনাগুলো—বোধহয় তারই একটা বিশেষ মুহূর্ত বড় বেশী করে মনে পড়ে যায় বিকাশের সঙ্গলাভ করে।

শিয়ালদার মোড় নিভৃত চিন্তার জায়গা নয়। অর্ধনগ্ন এক মেয়ে-ভিখারি সামনে এসে তার কঙ্কালসার হাতখানা বাড়িয়ে ধরে ধীরেন-বাবুর সামনেই।

চমকে উঠে ধীরেনবাবু বলেন, চল বিকাশ, একটু চা খাওয়া যাক। ওঃ কতকাল বাদে তোমার সঙ্গে দেখা!

একটি গলির মধ্যে ঢুকে বিরাট প্রাঙ্গন জুড়ে চায়ের দোকান। চালার তলায়, আবার চালার বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় সারি সারি চেয়ার টেবিল পাতা। ধীরেনবাবু এগিয়ে গেলেন খোলা জায়গাটার দিকে। খোলা জায়গায় কম আলো, আর ঢাকা জায়গায় চড়া আলো।

বিকাশ আর ধীরেনবাবু একটি টেবিলের মুখোমুখি বসতেই বয় এসে দাঁড়াল।

ধীরেনবাবু বললেন, শুধু চা খাওয়া উচিত নয়। ওই থেকে গ্যাস-ট্রিক আলসার পর্যন্ত হতে পারে। চায়ের সঙ্গে কিছু নেওয়া যাক. কি বল?

এমন ক্ষেত্রে সোল্লাসে সম্মতি জানাবার মত সম্পর্ক নয় বিকাশের। বরং এমন প্রশ্নে সে নিজেকে কেমন যেন বোকা-বোকা অনুভব করতে থাকে।

অগত্যা ধীরেনবাবু বিকাশের মৌন ভাবটাই সম্মতি বলে ধরে নিয়ে বয়কে হুকুম দিলেন, দুটো ব্রেস্ট কাটলেট আর দু'কাপ চা।

অর্ডার নিয়ে বয় চলে গেল।

ধীরেনবাবু টেবিলের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে বসে বললেন, তুমি তো চলে গেলে মিলিটারীতে। আমি তখনও ভাবছি. কি করি। অবস্থাতো ক্রমেই কাহিল হয়ে আসছে। মাস গেলে মেসের ম্যানেজারকে কি বলব, তারই রিহার্শাল দিচ্ছি মনে মনে, আর ফ্যাফ্যা করে ঘুরছি কলকাতার অলিগলি। সত্যি কথা বলতে কি. কতবার যে মনে হয়েছে, ঢুকে পড়ি মিলিটারীতে তোমার মত। ওই ভাবনাটা তুমিই ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে মাথার মধ্যে। ভেবে দেখ একবার, কি লোভটাই না হত! শুধু একবার গিয়ে দাঁড়ানোর অপেক্ষা. তাহলেই নিটোল একটা চাকরী—খাওয়া, পরা, থাকা, রোগভোগে ওষুধবিষুধ. ছুটির সময় রেলের পাস, তারও ওপর আবার মাসে মাসে মাইনে! কাজটা কি? শুধু হুকুম মানা। একি কম লোভ বিকাশ! কতদিন ভর্তি হওয়ার সঙ্কল্প নিয়েই মেস থেকে বেরিয়েছি। কিন্তু জানই তো, ধৈর্য ধরলে ফল ফলবেই।

খাবার আর চা এসে গেল।

ধীরেনবাবুর ঝোঁক খাওয়ার চেয়ে কথা বলার দিকেই বেশী। অনর্গল বকে চললেন। সে কি খুশীভরা উচ্ছ্বাস—সবই তাঁর সাফল্যের ইতিবৃত্ত।

—তারপর দেখতে দেখতে লড়াইয়ের কারবার জমে উঠল। একদিকে মিলিটারী কনট্র্যাক্ট, আর একদিকে ব্ল্যাক মার্কেট। যারই কিছু পয়সা

আছে, সে তখন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজের লোকের জন্যে। মিলিটারী কনট্র্যাক্ট ধরতে গেলে বা ব্ল্যাক মার্কেট করতে গেলে চোখের পর্দা থাকলে চলবে না।

—জুটে গেল টাকাওয়ালা লোক, বাঁশের চোঙার মধ্যে থেকে বহুকালের মরচে-ধরা টাকা বার করে এনেছে। সুরু হল ব্লেড দিয়ে, তারপর মসলা-পাতি, তারপর চালানি মাল। যা হোক একটা কিছু ধরতে পারলেই হল। কলকাতায় তখন ধুলো মুঠো সোনা! টাকা আসতে লাগল। আর সিলভার টনিক হাতে পড়লে বুদ্ধিও খুলে যায় চিচিং ফাঁক-এর মত। প্রথম ছিল কমিশন, তারপর ওয়ার্কিং পার্টনার, তারপর—

—তারপর ওষুধের কারবার। যুদ্ধের বাজারে বিলেত থেকে ওষুধ আসছে না। কিন্তু তাই বলে তো মানুষের রোগভোগ কমেনি। ওষুধের চাহিদা আছে। শিশিতে লেবেল লটকে খানিকটা রঙ-করা জল ভরে দিলেও পড়তে পায় না, কোন রকমে বাজারে এনে ফেলতে পারলেই টাকা। টাকা এখন আসছে জলের মত—

কথার ফাঁকে ফাঁকে কাটলেট আর চা কখন শেষ হয়ে যায়। সিগারেটের টিন খোলা অবস্থাতেই টেবিলের ওপর রাখা আছে। ধীরেনবাবুর মুখে সিগারেটের আগুন নিভতে পারছে না।

বিকাশ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ধীরেনবাবুর চকচকে মুখখানার দিকে। সব কথা তার কানে পুরোপুরিভাবে যায়নি। সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবছে, বছর পাঁচেকের ব্যবধান, তার মধ্যে একটা যুদ্ধ দুনিয়াটাকে কি ওলটপালটই না করে দিয়েছে! সেই ধীরেনবাবুর মুখ দিয়ে আজ তাঁর কৃতিত্বের বর্ণনা তুবড়ির মত ফেটে বেরোচ্ছে! অথচ এই মানুষটাকেই সেদিন সে ওই এ্যান্টনি বাগান লেনের মেসে মুখচোরা, লাজুক বলে অনুকম্পাও দেখিয়েছে।

হঠাৎ বোধহয় চমক ভাঙল ধীরেনবাবুর। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, যাক, তোমার কি খবর বল? কোথায় আছ, কি করছ, কেমনভাবে দিন কাটছে? যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আই ক্যান হেল্প্ ইউ এ লট্। আমি আর তোমার সে-ধীরেনদা নই বিকাশ। এখন আই কমান্ড মেনি থিংস—

প্রথমটা বিকাশ কেমন যেন কুঁচকে যায়। ধীরেনদার ওই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের ইতিহাসের উত্তরে তার জীবনের একঘেঁয়ে অভাব, অনাটন, অসাফল্যের কাঁদুনি গেয়ে লাভ কি! আমতা আমতা করে বিকাশ বলে, এই আছি পাথুরেঘাটার একটা বাসায়—বাসাটা তেমন ভাল নয়। আর চাকরীও এখনও জোগাড় করে উঠতে পারিনি। এই আর কি—দিন চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

অত সহজে পার পেলে না বিকাশ। ধীরেনবাবু যেমন নিজের কথা উজাড় করে বলতে জানেন, তেমনি পরের পেটের কথাও টেনে বার করে নেওয়ার কৌশলটাও তাঁর অজানা নয়।

নতুনভাবে কথা সুরু করলেন ধীরেনবাবু। আর ধীরে ধীরে বিকাশের মুখ খুলতে লাগল। তার আর্থিক অবস্থা, তার বাসার দুর্দশা, মায়ার অসুস্থতা, সবই সে বলে গেল একে একে। কথার শেষে বলল, সব চেয়ে আগে আমার চাই একটি ভাল বাড়ী, তাতে থাকবে অন্তত চারখানা ঘর। ভাড়া আর সেলামীটা যত কম হয়, ততই ভাল।

বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করেন ধীরেনবাবু, চাকরীর আগে তুমি বাড়ী খুঁজছ বিকাশ, তাও আবার এত বড় বাড়ী! ব্যাপার কি?

ধীরেনবাবু অনর্গল কথা বলেছিলেন তাঁর সাফল্যের ফিরিস্তি দেওয়ার সময়ে। বিকাশেরও মুখ খুলে যায়, সাফল্যের সোপান তাদের সকলের একটা বাড়ীর কথায়। একই তোড়ে সে বকে গেল তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে। একসঙ্গে একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়া। সকলেরই স্বাতন্ত্র বজায় রেখে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তোলা। কেউ কারও পথে অন্তরায় হবে না। কিন্তু সকলেরই দরদভরা সহায়তার হস্ত প্রসারিত থাকবে সকলের জন্যে। তার ফলে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবন বিকশিত হওয়ার পথ হয়ে উঠবে প্রশস্ত। এ-সম্বন্ধে তার সনতদার মতামত কি, সনতদা কি বলেন, সনতদা কি চান—সবই একে একে সুনিপুণভাবে বলে যায় বিকাশ।

হঠাৎ অট্টহাস্য করে ওঠেন ধীরেনবাবু।

মুহূর্তে কুঁকড়ে যায় বিকাশ। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ধীরেন-

বাবুর ফুলে ফুলে দমকে দমকে হাসির দিকে। নিজেকে হঠাৎ তার ভীষণ বোকা মনে হতে থাকে।

ধীরেনবাবুর হাসি যেন আর থামতে চায় না। হাসি চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও থেকে থেকে হেসে ওঠেন। অবশেষে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে থাকেন।

তারপর তিনি বিকাশের দিকে ফিরে তাকান, তখন তাঁর মুখে হাসি নেই। চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে আসেন বিকাশের পাশে। তার পিঠে দুটো আদরের চাপড় মেরে বললেন, তুমি বোধহয় কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছ বিকাশ। তোমার ওই সনতদা নিশ্চয়ই পাগল, শুধু পাগল নয় —একেবারে উন্মাদ। ওকে এখনই কাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

বিকাশ প্রতিবাদ করে, সনতদার সম্বন্ধে এসব আপনি কি বলছেন!

ধীরেনবাবু তখন রীতিমত গম্ভীর। ভরা গলায় বললেন, আমি বলছি, ওসব কথা ছাড়। বিয়ে-থা করেছ, দায়িত্ব এখন অনেক বেড়েছে। এখন আর তুমি এ্যান্টনি বাগান লেনের সেই মেসে থাক না বা একজন ছাত্রও নয়। তোমার ওপর কাঁচ একটা মেয়ের জীবনের সমস্ত সুখ, সাধ, আশা নির্ভর করছে। একটু প্র্যাকটিকাল হওয়ার চেষ্টা কর।

তবুও বিকাশ বলবার চেষ্টা করে, একথা আপনি বুঝছেন না কেন ধীরেনদা, আমার একার সামর্থে—

আর কথা এগোতে দেন না ধীরেনবাবু। হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে বলেন, আমি ঠিকই বুঝেছি। সব কিছুর আগে তোমার দরকার একটি চাকরী।

কথাটা বলেই হঠাৎ ধীরেনবাবু চুপ করে যান। কি যেন খানিকটা ভেবে নেন। তারপর বলেন, কাল সকালের দিকে তুমি আমার কারখানায় একবার এস। দেখি, তোমার জন্যে কি ব্যবস্থা করতে পারি।

বিকাশ মিইয়ে-যাওয়া স্বরে প্রশ্ন করে, কখন আসব?

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ধীরেনবাবু বলেন, য়েনি টাইম! ওটা আমার বাসাও বটে। কিন্তু আমি বলি কারখানা। বাসা তো আর ওটা হয়ে উঠতে পারল না।

সবিস্ময়ে বিকাশ প্রশ্ন করল, এখনও বুঝি বিয়ে করেননি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ কুঁচকে ধীরেনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কই আর করে উঠতে পারলাম!

এমন একটা সুখবর শুনেও খুশী হতে পারেননি সুহাসিনী। কি যেন এক ভাবনায় আনমনা থেকে বললেন, একটু ভেবে-চিন্তে দেখ বিকাশ।

—ভেবে আর কি দেখব! ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বিকাশ। ওর মেজাজটাই আজকাল কেমন যেন খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বিকাশ সেই একই সুরে বলে যায়, ভাববারই বা আছে কি! এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল আর কিই বা জুটতে পারে। যা পাওয়া গেছে, সেটাকেই কাজে লাগানো যাক।

ছেলেকে ঘাঁটাতে আজকাল সুহাসিনীও ভয় পান। জানেন, কথাটা আর খানিকটা দূর এগোলেই সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা উঠে পড়বে। তবুও বলেন, কাজটা না হয় তুই নে। কিন্তু বউমা ওখানে নাইবা গেল।

বিকাশ বললে, সে হয় না মা। মায়াকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারব বলেই এ কাজে আমার এতটা আগ্রহ। এ ঘরে থাকলে আর বেশী দিন ও বাঁচবে না।

সুহাসিনী সশঙ্কিত মুখে বলেন, তুইতো সারাদিন কাজে থাকবি। বউমার পক্ষে এতখানি সময় একা থাকা কি ভাল হবে!

—তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি, গভীর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে ওঠে বিকাশ, তুমি তো নড়বেই না এখান থেকে। দেশে যদি তোমরা যেতে, তাহলে তো সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হবে না। আর কবে তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে! ওভাবে ছোড়দির বিয়ে তুমি কবে দেবে মা?

সুহাসিনী মাথা তোলেন না। আঁচলের একদলা কাপড় মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেন। যা তিনি ভয় করছিলেন, অবশেষে তাই-ই ঘটল। সেই বন্দনার কথা উঠে পড়ল।

সজল চোখে মুখ তুলে বললেন, সেই জন্যে তুই আমায় ছেড়ে যাবি!

চমকে ওঠে বিকাশ। রাগ, বিরক্তি, ক্ষোভ, অনেক কিছুই তার মনের

মধ্যে জ'মে উঠেছে। কিন্তু এমন কথা তো তার কখনও মনে হয়নি!

মায়ের আরও কাছ ঘেঁষে এসে বললে, কেন তুমি এমন কথা মনে করছ মা! আমি কি চাইনা, ছোড়দির জীবনটা সুখের হয়। মান, সম্ভ্রম, আত্মমর্যাদা নিয়ে সে আর সকলের মতই মাথা উঁচু ক'রে চলে। কিন্তু তুমি যে ভাবে চাইছ মা, ওভাবে হতে পারে না। তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ কোনদিন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে না। বৃথাই তুমি তাদের দোরে দোরে ধর্ণা দিয়ে বেড়াচ্ছ আর অপমানিত হয়ে ফিরে আসছ।

সুহাসিনী অস্থির হয়ে উঠে বিকাশের মুখে হাত চাপা দিয়ে ব'লে ওঠেন, তুইও আমার মন ভেঙে দিসনি বিকাশ। তোদের মত ক'রে ও-কথা আমি ভাবতে পারি না। তুই কেন বুঝতে পারিস না, আমার মেয়ের পরিচয় হচ্ছে একজন রক্ষিতা! এযে আমার কত বড় ব্যথা, কেমন করে তোকে বোঝাব বল্!

বিকাশের চোখ ফেটে জল আসে। মায়ের একটি হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলে, তুমি আমাকে তাহলে কি করতে বল মা?

সুহাসিনী চোখ মোছেন। বিকাশের মাথায় হাত রেখে বলেন, সেইটাই তো আমি বুঝতে পারছি না বাবা। আমার কাছ থেকে তুই চলে যাবি, কোথায়-না-কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াবি, সেইটাই আমার ভাল লাগছে না।

—কেন মা তোমার ভাল লাগছে না! আব্দারের সুরে বিকাশ বলে, আসল কথা হচ্ছে, তুমি আর আমাকে কাছ ছাড়া করতে চাইছ না। কিন্তু এ তো আর আমি মিলিটারীতে যাচ্ছি না। মনে কর না বিদেশে আমি চাকরী পেয়েছি, আর সেখানেই কোয়ার্টার পেয়েছি। এ বরং তার চেয়েও ভাল, বিদেশে যেতে হবে না। যখনই ইচ্ছে হবে আমরা দু'জনেই তোমার কাছে আসতে পারব। ধীরেনদার সঙ্গে কথা আজ পাকাপাকি করে এসেছি। আমার আর মায়ার জন্যে একটা ঘর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা এক সঙ্গেই করা যাবে। মায়া বলেছে, রান্নাটা সে করতে পারবে। ধীরেনদা বলেছেন খাইখরচ সবটাই তাঁর, অন্যান্য কাজের জন্যে একটা লোকও দেবেন। বেচারার হোটেলে খেয়ে খেয়ে পেটে রোগ জন্মে গেছে। আর মাইনে—ধীরেনদা বলেছেন

উপস্থিত ত্রিশ টাকার বেশী দিতে পারবেন না।

একটু খুশী, একটু স্বস্তির আমেজ লাগে বিকাশের মনে। যদিও অস্বস্তি খানিকটা রয়েই গেছে, যেহেতু এ ব্যবস্থাটাকে পুরোপুরি একটা চাকরী বলে মনে হচ্ছে না। তবুও খুশী জাগছে এই ভেবে যে, অকুল পাথারে একটা খড়ের কুটোও তো পাওয়া গেল!

নিজের মনে যে হিসাবটা সে এর আগে বহুবার কষেছে, সেই হিসাবটা এবার সে সোচ্চারে করে যায়, দুটো লোকের খাওয়া থাকা, তার ওপর ত্রিশ টাকা। তার মানে একশো টাকার কম তো নয়ই।

আরও পরিস্কার করে হিসেব করা যায়। রিলিজের টাকা থেকে এখন প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা। সে জায়গায় এবার থেকে লাগবে, বাড়ীভাড়া বারো টাকা আর মা এবং প্রকাশের খাইখরচ বাবদ ধরে নেওয়া যাক পঞ্চাশ টাকা। তার মধ্যে কুড়ি টাকা সে-ই তো দিতে পারবে তার মাইনের টাকা থেকে। তার মানে এখন রিলিজের টাকা থেকে খরচ হবে মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা।

তার মানে জীবনের মেয়াদ আরও কিছুদিন বেড়ে গেল, তাদের সকলেরই।

হঠাৎ বিকাশ মায়ের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, এসব ছাড়াও তুমি দেখে নিও মা, একমাসের মধ্যেই মায়ার শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

সুহাসিনী সস্নেহে হেসে বললেন, যা ভাল বুঝিস তাই কর বাপু, আমি আর বাধা দেব না।

একটা ছেকরা গাড়ীতে মালপত্তর তুলে দিয়ে মায়ার পাশে এসে বসে বিকাশ বললে, আবার নতুন করে জীবন শুরু হল মায়া। দেখা যাক্, কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

মায়া তার ঘেমে ওঠা হাতখানাতে বিকাশের একটা হাত চেপে ধরে বললে, কটা দিনের জন্যেই বা! আমাদের বাড়ী পাওয়া গেলেই তো সেখানে উঠে যাব। তখন আর কোন ভয় থাকবে না।

ভয়ের কথায় বিকাশ কেমন যেন চমকে ওঠে। মায়ার মুখের দিকে

মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখে, মায়ার রক্তশূন্য মুখেও লেগেছে লালচে ছোপ্। সে রক্তিমতা ঠিক যে কিসের, তা সে বুঝতে পারে না। আর ওই কথা নিয়ে কোন আলোচনা করতেও মন চায় না।

মায়া প্রশ্ন করে, আচ্ছা, তুমি কি আন্দাজ করছ, কতদিনের মধ্যে বাড়ী পাওয়া যাবে?

হতাশার সুর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে বিকাশের মুখ থেকে, বাড়ী কি আর পাওয়া যাবে! সনতদা, নীরদদা, অতীশদা তো হায়রাণ হয়ে গেল।

বেলেঘাটার একটা বড় রাস্তার ওপর বিরাট এক সাইন বোর্ডওয়ালা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল বিকাশের নির্দেশে। দশটা তখনও বাজে নি বলে বাড়ীর সদর দরজা খোলা হয়নি। আর এক তলার জানলাগুলোও সব বন্ধ।

বিকাশ নেমে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ধীরেনবাবু নিজেই। পরণে তার ফিণ-ফিণে পাতলা ধুতি, কাপড়ের নিচে দেখা যাচ্ছে আণ্ডারওয়্যার, গায়ে জালি স্যাণ্ডো গেঞ্জি।

আবার যেন বিকাশ চমকে ওঠে। এমন ঘরোয়া পোষাকে সে ধীরেন-বাবুকে দেখছে, পাঁচ বছর আগে এ্যাণ্টনিবাগান লেনের মেসে বাস করার পর এই প্রথম। তখন তাঁর পরণে থাকত তালি দেওয়া একটা ময়ূরকণ্ঠি রঙের লুঙ্গি, গা'টা খালিই থাকতো। তখন ছিল তাঁর হাড়ের ওপর কোঁচকানো রুক্ষ চামড়া। কাঁধের ওপর দিয়ে কণ্ঠার হাড় প্রকট। সেই ধীরেনদার এমন নধর শরীর দেখে বিকাশ কিছুক্ষণের জন্যে চোখ ফেরাতে পারে না।

মুচকে একটু হেসে, মুখ থেকে পাইপ না নামিয়েই দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললেন ধীরেনবাবু, তাহলে এসে পড়লে বিকাশ। এভ্রিথিং ইজ রেডি ফর্ ইউ। যাও, ভেতর থেকে একটা লোক ডেকে নিয়ে এস।

বিকাশ চলে যায় ভেতরে, অর্থাৎ কারখানায়।

ধীরেনবাবু রোয়াক থেকে নেমে আসেন গাড়ীর সামনে। দরজাটা খুলে ধরে মায়ার দিকে সস্মিত মুখে চেয়ে বলেন, তোমার নাম?

মায়া প্রায় শ্বকিয়ে ওঠা গলায় বলে, মায়া।

ধীরেনবাব্ব পাইপ চেপেধরা দাঁতের ফাঁকে হাসেন অভ্যার্থনার হাসি, আর বলেন, বাঃ বেশ নাম তো! দেখলে সত্যিই মায়া হয়। নেমে এস। বিকাশ আমার ছোটভাইয়ের মত।

কম্পমান পদে মায়া নেমে আসে গাড়ী থেকে।

বিকাশ কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে পেছনে লোক নিয়ে।

ধীরেনবাব্ব হ্বকুম দিলেন, সামান্ সব্ লে যাও দোতল্লাপর—পচ্ছিম্ কামরামে।

একটা হাল্কা বেডিং, ছোট একটা ট্রাঙ্ক, টিনের একটা স্বটকেস আর একটা প্ব'টলি—লোকটি সব কটি জিনিস মাথায়, হাতে, বগলের তলায়. একবারেই নিয়ে নিল। বিকাশ চুকিয়ে দিলে গাড়ীভাড়া।

বাড়ীর ভেতর পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ধীরেন-বাব্ব। মায়াকে কাছে ডেকে বললেন, একট্ব দাঁড়াও তো মায়া।

বিকাশ আর মায়া দাঁড়িয়ে পড়ে।

ধীরেনবাব্ব এগিয়ে এসে মায়ার চোখের কোল টেনে দেখে নিয়ে ছেড়ে দেন। পাইপে দ্বটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন, এ্যাকিউট এ্যানিমিয়া!

বিকাশ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ধীরেনবাব্বর ম্বখের দিকে।

ধীরেনবাব্ব হেসে বললেন, ডাক্তার না হতে পারি বিকাশ, ওষ্বধের কারবার তো করি। চল, ভেতরে যাওয়া যাক্।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ধীরেনবাব্ব বললেন. ভয় পাওয়ার মত কিছ্ব নয় বিকাশ, কিন্তু আর নেগলেক্ট করাও চলে না। উপস্থিত দরকার লিভার এক্সট্র্যাক্টের একটা কোর্স আর গ্বড্ প্রোটীন ডায়েট। তিন মাসে সী উইল্ বি অল্‌রাইট।

দোতলায় উঠেই সামনে এক চওড়া বারান্দা, তারই কোলে তিনটি ঘর। বিকাশের ঘর উত্তর-পশ্চিম কোণে। উত্তরে দ্বটি আর পশ্চিমে দ্বটি বড় বড় জানলা। আর বারান্দার দিকে বিরাট দরজা।

মায়া গিয়ে দাঁড়ায় উত্তরের জানলায়। সেখান থেকে দেখা যায় শিয়ালদার ইয়ার্ড আর তাকে ছাড়িয়ে শিয়ালদা' স্টেশনের সেড। ইয়ার্ডে

অগনন ওয়াগন আর অসংখ্য লাইন। চোখ তুললেই খোলা আকাশ। সোজা চাইলে, যতদূর চোখ যায়, কেবল আকাশ, যে আকাশ দিগন্তে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে!

স্থান, কাল, পাত্র মুহূর্তের জন্যে ভুলে যায় মায়া। আবেগে আর উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে বলে ওঠে, আহ্, কি সুন্দর!

ধীরেনবাবু হেসে বলেন, তাহলে ঘর পছন্দ হয়েছে?

মায়ার কান তখন বধির! ঘরের মধ্যে অত আলো, বাইরে অত আকাশ, মায়াকে কেমন যেন সব কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছিল। সে উত্তরের জানলা থেকে পশ্চিমের জানলায় এসে দাঁড়ায়। যতদূর চোখ যায়, সারি সারি খোলা আর টিনের বাড়ী। এখানেও চোখ কোথাও ধাক্কা খায় না। হুহু করে হাওয়া এসে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। তার সামনে দাঁড়িয়ে মায়া দু'চোখ ভরে দেখছে আকাশ, আর প্রাণভরে টেনে নিচ্ছে খানিকটা বাতাস। দমকা হাওয়ায় কখন যে তার মাথার কাপড় খসে গেছে সে খেয়াল তার নেই।

কিছুক্ষণ বাদে খুশীতে উচ্ছ্বল হয়ে উঠে বিকাশকে ডাকবার জন্যে মুখ ফেরাতেই দেখে ধীরেনবাবু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় মায়া। বিকাশকে সে বলতে চেয়েছিল, 'দেখ, এবার আমি ঠিক সেরে উঠব', কিন্তু সে কথা আর বলা হল না। স্খলিত অবগুণ্ঠন আবার মাথার ওপর তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে পেছিয়ে আসে ঘরের মাঝামাঝি বিকাশের কাছে।

ধীরেনবাবু আবার প্রশ্ন করেন, ঘর পছন্দ হয়েছে তো?

ঘাড় নামিয়ে মাথা হেলিয়ে মায়া স্বীকৃতি জানায়।

বিকাশ হঠাৎ কাজে লেগে যায়। বিছানার কয়েকটা বাঁধন খুলেই তার হাত আপনা হতেই মন্থর হয়ে আসে। তার যা বিছানা, তা ধীরেনবাবুর সামনে খোলা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে, দড়িটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, ধীরেনদা আপনার ঘর কোনটা?

ধীরেনবাবু দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, একখানা ঘর পরে পুবে। তুমি বিবাহিত লোক বিকাশ, তোমার আর আমার

ঘরের মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব থাকাই উচিত। কি বল? এ্যাট্ লিষ্ট আই স্যাড্ প্রেফার সো!

বিকাশ কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ তার মনে হয়, ধীরেনবাবু হৃদয়বান লোক হলেও সনতের জাতের মানুষ নয়।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে হেসে ওঠেন ধীরেনবাবু। ঘর থেকে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে যান। শুধু তাঁর হাসির হাল্কা একটা রেশ পূবের হাওয়ায় দক্ষিণের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঘরের মধ্যে ফুরফুর করে ঢুকে পড়ে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়া বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

বিকাশ সে দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করে। হঠাৎ তার মনে হয়, কাজটা কি সে ভুল করল!

মায়া বললে, সনতদাকে আজ-কালের মধ্যেই একবার আসতে বল।

টালিগঞ্জের প্রাক্তন সৈনিকদের কারিগরী শিক্ষার ক্যাম্পে গণ্ডগোল। ওখানকার শিক্ষানবীশরা গত কয়েকমাস ধরে ভাল শিক্ষা আর তার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। দরখাস্ত, দরবার, আবেদন-নিবেদন করেও যখন কোন ফল হল না, তখন তারা স্বতস্ফূর্তভাবে একদিন ধর্মঘট করে বসল।

এলো লাল পাগড়ি পুলিশ, এলো রাইফেলধারী পুলিশ, আর তার পরে এলেন পুণর্বসতি বিভাগের আই, সি, এস্ বড়কর্তা। ডেকে পাঠালেন শিক্ষানবীশদের। শুনলেন অসীম ধৈর্যসহকারে তাদের অভাব অভি-যোগের কথা। জানিয়ে গেলেন, পরদিনই তিনি তাঁর রায় জানিয়ে দেবেন।

পরদিন নোটিস বোর্ডে বড় কর্তার রায় লটকে দিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেলেন সাহেব সুপারিনটেন্ডেন্ট অনিবার্য কারণে।

শিক্ষানবীশরা বড় কর্তার রায় দেখে একেবারে থ'! ওয়েল্ডিং ডিপার্টমেণ্টটাকেই তুলে দেওয়া হল উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে, আর ওই বিভাগের শিক্ষানবীশদের বিনা মাসোহারায় ছুটি দেওয়া হল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। ওই দিন পর্যন্ত হিসাব করে মাসোহারা

সকলকে দিয়ে দেওয়া হবে, আর যারা যাবে রেলে, তারা পাবে বিনা ভাড়ায় যাওয়ার পাস্। সরকার ওই বিভাগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেই আবার সকলকে খবর দেবে।

প্রচণ্ড এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ক্যাম্পে। সঙ্গে সঙ্গে সকল বিভাগের শিক্ষানবীশরা একযোগে ধর্মঘটে সামিল হল।

কিন্তু, তারপর!

শিক্ষানবীশরা নিজেরাই এক সভা করে স্থির করল, প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের আপিসে গিয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। ঠিক হল পাঁচজন। তখনই তারা রওণা হয়ে গেল প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের আপিসে।

ফণীবাবু আর সনত ধীরে ধীরে সমস্ত শুনলেন। সনত বললে, চলুন ফণীবাবু, ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।

ক্যাম্পের সভায় ফণীবাবু বললেন, আপনাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম শুধু ওয়েল্ডিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষানবীশদের নয়। এ সংগ্রাম আপনাদের প্রত্যেকেরই সংগ্রাম। এমনি করেই শাসকশ্রেণী বিচ্ছিন্নভাবে একটা অংশের ওপর আঘাত হানে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল, গোটা সমষ্টিটাকেই ঘায়েল করা।

প্রাক্তন সৈনিকরা কর্তৃপক্ষের এ কৌশলটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মিলিটারীতে পাঁচ বছর থাকার পর তারা বোঝে কেমন করে ওরা ওদেরই মধ্যে অনৈক্যের বীজ রোপন করে। সাহেব অফিসারের তাঁবেদার কেন হয়ে পড়ে তাদেরই দেশী লোক সুবেদার জমাদারেরা। একদা যারা সিপাই ছিল, তারাই হাবিলদার, নায়েক, ল্যান্স-নায়েক হয়ে কেন পরিণত হয় ওই অফিসারদের পেষণযন্ত্রের এক একটি কলকব্জায়! পরাধীনতার গ্লানি, বৈষম্যের কশাঘাত যেমন ধীরে ধীরে সমস্ত সাধারণ সৈনিককে একটা নিটোল ঐক্যের মধ্যে এনে দিয়েছিল ওই যুদ্ধের ময়দানেও, সেই চেতনা আর অনুভূতি থেকে এখানেও শিক্ষানবীশরা এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়।

ফণীবাবু বলে চলেছেন, আপনাদের এ সংগ্রামকে শুধু আপনাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আর, আই, এন্ বিদ্রোহের সময় যে ভুল আমরা করেছিলাম, সে ভুল যেন আর না করি। আর, আই,

এন্ বিদ্রোহকে আমরা সেদিন ছড়িয়ে দিতে পারিনি সমস্ত সেনাবাহিনী আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে। সারা দেশ জুড়ে যে বিক্ষোভ ছিল, আমরা গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি তার পুরোভাগে। আমরা পরের মুখাপেক্ষি হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ছিল না কোন সংগঠন। আমরা সেদিন ছিলাম সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন।

কাগজে কাগজে শিক্ষানবীশদের একটা করে দল পাঠিয়ে দেওয়া হল। কলকাতায় এবং শহরতলিতে যতগুলো এই ধরণের ট্রেণিং সেন্টার আছে, সেগুলোতে লোক চলে গেল। আর বাকী ছেলেদের একটা অংশ স্থানিয় ক্লাব, লাইব্রেরী আর বিশিষ্ট লোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাদের সংগ্রামের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলু।

তিন দিন ধরে চলল লড়াই। প্রথম দিন সরকার উদাসীন। দ্বিতীয় দিনে সমস্ত ট্রেণিং সেন্টারগুলোয় সাধারণ ধর্মঘট। তৃতীয় দিনে প্রাক্তন সৈনিক সংঘের নেতৃত্বে প্রতিটি সেন্টার থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পুণর্বসতি বিভাগের বড়কর্তার কাছে গণডেপুটেশন।

আই, সি. এস্ বড়কর্তার হয়তো ঘুম ভাঙল। ফণীবাবুকে তিনি অমায়িকভাবে বললেন, এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আপনারা তো দেখছি রীতিমত একটা হট্টগোল শুরু করে দিয়েছেন!

ফণীবাবু বললেন, আমরা তো গণ্ডগোল করার জন্যে পনেরো টাকা মাসোহারায় আপনাদের ওই সেন্টারগুলোতে ঢুকিনি। আমরা চাই যথারীতি শিক্ষা। গোলমাল করার কথা যদি বলেন, সেটাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হত, তাহলে দুটো লাল পাগড়ি পুলিশ বা গোটা চারেক রাইফেল দেখিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা রাখতে পারতেন না। ও রকম রাইফেল আমরাও গত পাঁচ বছর ধরে ছড়ি, লাঠির মত ব্যবহার করে এসেছি। আমি আপনাকে ভালভাবেই জানিয়ে দিচ্ছি, গণ্ডগোল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপনার ওই আদেশ প্রত্যাহার করে একটা সুবন্দোবস্ত করার চেষ্টা করুন।

দোলায়মান চেয়ারে একটা দোল খেয়ে নিয়ে বাঙালী আই, সি, এস্ অফিসার বললেন, আহা-হা, আপনাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই তো ওই

সেণ্টারগুলো খোলা। কিন্তু রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে. ইউ আর নট্ সো কীন্ এ্যাবাউট্ দি ট্রেণিং!

ফণীবাবু মেজাজ হারিয়ে ফেলেন, শিক্ষা নিতে চাই না বলেই বুঝি ভাল যন্ত্রপাতি আর শিক্ষার সুবন্দোবস্তের দাবি করেছি! আপনাদের বোধ শক্তি তো বড় প্রখর দেখছি!

আই, সি, এস্ সাহেব টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কর্তৃত্বের সুরে প্রশ্ন করেন, আপনি কোন সেণ্টারে আছেন?

ফণীবাবুও পাল্টা জবাব দেন, আপনাদের কৃপা দৃষ্টি এখনও এ অভাগার ওপর পড়ে নি। আমি এসেছি প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে।

রুক্ষ কণ্ঠে আই. সি, এস্ মহোদয় বলে ওঠেন, আপনি চলে যেতে পারেন। উই ডু নট্ রেকগনাইজ্ ইওর অর্গানিজেসন্।

সমবেত কণ্ঠে সেণ্টারের প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ করে ওঠে, উনিই আমাদের সকলের মুখপাত্র। ও'র সঙ্গেই আপনাকে কথা কইতে হবে।

আই, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অফিসারের অপূর্ব দক্ষতা! এক মুহূর্তের মধ্যে ঢোঁক গিলে নিলেন। মুখের চেহারা আর হাবভাব নিমেষে বদলে গেল। ঢোঁক গেলার ফলে হয়তো গলাটাও ভিজে গিয়েছিল। ভিজে গলায় বললেন, যাক্, কাজের কথায় আসা যাক্। টালিগঞ্জে ফুল্লি ইকুইপ্ড্ একটা ওয়েল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট এখনই করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বেলুড় সেণ্টার ও ব্যাপারে ওয়েল ইকুইপ্ড্। আই ক্যান্ এ্যাব্সরব্ দেম্ দেয়ার। বলুন, আপনাদের কি বলবার আছে।

ফণীবাবু মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ থেকে বললেন, আমাকে পাঁচ মিনিটের সময় দিন। বাইরে ছেলেরা অপেক্ষা করছে। তাদের সম্মতি নিয়ে এখনই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

মৃদু গুঞ্জন থেকে ধীরে ধীরে কলরব ফেটে পড়ে।

জয়! ছোট্ট একটি জয়!

আনন্দ, উচ্ছ্বাস, আলিঙ্গন! তিন শো ছেলের জমায়েৎ থেকে ধ্বনি ওঠে, প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘ জিন্দাবাদ।

নয়

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখে সনতের দেখা হয়ে গেল ধীরেন বাবুর সঙ্গে। পূর্ব পরিচয়ের অভাবে, সনত কোন কথা না বলে ওপরে উঠতে লাগল।

মুখোমুখি হতেই. ভ্রূ কুঁচকে ধীরেনবাবু প্রশ্ন করলেন, কাকে চান ?

সনত বলল, বিকাশকে।

—বিকাশের সঙ্গে এখন দেখা হবে না, সে আপিসে আছে।

সনত বললে, বিকাশের স্ত্রী তো আছেন, ততক্ষণ না হয় তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যাবে। তিনিও আমার বিশেষ পরিচিত।

কুৎসিত এক হাসিতে ধীরেনবাবুর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে। শ্লেষভরা সুরে বলেন. স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরস্ত্রীর সঙ্গে বসে গাল-গল্প করাটা কি খুব শোভনীয় কাজ!

রাগে সমস্ত শরীরটা রীরী করে ওঠে সনতের। তবুও সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে. আপনিই কি বিকাশের ধীরেনদা ?

কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে যান ধীরেনবাবু। কাঁধ কুঁচকে বলেন. বিকাশ তো আমাকে তাই বলে।

সনত হেসে ওঠে। ধীরেনবাবুর স্বরের অনুকরণ করে বলে, আমিও বিকাশের সনতদা। হয়তো আমার কথা শুনে থাকবেন ওদের কাছে।

—তা আর শুনিনি! ব্যঙ্গের অভিব্যক্তিতে ধীরেনবাবুর মুখখানা বিচিত্র হয়ে ওঠে। বলেন, আপনিই তো বিকাশকে বেশ বড় গোছের একটা বাড়ীর খোঁজে লাগিয়েছিলেন।

সনত সকৌতুকে প্রশ্ন করে, সে কথাও বিকাশ আপনাকে বলেছে!

—বলেছে বৈকি। আর বলেছিল বলেই এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল। যাক্, মাপ করবেন. না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি। যান, ওপরে যান। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকের ঘরটা। মায়া ঘরেই আছে।

বাকী সিঁড়িক'টা তর্‌তর্ করে নেমে গেলেন ধীরেনবাবু।

হতভম্ব হয়ে সনত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ধীরেনবাবুর অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে। তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলে, কাঁধ কুঁচকে সে ওপরে উঠতে লাগল ধীর মন্থর গতিতে।

একবার, দু'বার, তিনবার টোকা মারার পর দরজা খুলে গেল। ফ্যাকাশে মুখে মায়া সামনে দাঁড়িয়ে। সনতকে দেখে সে যেন ভয়ানক চমকে ওঠে, সনতদা, তুমি!

সনত মায়ার বিবর্ণ মুখখানার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, কি হয়েছে বল তো?

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয় মায়া। স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে চোখে মুখে। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, ভেতরে এস।

সনত গিয়ে বসল মেঝেয় পাতা বিছানাটার ওপর।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মায়া কিছুক্ষণের জন্যে অনাবশ্যক খানিকটা ঘোরাঘুরি করল ঘরের মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ায় উত্তরের জানলায়। সামনে রেলের ইয়ার্ড, অগনন ওয়াগন আর অসংখ্য লাইন। আর চোখ তুললেই আকাশ, যতদূর চোখ যায়, কেবল আকাশ। যে আকাশ দিগন্তে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

সনত তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে মায়ার ওপর। তার ব্যবহারটা ঠিক যেন বুঝতে পারছে না!

অনেকদিন বাদে মায়াকে দেখছে সনত। নীরদের বাড়ীর সেই পিক্‌নিকের পর এই প্রথম। শরীরটা যেন তার একটু সেরেছে বলে মনে হচ্ছে। কাগজের মত সাদা মুখখানায় লেগেছে একটু লালচে আভা। শুষ্ক শীর্ণ শরীরটায় যেন একটু সজীবতার আভাষ দিচ্ছে।

হঠাৎ সনতের মনে পড়ে যায় ধীরেনবাবুর কথা। ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম আলাপটা হল কেমন বিশ্রীভাবে। ভদ্রলোক মায়ার সঙ্গে পরিচয়ের কথায় অমন কুৎসিত ইঙ্গিতই বা করলেন কেন! আর মায়াই বা কেন দরজা খোলার সময় অমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল! তাহলে সে কি অন্য কাকেও সন্দেহ করে অমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল!

বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছে মায়া।

অনেক ভাবনা অনেক উদ্বেগ নিয়ে ছুটে এসেছিল সনত বেলেঘাটায়। বিকাশ বড় ছেলেমানুষ আর আবেগপ্রবণ। ধীরেনবাবুর

কাছে কাজটা নেওয়ার দিনকয়েক পরে যখন তাকে সমস্ত কথা জানিয়েছিল, তখন তার ওই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস কেমন যেন ভাল লাগে নি।

তারপর আসব-আসব করেও আসা হয়ে ওঠে নি। নানান ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে গত কয়েক দিন সে যেন নাকানি-চোবানি খাচ্ছিল। মাত্র দিন দুই মিটেছে টালিগঞ্জ ট্রেণিং সেণ্টারের ব্যাপারটা।

কিন্তু আজ দুপুরে এমন করে ছুটে আসার কারণ কমলা। কমলা এদের কথা কিছুই বলেনি। তবুও কমলার সান্নিধ্য, তার উচ্ছ্বলতা, তার নতুন জীবনবেদ—এদের কথা বড় বেশী করে মনে পড়িয়ে দেয়। এরা যেন তাদের জীবনের এক একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ কমলা এসে হাজির হয় মতিশীল স্ট্রীটের ওই ঘরে।

সনত তো প্রথমটা চমকেই উঠেছিল।

কমলা ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে বলেছিল, তোমার সেই মাষ্টারমশাই-মাষ্টারমশাই ভাব আজও গেল না!

সনত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন?

—কেন কি! তোমার মুখে চোখে সেই ভাবটাই যেন ফুটে উঠেছে যে, আমি খুবই একটা ছেলেমানুষি করেছি এখানে এসে, যেটা তুমি আদৌ পছন্দ করছ না।

সনত হেসে ওঠে। বলে, অনেকখানি তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু সবটা ঠিক হয়নি। অপছন্দ আমি মোটেই করিনি। বরং খুশীই হয়েছি। কিন্তু তোমার জন্যে খানিকটা ভয়ও না পেয়ে পারিনি। জানই তো, এ পাড়াটা সন্ধ্যের পর মোটেই নিরাপদ নয়, বিশেষ করে এই বাড়ীটা।

কমলার মনটা ছিল অত্যন্ত খুশীভরা। বলে, বেশ তো, তাহলে এখানে না থেকে, চল না এর চেয়ে নিরাপদ কোন জায়গায় খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

সনত এবার কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে। বলে ওঠে, আবার তুমি কথার মধ্যে হুল্ ব্যবহার করছ!

কমলা সনতের একটা হাত ধরে মিনতি করে, আচ্ছা, আর খোঁচা

দেব না। রাগ কর না লক্ষ্মীটি। কি মনে করে ছুটে এসেছি জান? তোমার সংগে অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা এসে পড়ে কার্জন পার্কের মধ্যে। মাঠের ওপর বসে দুজনে গল্প জুড়ে দেয়।

কমলা বলতে থাকে, বুঝলে, চারকরীটা বোধহয় মাসখানেকের মধ্যেই পেয়ে যাব। আর বাড়ীর খোঁজও করছি খুব জোরসে। বেশ আছি। চাকরীর কথা ভাবলেও তোমার কথা এসে পড়ে, বাড়ীর কথা ভাবতে গেলেও, সেই তুমি। আমার সকল ভাবনায়, সকল কাজে তোমার চিন্তা — এ যেন সেই পুরাকালের কোন এক নায়িকার অবস্থা!

সনত বলে ওঠে, আধুনিক কালে বুঝি একজনকে নিয়ে অতখানি ভাবনা চিন্তা চলে না? এখন বুঝি কেবল ডিনার টেবিলে দু'চারবার 'মাই ডার্লিং' বললেই ভালবাসার সবখানিই প্রকাশ করা হয়ে যায়?

কমলা তির্যক ভঙ্গিতে সনতের দিকে চায়। শাসানীর ভঙ্গিতে বলে, আবার ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ তো!

—না না, ঠিক তা নয়। সত্যিই আমি জানতে চাইছিলাম। দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি হচ্ছি পুরাকালের লোক। পাঁচটা বছর মিলিটারীতে কাটিয়ে এসে আমার অবস্থাটা হয়েছে রিপ্ ভ্যান্ উইংকলের মত। দেখছি, সমস্ত দুনিয়াটা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেছে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে কমলা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে ওঠে, চল, এর চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরে বেড়াই। এ জায়গাটা তোমার মতিশীল স্ট্রীটের চেয়ে মোটেই নিরাপদ নয়।

গবর্নর হাউসের দক্ষিণ ফুটপাথের ওপর দিয়ে নীরবে ওরা কিছুক্ষণ পথ চলে। নির্জন রাস্তা, আলো ঝলমলে নয়, বরং নিষ্প্রভ আলো-গুলো অন্ধকারটাকে কেমন যেন মোহময় করে তোলে। কখন যেন সনত কমলার একটা হাত ধরেছে। গতি ওদের মন্থর হয়ে এসেছে।

কাউন্সিল হাউসের সামনাসামনি এসে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামতে গিয়ে কমলা অনুভব করতে পারে, সনত তার হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরেছে।

কমলা পাশ ফিরে তাকায়।

সনত শুধু বলে ওঠে, কমল—

মায়ার সেই বিবর্ণ মুখ আর এখনকার এই অস্বস্তি দেখে সনতের বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে কমলার কথা। কমলা এ যুগের মানুষ—সে সমাজ-সচেতন এবং আত্মসচেতন উভয়ই। আর মায়া এ যুগে জন্মালেও, এই যুগকে আয়ত্ত করতে পারেনি।

একটা বিড়ি ধরালো সনত। দেশলাই জ্বালার শব্দে চমকে উঠে মায়া পেছন ফিরে চাইল।

সনত ডাকলো, এখানে এসে বস মায়া।

হঠাৎ ছুটে এসে মায়া সনতের হাঁটুটা চেপে ধরে কেঁদে উঠল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল সনতদা, আমাকে বাঁচাও।

জ্বলন্ত বিড়িটা সনতের হাত থেকে পড়ে যায়। বিছানার ওপর থেকে সেটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে সনত মায়ার হাতের ওপর একটা হাত রাখল। নাঃ, এখনও হাড়টাই আগে ঠেকছে হাতে। মুখের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে কাগজের মত সাদা সেই মুখ! বিকাশ বলেছিল, ধীরেনবাবু নাকি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। সে সব কই! উপরন্তু মায়ার এ অবস্থা কেন!

সনত প্রশ্ন করল, কেন বলতো?

মায়া মুখ তুলে চায়। ঠোঁট দুটো তার থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে, থেকে থেকে কুঁকড়ে উঠছে। চোখ দুটো ভরে উঠেছে জলে।

সনত আবার বলল, কেন মায়া, তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে এখানে?

মাথা নিচু করে মায়া বলে, যতক্ষণ ও না থাকে, সারাক্ষণ আমাকে বড় ভয়ে ভয়ে কাটাতে হয় সনতদা। এ ভাবে আমি এখানে থাকতে চাই না।

সনতের মনে পড়ে যায় ধীরেনবাবুর কথাগুলো আর মায়ার বিবর্ণ মুখখানা।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে মায়া, আমার জন্যে বাঁচার মত জায়গা কি এই দুনিয়ায় কোথাও নেই!

সনত আঁতকে ওঠে। অনীতার বুকে মুখ লুকিয়ে মায়ার সেই ফেটে-পড়া কান্না যেন বেজে ওঠে তার কানে। সেই কথা, সেই সুর, সেই ভয়!

স্বগতোক্তির মত বলে যায় সনত, ওইটাই আজকে আমাদের মত মানুষদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে মায়া। বাঁচতে আমরা সকলেই চাই, কিন্তু তার মত ব্যবস্থা কোথাও নেই। যাদের হাতে রয়েছে সে দায়িত্ব, তারা তা পালন করছে না। কিন্তু আশার কথা তোমায় শোনাতে পারি মায়া, আমরা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না থেকে, ভাগ্যকে গড়ে নেওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি। তোমাকেও আজ সামিল হতে হবে আমাদের সেই দলে।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে মায়া সনতের থমথমে মুখখানার দিকে। চোখের জল হঠাৎ তার শুকিয়ে গেছে। কেবল একটি ফোঁটা মুক্তোর মত টল্‌টল্‌ করছে চোখের কোলে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সনতের মুখের পানে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে ওঠে, তোমার কথা যে বুঝতে পারলাম না সনতদা।

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে সনতের মুখে। ধীরে ধীরে বলে, হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি নি সব কথা, তোমাকে বোঝাবো কেমন করে! কিন্তু ওই কথাটাই আমার বার বার মনে হচ্ছে। আলাদা আলাদা ভাবে আমরা কেউ বাঁচতে পারব না মায়া। বাঁচার প্রশ্নে আমাদের সকলকে এক সারিতে দাঁড়াতেই হবে। কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়ালে আমরা এক হতে পারব, সেইটাই আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি।

হঠাৎ চুপ করে যায় সনত। বুঝতে পারে, তার আবেগ আর উচ্ছ্বাস দিয়ে মায়ার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তার সমস্যা কোন ভাবের সমস্যা নয়। তার সমস্যা রূঢ় বাস্তবকে নিয়ে,রান্না, খাওয়া, শোওয়া, বসা, সম্পর্ক আর ব্যবহারের সমস্যা!

ক্ষণেক চুপ করে থেকে সনত প্রশ্ন করে, সমস্ত কথা খুলে বল মায়া।

মায়া জবাব দেয়, আমি আর এখানে একদিনও থাকতে চাই না।

—কেন?

মায়া বলে, ওই ধীরেনবাবু লোকটাকে আমার বড় ভয় করে।

—কিসের ভয়!

আরক্ত মুখে মায়া বলে ওঠে, কেন তুমি বুঝতে পারছ না সনতদা!

এইবার যেন সব বুঝতে পারছে সনত। ধীরেনবাবুর কথার শ্লেষ, বিবর্ণ মুখে মায়ার দরজা খুলে দেওয়া, তাকে দেখে বিস্ময়, এখান থেকে এখনই চলে যাওয়ার সঙ্কল্প—এ সবের মধ্যে যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে!

সনত প্রশ্ন করল, বিকাশকে বলেছ?

মায়া বললে, ওকে যে কিছুতেই বলতে পারছি না সনতদা। ও যেন এক নেশার ঘোরে আছে। এই কারখানার ওপর ওর কি মায়া! কত আশার স্বপ্নই না দেখছে। আমি যে দুবেলা খেতে পাচ্ছি আর ভাল একটা ঘরে থাকতে পেয়েছি, এতেই ও এত খুশী যে, অন্য কোন কথা বোধহয় ওর মনের ধারে কাছেও আসে না। কেমন করে আমি এক কথায় ওর এত সাধের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেব সনতদা!

আবার সনত প্রশ্ন করে, বিকাশ কি কিছু আন্দাজও করতে পারেনি?

—কেমন করে করবে! ওর মাথায় কাজ আর কারখানা ছাড়া বোধহয় আর কিছুই ঢুকতে পারে না। আমার সঙ্গে ওর কথা কেবল ওই কারখানা নিয়েই হয়। বোধহয় ও আমার মুখের দিকেও চেয়ে দেখে না। ওকে নাকি আর কিছুদিনের মধ্যে পার্টনার করে নেবে ওই ধীরেনবাবু।

গুম্ হয়ে থাকে সনত। আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে। আবার সেই আবেগ আর উচ্ছ্বাস! জীবনের প্রতিষ্ঠা! ঘর! অর্থ আর শ্রম! অকস্মাৎ ভেসে ওঠে রফিকের মুখখানা একেবারে তার চোখের সামনে। রফিক তার বৌয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। তবু তাকে নিয়েই সে ঘর করছে! দারওয়ানীর কাজ নিয়েছে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবে বলে! কিন্তু যে ঘর তার ভেঙে গেছে, যে আশা তার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, যে স্বপ্ন তার চুরমার হয়ে গেছে—সেই ভাঙা, ক্লিন্ন, ক্লিষ্ট, মূলধন নিয়ে সে কোন জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবে!

বিকাশের সঙ্গে যখন সনতের দেখা হল, তখন রাত প্রায় আটটা।

সনত বলল. চল বিকাশ একটু বাইরে যাই। তোমার সঙ্গে কতকগুলো কথা আছে।

বিস্মিত বিকাশ একরাশ প্রশ্ন করে, কথা! আমার সঙ্গে! তার জন্যে বাইরে কেন!

হেসে সনত বললে, চল না , না হয় একটু বেড়িয়েই আসবে, আর আমাকেও খানিকটা এগিয়ে দেওয়া হবে। সেই তো সকাল দশটায় কাজে লেগেছ, আর এখন প্রায় অর্ধেক রাত. একটু বিশ্রামও নাও নি।

খুশীতে বিকাশ হেসে ওঠে. ঠিকই তো, বোধহয় দশঘণ্টা একটানা খেটে গেছি সনতদা। কি ভাল যে লাগে ওই কাজ করতে! ভাগ্যে তুমি বললে, তাই তো মনে পড়ল, এতক্ষণ ধরে খেটেছি। আমার তো মনে হচ্ছিল. কতক্ষণই বা আর আপিসে গেছি।

মায়ার কথাটা মনে পড়ে যায় সনতের। সত্যিই তো বিকাশ এক নেশার ঘোরে আছে!

বাইরে বেরিয়ে বস্তির মুখে নির্জন এক চায়ের দোকানে গিয়ে বসল সনত আর বিকাশ। দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সনত বিকাশকে বলল, মায়াতো তেমন সারেনি বিকাশ। তুমি বলেছিলে. ধীরেনবাবু ওর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করবেন।

কেমন যেন চমকে ওঠে বিকাশ। তাই তো! এ কথাটা তো তার বহুদিন মনে পড়ে নি। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, অচ্ছা. কালই আমি ধীরেনদাকে মনে করিয়ে দেব। বুঝলে না, নানান কাজের লোক. হয়তো ভুলেই গেছেন। আর আমারও হয়েছে এমন. সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে আর কি ছাই কিছু মনে থাকে।

সনত প্রশ্ন করল, তা এত খাটছই বা কেন তুমি?

–খাটছি? খাটছি প্রাণের দায়ে সনতদা। থাকা খাওয়া ছাড়া মাত্র. ত্রিশটা টাকায় কি হবে! মাকে কুড়ি টাকা দিয়েছি এই মাইনে থেকে আ। রিলিফের টাকা থেকে দিয়েছি ত্রিশ টাকা। মাকে বলেছি, ওই পঞ্চাশ টাকার মধ্যেই চালিয়ে নিতে হবে। প্রকাশের কাজ কর্ম তো কিছুই হল না এখনও। এইভাবে রেগুলার মাসে মাসে খরচ হবে

গেলে বিলিজের ওই টাকা কটা আর কতদিন থাকবে বলতো!

একটু চুপ করে থাকে বিকাশ। তারপর আবার তার উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে, সনতদা, এরই মধ্যে এ কারখানার সমস্ত কাজই প্রায় আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ধীরেনদা। এর মধ্যে একদিন কথাচ্ছলে বলে-ছিলেন, এ কারবারটা যদি আমি ভাল করে বুঝে নিতে পারি, তাহলে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার করে নিয়ে আমারই হাতে সমস্ত ছেড়ে দেবেন।

সনত নিরস কণ্ঠে বাধা দেয়, সে তো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এখনকার ব্যবস্থা কি হবে।

—বলেছি তো ধীরেনদাকে এ-মাসে আরও গোটা কুড়ি টাকা বেশী দেওয়ার জন্যে। মনে তো হচ্ছে, দেবেন বোধহয়।

বিকাশের মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নেয় সনত। নীরবে পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে যায় চায়ের কাপে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিকাশ বলে ওঠে, মনে তো হচ্ছে, এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম! বড় ভয়ে ভয়ে এখানে এসেছিলাম সনতদা।

চোখটা বারেক তুলে বিকাশের প্রশান্ত মুখখানা দেখে নিয়ে সনত আবার চোখ নামিয়ে নেয়। আঘাত করতে হবে বিকাশকে! প্রচণ্ড রূঢ় আঘাত! তার মুখের একটি কথায় বিকাশের এত খুশী, এই আশ্বাস এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে!

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সনত কনুই দুটো টেবিলের ওপর রেখে সামনের দিকে একটু এগিয়ে বসল। গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে উঠছে। গলা ঝেড়ে সনত বলল, তোমার এ চাকরী তুমি চালিয়ে যেতে পার বিকাশ, কিন্তু তোমাকে কালই এখানকার বাসা উঠিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হবে পাথুরেঘাটায়।

আঁতকে উঠে বিকাশ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, কেন সনতদা?

—কারণ, এখানে থেকে তোমার মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে না বিকাশ।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায় বিকাশের, কপালের ওপর কয়েকটি রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আকুল হয়ে বলে, তোমার কথা যে বুঝতে পারলাম না।

সনতের মুখখানা থমথম্ করছে। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে ধরায় চোয়ালের পেশীগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এ দায়িত্ব তোমারই বিকাশ, যাতে তোমার চাকরীর জন্যে মায়ার কোন অমর্যাদা না হয়, মায়াকে কোন খেসারৎ না দিতে হয়।

বিকাশের বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে উঠে আসে তার কপালে। আস্তে আস্তে সেই হাতে কপালটা ঘষতে থাকে। কখন যেন চলে যায় হাতটা মাথার একরাশ চুলের মধ্যে। ধীরে ধীরে প্রবল এক মুষ্টি চেপে ধরে একগুচ্ছ চুল। যন্ত্রণার গোঙানি বেরিয়ে আসে বিকাশের মুখ থেকে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সনত বিকাশের পড়ে-থাকা হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। আর্দ্রকণ্ঠে ডাকে, বিকাশ!

বিকাশ সাড়া দেয়. উঁ!

—বিকাশ! বিকাশ! বিকাশ!

সাড়া ফিরে আসে বিকাশের। দুটি হাত জড় করে কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা চায়, আমাকে একটু বিষ দাও সনতদা!

সনত হেসে ওঠে, সে হাসি কান্নার মত দেখায়। বিকাশের হাত দুটি চেপে ধরে বলে, আমার কাছে তো বিষ নেই বিকাশ। আমার আছে বুকভরা ভালবাসা, অফুরন্ত স্নেহ আর অক্লান্ত সংগ্রাম করার সামর্থ। তাই যদি চাও, তোমাদের জন্যে তা আমি উজাড় করে দিতে পারি।

হাত দুটিয়ে নিয়ে তার মধ্যে মাথা গুঁজে বিকাশ ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

দোকানের ছোকরা বয়টা হতভম্ব হয়ে বিকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সনত অর্ডার দেয় আরও এক কাপ করে চা দিতে।

মুচকে হেসে ছোকরা চলে যায়।

ক্যাশ বাক্সের সামনে বসা দোকানের মালিক হাঁক পাড়ে, কিরে ভোঁদা, ওদিকে হল কি?

দুটি কাপে চায়ের লিকার ঢালতে ঢালতে ভোঁদা বলে, কি আর হবে বাবু, টেনেছে! এখন বোধহয় প্রাণে কষ্ট হচ্ছে!

ঢালাও হুকুম দেন দোকানের মালিক, দেখিস, যেন বমি-টমি না করে।

মৃদু হাসিতে সনতের ঠোঁট কুঁকড়ে ওঠে। জীবনের সরাপ্ গলাধঃকরণ করে নিপীড়িত মানুষ এমনি করেই বুঝি মাতলামো করে বেড়াচ্ছে! তাই তারা কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে! কখনও লড়ছে অমিত বিক্রমে. কখনও পেছিয়ে যাচ্ছে নাগালের বাইরে! কিন্তু জীবনের নেশা কখনও তো ছুটে যাচ্ছে না!

সেইদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিকাশ গিয়ে ঢুকল ধীরেনবাবুর ঘরে।

বিছানার ওপর শুয়ে মাথার কাছে ঘষা কাঁচের বাল্ব জেবলে ধীরেনবাবু বই পড়ছিলেন। বিকাশকে দেখে বইটা নামিয়ে বললেন, কি চাই বিকাশ?

চেয়ার একখানা খাটের পাশে থাকা সত্ত্বেও বিকাশ দাঁড়িয়ে থেকে বললে, কালকের দিনটা আমার ছুটি চাই।

—কেন!

—কালকে বাসা বদল করব কিনা।

—বাসা বদল!

—হ্যাঁ ধীরেনদা, কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব পাথুরেঘাটায়।

বিছানার ওপর উঠে বসেন ধীরেনবাবু. ওহ্ আই সী! তা আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করার দরকারও বোধ করলে না!

বিকাশের পা দুটো কাঁপছে। হাত দুটো মুঠো করে বললে, না।

হাঁটু মুড়ে বসে কোলের ওপর বালিশটা তুলে নিয়ে ধীরেনবাবু বললেন, বস বিকাশ, তুমি বোধহয় একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। লেট্‌স্ হ্যাভ এ হার্ট-টু-হার্ট টক্।

দুটো কনুই বালিশের ওপর রেখে সামনের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন, কারণটা জানতে পারি কি?

কারণ আপনিই। আপনার ব্যবহারের জন্যে মায়া এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে চায় না।

ধীরেনবাবুর কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বের আমেজ লাগে। গম্ভীর গলায়

বলেন, আমি মায়ার কথা জানতে চাইনি। আমি জানতে চেয়েছি তোমার কথা।

থতমত খেয়ে যায় বিকাশ, আমতা আমতা করে বলে, এক্ষেত্রে আমার আবার আলাদা কথা কি! মায়ার কথাই আমার কথা।

—জানো বিকাশ, ঠিক এই কারণেই আমি আজও বিয়ে করিনি। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও লাইফ'স্ পার্টনার হয়ে উঠতে পারে না। কেমন যেন লতানে গাছের মত পুরুষ মানুষকে জড়িয়ে জড়িয়ে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলে। যার ওপর নির্ভর করে তার জীবন, তাকেই দেয় পঙ্গু করে। মান্ধাতার আমলের কতকগুলো ধ্যান-ধারণা তাদের মনকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, ব্যাপক জীবনকে তারা চোখেই দেখতে পায় না। এই জন্যেই আমি বিয়ে করিনি বিকাশ। তুমি বোধ-হয় আজও বুঝতে পারনি যে, আমার এ-কারবার হচ্ছে জাল ওষুধের। বিয়ে যদি করতাম, আমার স্ত্রীই হয়তো দিনরাত প্যানপ্যান করত ওই জাল ওষুধ তৈরী করা নিয়ে। আর সেই স্ত্রীর কথা যদি আমি শুনতাম, তাহলে ওই এ্যান্টনিবাগান লেনের মেস থেকে আমাকে আর কোনদিন বেরিয়ে আসতে হত না।

বিকাশ বিমূঢ় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ধীরেনবাবুর মুখের দিকে। ভয়ে পাণ্ডুর মুখ দিয়ে তার চাপা আর্তনাদের মত বেরিয়ে পড়ে, এটা জাল ওষুধের কারখানা!

ধীরেনবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন, ওসব মেয়েলী ন্যাকামো ছাড়। দেখো, যেন আবার মূর্চ্ছা যেও না।

বিকাশ হাতড়ে হাতড়ে চেয়ারটাকে ধরে ফেলে।

ক্ষণেক চুপ করে থেকে ধীরেনবাবু আবার সুরু করেন, সেই জন্যেই আমি তোমার কথা জানতে চাইছি বিকাশ। মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখ। তোমার সামনে একটা ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে। তোমার জীবনটা একটা মানুষের মত হয়ে ওঠার সমস্ত সুযোগ তোমার হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। আমি তোমাকে কথা দিয়েছি, এ-কারবারে তোমাকে পার্টনার করে নেব। এ-সমস্ত কথা তুমিই ভাবতে পার, মায়া পারে না।

মাথাটা যেন অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে বিকাশের। কেমন যেন

টলছে সমস্ত শরীরটা।' এ্যান্টনিবাগান লেনের মেসে 'ধীরেনবাবুর চেহারাটা তার চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে—আর তারই পাশাপাশি ধীরেনবাবুর এখনকার রূপ—এই-ই তো তারও ভবিষ্যৎ। প্রায় মাস-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে, এ কারবারে অন্তত হাজারখানেক টাকা লাভ আসে প্রতি মাসে। ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে সিকি অংশীদার হলেও মাসে আড়াইশো টাকা!

একটা হাত তুলে বিকাশ কপালটা ঘষতে থাকে। চোখ তুলে তাকাতে চায় ধীরেনবাবুর মুখের দিকে। কেমন হয়ে উঠেছে সে-মুখখানা, একবার দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কি এক অজানিত ভয়ে চোখ তুলতে পারে না।

সন্তের কথাটা বিকাশের কানের গোড়ায় যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'এখানে তোমার মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে না বিকাশ।'

ঝট্ করে মাথা তুলে বিকাশ বলে ওঠে প্রবল উচ্ছ্বাসে, কিন্তু আমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা বিলিয়ে দিয়ে আপনার মত ভবিষ্যৎ আমি গড়ে তুলতে চাই না।

—মনুষ্যত্ব! মর্যাদা! শ্লেষের হাসিতে ঠোঁটটা মুচড়ে যায় ধীরেনবাবুর। চোখদুটো কুঁচকে সামনের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলে ওঠেন, বিয়ে করেছ, বৌকে খেতে দিতে পার না, পরতে দিতে পার না, একদিন আনন্দের মুখ দেখাতে পার না—তবুও কি তুমি বলতে চাও তার মর্যাদা তুমি রক্ষা করে চলেছ! এ্যাকিউট এ্যানিমিয়ায় ভুগছে, তোমার ওই পাথুরেঘাটার বাসায় ফিরে গেলে, আর তিন মাসের মধ্যে নির্ঘাত টি, বি। তখন হয় টান মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসবে, না-হয় বিনা চিকিৎসায় তাকে তিলে তিলে মেরে ফেলবে। তুমি কি মনে কর, স্ত্রীর মর্যাদা, স্বামী হিসেবে তোমার নিজের মর্যাদা, কোনটাই তুমি যথোচিতভাবে রক্ষা করছো?

বিকাশের সমস্ত শরীরটা কয়েকবার শিউরে ওঠে। হয়তো এমনই একটা পরিণতির কথা দূরের আভাষের মত তার মনের মধ্যে সব সময়েই আনাগোনা করেছে। সেই পরিণতিকে ঠেকাবে বলে সে ধীরেনবাবুকে যাচাই করেনি, তাঁর কারবারের ধরণধারণ নিয়ে মাথা ঘামায়নি, মায়ের

আশংকায় কর্ণপাত করেনি। মায়াকে নিয়ে ছুটে এসেছিল এখানে, মায়াকে বাঁচিয়ে তুলবে বলে।

,কিন্তু ধীরেনবাবুর কথায় বিকাশ আঁতকে ওঠে। সে পরিণতি যে এত কাছে, সে-কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। ভেবেছিল, সময় আছে, তার মধ্যে হয়তো কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারবে। তাদের পরিকল্পনার বাড়ী যেদিন পাওয়া যাবে, সেদিন সে শক্ত মানুষের মত সেখানে গিয়ে উঠতে পারবে। তার শক্তি যাবে অনেক বেড়ে। মায়া সেরে উঠবে, জীবন ফিরে আসবে, আবার সে ফিরে পাবে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি।

কিন্তু ধীরেনবাবু কি বলতে চান?

ধীরে ধীরে বিকাশ যেন বুঝতে পারছে তাঁর প্রস্তাব। তাহলে মায়ার সংগে ধীরেনবাবুর ব্যবহার কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বা কোন একটা মুহূর্তের দুর্বলতা নয়! তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যে নেই কোন অনুশোচনা! তিনি এটাকে তাঁর অধিকারের এক্তিয়ারভুক্ত বলেই মনে করছেন!

অসহনীয় উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে বিকাশ, তার মানে আপনি বলতে চান, আমার স্ত্রীর বিনিময়ে আপনি আমাকে আপনার কারবারের পার্টনার করে নেবেন?

রুক্ষ কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠেন ধীরেনবাবু, চেঁচিও না বিকাশ। এত রাত্রে আমার বাড়ীতে বসে ইতরের মত চেঁচামেচি করা চলে না। পাড়ায় আমার একটা খাতির আছে।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ায় বিকাশ।

সঙ্গে সংগে চাপা গলায় কর্তৃত্বের সুরে গর্জে ওঠেন ধীরেনবাবু, বিকাশ!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকাশ। যাকে একবার সে উর্ধ্বতন বলে মেনে নিয়েছে, তার প্রতি কায়িক আনুগত্যবোধের দুর্বলতা মিলিটারী থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মাত্র এই কয়েকটা মাসে কেটে যাওয়ার কথা নয়।

ধীরেনবাবুর সহৃদয় কণ্ঠস্বর তার পিঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে, ভুলে যেও না বিকাশ, তুমি আমারই একজন কর্মচারী। আমার মন

জড়িয়ে চলতে পারলে জীবনে তোমার অনেক উন্নতি হতে পারতো। আর একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার করে বলি। করুণা আমি শুধু শুধু কাকেও দেখাই না। আমাকেও কেউ একতিল করুণা দেখায়নি। তোমাকে এখানে এভাবে আনার উদ্দেশ্য নিছক পরোপকার করার জন্যে নয় বিকাশ। বিয়ে করতে আমি সাহস পাই না, জানি বিবাহিত জীবন আমার সুখের হবে না। যে-উপায়ে আমি পয়সা করেছি, আর আজও করছি, তাতে জেল, ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু তার মানে এও নয় যে, আমি ঘরোয়া একটা জীবন চাই না। তাই মনে করেছিলাম ধীরে ধীরে জাল ওষুধের কারবারটাকে সত্যিকারের ওষুধের কারবারে ট্রান্সফর্ম করে, তোমাকে তার হাফ্-পার্টনার করে নিয়ে তোমার একটা স্থিতি করে দেব। জাল জুয়াচুরি, জেল, ফাঁসির কোন ঝুঁকি তোমার ক্ষেত্রে থাকবে না। ইন্ রিটার্ন, তুমি মায়াকে নিয়ে এইভাবেই আমার কাছে থাকবে। আঁতকে উঠো না বিকাশ! জীবন মানুষের কাছে বড় প্রিয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে তোমার মত মর্যাদা আর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান-ওয়ালা বহু স্বামী রাস্তা থেকে মিলিটারী ধরে নিয়ে গেছে বাড়ীতে। কিসের বিনিময়ে! দু' পাঁচ টাকা। ডেফিনিটলি মাই এ্যারেঞ্জ-মেণ্ট ইজ ফার মোর অনারেবল্ দ্যান্ দ্যাট্!

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় বিকাশ। ধীর শান্ত স্বরে বলে, আপনার যা-কিছু বলবার বোধহয় শেষ হয়েছে ধীরেনদা। না না, আপনাকে আর দাদা বলব না, ধীরেনবাবু বলব। জীবনকে আপনি বোধহয় টাকার ভোঁতা পিঠ দিয়ে দেখেছেন, তাই মানুষের মনকে আপনি বোঝেন না। একটা গল্প শুনুন। আমারই এক বন্ধু, মিলিটারী ফেরৎ, তার স্ত্রী দুর্ভিক্ষের সময় দেহ বিক্রী করে তার একমাত্র ছেলে আর শ্বাশুড়িকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার সেই বন্ধু ফিরে এসে সব খবর শুনে বড়লোক হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে দারোয়ানীর চাকরী নিয়েছে। কেন জানেন, তার স্ত্রীকে সারিয়ে তুলবে বলে, তার স্ত্রীকে সসম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে। আমরা সেই জাতের মানুষ ধীরেনবাবু।

ক্ষণেকের জন্যে চুপ করে বিকাশ। বাইরে যাওয়ার জন্যে পা তুলে আবার নামিয়ে নেয়। দুটি হাত তুলে জোড়করে নমস্কার জানিয়ে

বলে, তাহলে চলি ধীরেনবাবু। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।

টলতে টলতে বিকাশ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আর ধীরেনবাবু চেয়ে থাকেন বিকাশের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে।

দশ

ফণীবাবু খবর নিয়ে আসেন ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘট বানচাল করার জন্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লোক নেওয়া সুরু হয়ে গেছে। বেশী করে লোক নেওয়া হচ্ছে প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্যে থেকে।

এমন একটা সংবাদ শুনে সনত প্রথমটা কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। তার মনে হয়, এরকম নোঙরা কাজের অংশীদার বুঝি সে-ও। সে-ওতো একজন প্রাক্তন সৈনিক। রাগে ঘৃণায় তার মুখ থেকে কোন বাক্যস্ফুট হয় না। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

আবার ওর চোখে ভেসে ওঠে সেই লাইন। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রিক্রুটমেণ্ট অফিসের সামনে সেই অন্তহীন মানুষের সারি। যুদ্ধের ময়দানে লাখে লাখে মরে হেজে গিয়েও সে-লাইন সংকুচিত হয়নি। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেও দেখেছে সেই একই লাইন। বুভুক্ষার তাড়নায় মানুষগুলো আর মানুষ নেই, হয়ে উঠেছে উদরসর্বস্ব পশু।

সন্দেহ জাগে সনতের, শুধু রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে ওই মানুষগুলোকে ঠেকানো যাবে কি!

মুখটা ফিরিয়ে এনে প্রশ্ন করল, এমন ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি?

ফণীবাবু বললেন, কতটা কাজ হবে বলতে পারছি না, কিন্তু বাধা দিতে পারি।

--কাদের বাধা দেবেন?

—প্রাক্তন সৈনিকদের।

—তারা শুনবে কেন!

—তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শোনাতে হবে সনতবাবু।

—কিন্তু তারা শুনবে কেন! তাদের কথা কে শুনেছে! তারা আজও যেন সেই মিলিটারী ক্যাম্পে নিঃসঙ্গ পড়ে আছে। তাদের জীবন, তাদের সংসার দিনের পর দিন ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মিলিটারী থেকে ফিরে এসে তারা চাইছে আর সকলের সঙ্গে মিশে যেতে, কিন্তু কেউ-ই তো তাদের কাছে ডেকে নিচ্ছে না!

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ফণীবাবু ক্ষণেক চেয়ে থাকেন সনতের মুখের দিকে। সনতের মুখখানা রাগে, অভিমানে থম্ থম্ করছে।

ফণীবাবু বললেন, আর একটু এগিয়ে ভাবতে হবে সনতবাবু। আপনি যে-কথা ভেবে প্রাক্তন সৈনিকদের বাধা দেওয়ার ব্যাপারে মনে সায় পাচ্ছেন না, আমিও সেই একই কথা ভেবে প্রাক্তন সৈনিকদেব বাধা দিতে চাইছি। বাঁচার সমস্যা যেখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানে সে সমস্যার সমাধান এমনভাবে করতে হবে যাতে অধিকাংশ মানুষ সে সুযোগ পায়।

সনতের উষ্মা তখনও কাটেনি। প্রশ্ন করল, কেমনভাবে সমাধান করতে হবে? জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে আমাদের ছেঁটে দিয়ে?

ফণীবাবু ধীরে ধীরে বলেন, না সনতবাবু, কাকেও বাদ দিয়ে নয়। আপনি প্রাক্তন সৈনিকদের আলাদা একটা গোষ্ঠি হিসেবে দেখছেন, কিন্তু সত্যিই তো তারা তা নয়। প্রাক্তন সৈনিকরা জনসাধারণেরই একটা অংশ। জনসাধারণের এই সমস্ত সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে তাদের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম না হলেও, পরোক্ষভাবে তাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে দিচ্ছে। এই যে ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘট হতে চলেছে, সে কি শুধুই তাদের লড়াই। কখনও তা হতে পারে না সনতবাবু। তাদের সংগ্রাম প্রেরণা জোগাবে অন্য আর সকলকে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে। যে-দাবি তারা আদায় করবে, সে-দাবি অন্যের ক্ষেত্রেও স্বীকৃত সত্য হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্যেই আজ আমাদের কর্তব্য, যারা ডাক-তার কর্মচারীদের সংগ্রামকে না-জেনে না-বুঝে বানচাল করার ফাঁদে পা দিতে চলেছে, তাদের বাধা দেওয়া, তাদের বোঝানো—এই বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা।

আর কোন প্রশ্ন তোলে না সনত। কেমন যেন সে ঝিমিয়ে যায়। গত কিছুকাল থেকে সে দেখে আসছে, ছোটখাট নানান আন্দোলনে সাফল্য আসছে, জয় হচ্ছে—কিন্তু তারপর! অবস্থার কোন পরিবর্তন সে নিজের গণ্ডির মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না!

বিচিত্র এক যুগ-সন্ধিক্ষণ সেই দিনগুলো!

একদিকে চলেছে সারা দেশ জুড়ে নানান আন্দোলন। কলে কারখানায় চলেছে ধর্মঘট, বন্দীমুক্তির জন্যে দেশব্যাপী আলোড়ন, সারা ভারত ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘট প্রস্তুতির বিপুল উদ্দীপনা। সমস্ত দেশটা যেন অসহনীয় এক যন্ত্রনায় একে অপরকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরেছে। গড়ে উঠছে বিশাল আর ব্যাপক ঐক্য।

কিন্তু তারই পাশাপাশি চলেছে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি, বঙ্গভংগের দাবিতে সারা দেশ জুড়ে সভা-সমিতি। উঁচু থেকে নিচু মহলের কংগ্রেস আর লীগ নেতাদের মধ্যে আক্রোশের বাক্‌যুদ্ধ। হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ডের রিক্রুটমেন্ট চলেছে পাড়ায় পাড়ায়, আর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কুচকাওয়াজ চলেছে দিনে-রাতে। সমস্ত দেশটা পরস্পর অবিশ্বাসে আর বিদ্বেষে দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে।

যে মানুষগুলো কল-কারখানায় আপিসে অটুট ঐক্য গড়ে তুলছে মানুষের মত বাঁচার সংগ্রামে—তারাই পাড়ায় পাড়ায় পরস্পর বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে উঠছে আসন্ন স্বাধীনতার প্রলোভনে!

সনত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে পায়চারী করতে থাকে ঘরের মধ্যে। মাথাটা তার ঝুঁকে পড়ে।

ফণীবাবু ডাকেন, আসুন সনতবাবু, একটা বিড়ি খাওয়া যাক।

সনত ফিরে এসে মাদুরের ওপর বসে। ফণীবাবুর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরায়। পর পর গোটা-কয়েক টান দিয়ে বলে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে?

ফণীবাবু হেসে ফেলেন সনতের প্রশ্ন করার ধরণ দেখে। বলেন, কি হল আপনার সনতবাবু, এত কি ভাবছেন?

সনত অসহায় চোখ মেলে বলে, কি যে ভাবছি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। তবুও ভাবছি অনেক কথাই। ভাবছি, আপনার ওই কথা।

প্রাক্তন সৈনিকদের বাধা দিতে হবে। বাধা যে দিতে হবে সে-বিষয়ে আমিও একমত। তবুও ভাবছি, বাধা পেয়ে যে মানুষগুলো ফিরে যাবে, তারা কি আশা নিয়ে ফিরে যাবে। তাদের সামনে কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা মেলে ধরতে পারব। কি পাথেয় নিয়ে তারা জীবনের এই রুক্ষ পথ অতিক্রম করবে !

ফণীবাবু আরও একটু কাছ ঘেঁষে এসে বসলেন সনতের। ঝুঁকে পড়ে বললেন, সনতবাবু, আপনি বোধহয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিছুদিন আপনার বিশ্রাম দরকার। কয়েকদিনের জন্যে মা-বাবার কাছে থেকে আসুন। দেখবেন, জীবনের পথ এতটা রুক্ষ নয়, যতটা এই মুহূর্তে আপনার মনে হচ্ছে। মানুষকে এখন যতটা হৃদয়হীন মনে হচ্ছে, ঠিক ততটা তারা নয়। দেখবেন, মানুষের বুকভরা দরদ আর ভালবাসা আপনার জন্যেও রয়েছে, শুধু আপনাকে তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সনত মাথা নিচু করে থাকে। অনেকগুলো মুখ একসঙ্গে ওর চোখের সামনে ভীড় করে দাঁড়ায়। সবকটা মুখই তার কত প্রিয়।

ফণীবাবু বললেন, তাহলে কালই আপনি রওনা হয়ে পড়ুন।

সনত হঠাৎ ফণীবাবুর একখানা হাত চেপে ধরে। আবেগ-কম্পিত স্বরে বলে, সে না হয় পরে দেখা যাবেখন। কাল আমাদের কি করতে তাই বলুন।

ফণীবাবু বললেন, প্রথম কাজ হচ্ছে, আমাদের আরও কয়েকজন লোক জোগাড় করতে হবে। তারপর সকলে মিলে কাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের গেট খোলার আগেই পিকেটিং সুরু করব।

সনত বললে, ঠিক আছে, আজই আমি নীরদ অতীশ আর বিকাশকে খবর দিচ্ছি।

ফণীবাবু বললেন, কিন্তু দেখবেন, তাদের ওপর যেন জবরদস্তি করবেন না। আর কোন কারণে তাঁরা যদি আসতে না চান যেন তাঁদের ভুল বুঝবেন না।

পরদিন সকালে নীরদ যথা সময়ে এসে উপস্থিত হ'ল প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের আপিসে।

নীরদ জানালো, বিকাশের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। মায়া যা বলেছে, তার অর্থ, বিকাশ পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরীর ধান্দায়। সারাদিনই প্রায় বাড়ী থাকে না, আর যেটুকু সময় বাড়ী থাকে, কারও সংগে কথা বলে না। বেলেঘাটা থেকে ফেরার পর মায়ার শরীর হঠাৎ যেন আরও বেশী খারাপ হয়ে পড়েছে। বিকেলের দিকে নাকি রোজই জ্বর হচ্ছে।

অতীশের খবর দিলে সনত, সে আসতে পারবে না। তার ছোটমামার সংগে সে এখন রোজই বেরোচ্ছে তাঁর আপিসে। সেখানে নাকি একটা কাজ খালি হয়েছে। সাহেবের ইচ্ছে নয় আর লোক নেওয়া হয়। কিন্তু আপিসের বাবুরা ঠিক করেছেন, ওই জায়গায় অতীশ যদি মাসখানেক বেগার খাটতে পারে, তাহলে সাহেবকে ব'লে ক'য়ে বড়বাবু হয়তো কাজটায় অতীশকে লাগিয়ে দিতে পারেন।

নীরদ হেসে ওঠে, বাঃ চমৎকার!

সনত বললে, সত্যিই চমৎকার নীরদ। আরও চমৎকার হবে যখন এই সব লোককে আমাদের ওই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় গিয়ে বোঝাতে হবে যে, আজ যদি তারা ডাক-তার বিভাগের কোন চাকরী নেয়, সেটা হবে তাদের বিশ্বাসঘাতকার কাজ।

নীরদ বলে, তাতো হবেই সনত। এ চাকরী তো ওরা চাকরী দেওয়ার জন্যে দিচ্ছে না, দিচ্ছে ধর্মঘট ভাঙার জন্যে।

সনত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, সে কথা আমি বুঝি নীরদ। কিন্তু আমি ভাবছি, আজকের এই শাসন আর এই ব্যবস্থা আমাদের কোথায় নামিয়ে এনেছে। বাধা আমাদের দিতেই হবে। কিন্তু বহু মানুষ নিছক জন্তু জানোয়ারের মত শুধুই পেটের জ্বালায় ওই দরজায় এসে ধর্ণা দেবে তো!

ফণীবাবু আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকেন।

সনত বলে ওঠে, মন্দ কি ফণীবাবু আজ তো আমরা পাঁচজন।

সদলবলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের গেটে এসে স্লোগান দিতেই,

কয়েকজন এসে ঘিরে ধরল তাদের। সকলেরই চোখে মুখে বিস্ময়। নানান জাতের প্রশ্ন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, হঠাৎ কেন এরা এমন দলে দলে লোককে চাকরী দিচ্ছে!

সুযোগ মিলে গেল। ফণীবাবু গেটের রেলিঙের ওপর উঠে একে একে বলে যেতে থাকেন সমস্ত কথা। আসন্ন ডাক-তার ধর্মঘটের কথা, তাদের দাবিদাওয়ার কথা, তারপর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের হঠাৎ এই চাকরী দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য।

নীরদ ভীড়ের বাইরে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। হঠাৎ যেন ভূত দেখে চমকে উঠে ছুটে এল সনতের কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সনত, বিকাশ—

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে সনত বললে কি হয়েছে বিকাশের?

—বিকাশ ওই লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

—এ্যাঁ! চলতো দেখি, বেগে সনত লাইনটার দিকে এগিয়ে যায়।

বিকাশের সামনে গিয়ে সনত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন তার হাত পা কাঁপতে থাকে। মনে পড়ে যায় তার নিজেরই কথাগুলো যা সে ফণীবাবু আর নীরদকে বলেছিল। মানসিক ক্লান্তি আর অবসাদ থেকে যে দুর্বলতা তার মনকে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তার প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখে সে যেন আঁতকে ওঠে। বিকাশকে কি কুৎসিত দেখাচ্ছে ওই লাইনটার মধ্যে। কি যেন বলতে গিয়ে বিকাশের মুখের পানে তাকিয়ে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। এ কি উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি বিকাশের!

বিকাশ বললে, আমাকে বারণ করতে এসেছ সনতদা?

সনত আর নীরদ বিকাশের আরও কাছে এগিয়ে যায়।

বিকাশ বলে ওঠে, এমনই মনের অবস্থা নিয়ে আর পাঁচবছর আগে রিক্রুটিং অফিসের সামনে লাইন দিয়েছিলাম সনতদা। সেদিনও আমি এমনই অন্ধকার দেখেছিলাম সারা দুনিয়াটা। আমার বাঁচার জন্যে কোথাও কোন ব্যবস্থা ছিল না সেদিনও। সেদিনও মনে হয়েছিল, পরাধীন দেশের মানুষ আমি, কেন যাব শাসকের সেনাবাহিনীতে তার রাজত্ব বাঁচাতে। সেদিনও মনে হয়েছিল, আমার প্রতিটী আপনার জন

এমনি করেই আমাকে বারণ করছে মৃতের ওই তালিকায় নাম লেখাতে। সেদিনও চোখের ওপর বারবার ভেসে উঠেছিল মায়ের মুখখানা আর তাঁর অবস্থা যখন তিনি শুনবেন আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি। তবুও তো সেদিন আমি ওই লাইন থেকে ছুটে পালিয়ে আসতে পারি নি!

নীরদ বিকাশের একটা হাত হাতের ওপর তুলে নিয়ে বলে, সেদিন যে এমন করে কেউ যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেনি বিকাশ। কেউ আমাদের ডেকে বলে নি, ওই আত্মঘাতী পথে বাঁচা যায় না, তোমরা ফিরে এস। এস আমরা সকলে মিলে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতের বুক থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিই।

বিকাশ সনতের দিকে ঝুঁকে বললে, কিন্তু সনতদা, আজ মায়া যদি এমনই ভাবে বিনা চিকিৎসায় মরে যায়, কি করে আমি নিজেকে ক্ষমা করব বল?

সনত কথা বলতে গিয়েও থেমে যায়। গলাটা তার বুজে আসে। মায়ার সেই মুখখানা ভাসছে চোখের ওপর, যে মুখখানা বলেছিল, 'তোমরা সকলে মিলে আমাকে বাঁচাতে পার না সনতদা?'

বার কয়েক ঢোঁক গিলে নিয়ে সনত বললে, মানুষের মর্যাদা বজায় রেখে মায়াকে যদি বাঁচাতে না পারি, তা হলে মায়ার বেঁচে থেকে কোন লাভ হবে না বিকাশ।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে বিকাশ সনতের আনত মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কখন যেন সে দৃষ্টি তার নিজের অন্তরে নিবদ্ধ হয়ে গেছে। ধীরেনবাবুর সেই দাম্ভিক মুখখানা ভেসে উঠেছে তার চোখের ওপর। হঠাৎ যেন সে ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। সনতের একটা হাত চেপে ধরে বলে, ঠিক বলেছ সনতদা, ধীরেনবাবুর সর্তে রাজি হয়ে তাঁর কাছে চাকরী করা আর এই চাকরী নেওয়া—দুই-ই সমান।

সামনে একবার তাকিয়ে দেখে বিকাশ। লাইনটা কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেছে—অনেকগুলো চোখ গভীর কৌতূহলে তার দিকে চেয়ে আছে। আর পেছন থেকে এসে তার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ছে ফণীবাবুর গলার স্বর, বন্ধুগণ, আজ আমরা কিছুতেই বিশ্বাসঘাতক

হতে পারি না। ডাক-তার কর্মচারীদের সংগ্রাম আমাদেরই সংগ্রাম। তাদের জীবনমরণ সংগ্রামকে সাহায্য করতে পারলে, আমাদের বাঁচার পথ সুগম হয়ে উঠবে।

লাইন থেকে বেরিয়ে এসে বিকাশ নীরদকে জড়িয়ে ধরল, কবে আমাদের বাড়ী পাওয়া যাবে নীরদদা, আর যে একা একা মাথা ঠিক রাখতে পারছি না।

২৯শে জুলাই ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে সারা কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট।

কথা ছিল, সনত প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের ফেস্টুন নিয়ে ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণে অপেক্ষা করবে, আর প্রাক্তন সৈনিকেরা সেই ফেস্টুনের তলায় গিয়ে জমায়েৎ হবে।

কি এক অজানা উত্তেজনায় রাতটা কেটে গেছে সনতের। বার বার তার মনে হয়েছে, কিছু একটা হবেই! হরতাল বা ধর্মঘট সে এর আগেও দেখেছে। কিন্তু এতো শুধু জোয়ার নয়—এ যেন প্রবল এক বন্যা! সমস্ত শহর, শহর ছাড়িয়ে উপকণ্ঠে প্রতিটি কলে কারখানায় হবে এই ধর্মঘট। আর ধর্মঘটি সেই সমস্ত শ্রমিক আসবে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে মিছিল করে এই ময়দানে!

এত উত্তেজনা, এত আবেগের মধ্যেও সনতের মনটা বিষন্ন হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় মিলিটারী জীবনের কথা। আর, আই,এন, অভ্যুত্থানের সেই দিনগুলি। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার কেউ খবর রাখেনি, কি পরিমান বারুদ জমা হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে সশস্ত্র সেই বিশ লক্ষ ভারতীয় সৈনিকের বুকে। তারা তো চেয়েছিল লড়তে, সত্যিকারের লড়াই লড়তে এই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেদিন যদি কেউ একটু যোগাযোগ করতো, কেউ যদি ডেকে একবার বলতো, তোমাদের সঙ্গে আমরাও আছি, তাহলে আজ হয়তো ভারতের চেহারা অন্য রকম হত।

কিন্তু আজ তো আর কারও খবর রাখা বা না-রাখার ওপর নির্ভর করছে না, কি পরিমান বিক্ষোভ জমে উঠেছে দেশশুদ্ধ মানুষের মনের

মধ্যে। হয়তো আবার সেই মরণপণ সংগ্রাম শুরু হবে নতুন মানুষের জমায়েতে! নতুন নতুন লড়াইয়ের ময়দানে!

সনতের একটা ধারণা আছে, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। আপোষ রফার মধ্যে দিয়ে ব্যবসায়ীক বোঝাপড়া লেনদেন হতে পারে, ভাগ বাঁটোয়ারা হতে পারে—কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।

আরও ভেবেছে সনত, দেশের মানুষ আরও একবার লড়বেই বৃটিশের বিরুদ্ধে সমূলে তাকে উচ্ছেদ করার জন্যে। তখন তারাও সামিল হবে তাদের পাশে। এবার আর খাকি উর্দিতে নয়, সাধারণ পোষাকে, জনসাধারণের একজন হয়ে। এখন তারা যদিও আর একটি বাহিনী নয়, কিন্তু রাইফেল, মেসিন-গান চালাবার মত শিক্ষা তাদের কারও চেয়ে কম নেই। সেই শিক্ষার জোরে তারাই পাড়ায় পাড়ায় বাহিনী গড়ে তুলবে। রাইফেলের ফাঁকা ম্যাগাজিন বাজিয়ে বা পাঁচ রাউন্ড গুলি লোড করে হাজার হাজার মানুষকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে দেবে না। ওই রাইফেল আর মেসিন-গান তাদের হাতেও পোষমানা কুকুরের মত কথা শুনবে।

ভোর না হতেই মতি শীল ষ্ট্রীটের দোতলার ঘরে এসে কড়া নাড়ল অতীশ।

দরজা খুলে সনত চমকে উঠল। বলে উঠল, কি ব্যাপার! এই অন্ধকার থাকতেই!

অতীশ বললে, চলে এলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের পাতা সনতের বিছানার ওপর বসে অতীশ বললে, চলে এলাম হাঁটতে হাঁটতে। ভাল লাগছিল না। সারারাত ঘুম হল না। কাঁহাতক্ আর বিছানায় পড়ে থাকা যায়!

সনত অবাক হয়ে ভাবে, তাহলে কি আজকের এই ভোরে প্রতিটি প্রাক্তন সৈনিক সেই একই কথা ভাবছে!

ভোরের সেই সবুজ আলো মিলিয়ে গিয়ে পূর্বদিগন্ত রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। কেষ্টুনটা কাঁধে তুলে নিয়ে সনত বলল, চল অতীশ, আমরা রওণা হয়ে পড়ি।

অতীশ অনামনস্কভাবে বলল, চল।

ধর্মতলা স্ট্রীটে পড়ে ফাঁকা ফুটপাথ দিয়ে খানিকটা হেঁটে হঠাৎ অতীশ বলে ওঠে, চল, রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাই।

সনত মুচকে হাসে। আবাল্য বন্ধু অতীশকে সে ভাল রকমই চেনে। এমন একটা মুহূর্তে তার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, সে যেন নখ-দর্পনে দেখতে পায়। দুঃসাহসিক একটা কিছু করার জন্যে যে অতীশ মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছে, সনত তা দেখতে পায় আড়চোখে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়েই।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলেছে। পেছন থেকে রোদ পড়ে ওদের সামনে ফেলেছে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা ছায়া। সমস্ত রাস্তাটা রোদে ভেসে যাচ্ছে।

অভ্যাস বশে সনত পেছন ফিরে একবার দেখে নেয়।

অতীশ তেড়ে ওঠে, পেছন ফিরে চাইছ কি, আজ সব বন্ধ।

রাস্তার দুধারে ফুটপাথে শুয়ে-থাকা লোকেরা ধীরে ধীরে জাগছে। তাদের আজ কোন তাড়া নেই। কেউ জেগে উঠে রাস্তার দিকে চেয়ে শুয়েই আছে। কেউ উঠে অনাবিল আলস্যে আড়ামোড়া ভাঙছে।

এ দৃশ্য দেখে অতীশের মনে পড়ে যায় মিলিটারী ক্যাম্পে রবিবারের কথা। গলা নামিয়ে সনতকে বলে, মনে পড়ছে সনত মিলিটারী জীবনের কথা। প্রতি রবিবারটাই আমাদের কাছে এমনই বিস্ময় নিয়ে হাজির হত।

সনত এ কথার কোন জবাব দিলে না। আবার চলেছে দুজনে চুপচাপ। কেউই খেয়াল করেনি, কখন ওদের পায়ের ধাপ মিলে গেছে। বহুদিন ধ'রে শুনে আসা অভ্যস্ত একটা শব্দ সনতের কানে এসে বাজে, ঝপ্-ঝপ্-ঝপ। এ শব্দ ক্ষীণ হলেও সেই শব্দ, যে শব্দ রক্ত ওদের চঞ্চল করে তুলতো, নতুন করে উন্মাদনা জাগাতো।

হঠাৎ সনতের মনে পড়ে যায় অনুরূপ একটা ঘটনা। সে ঘটনা-টাকে কেন যে আজকের এই দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে, ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে ময়দানের দিকে চলার সঙ্গে অনুরূপ মনে হয়, সেইটাই সনত বুঝতে পারে না।

সনত যেন আপন মনে বলে ওঠে, জানো অতীশ, রিলিজ হয়ে আসার দিন পনেরো আগেকার একটা ঘটনা আমার আজ ভীষণ মনে পড়ছে।

অতীশ সামনের দিকে দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ রেখে বললে, বলে যাও।

—সেই দিনই আমরা ট্রেণ থেকে নেমে জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্টে পোঁচেছি। আমাদের নিয়ে গেল রিসেপ্‌সন ব্যারাকে। সুন্দর ব্যারাক, ঝকঝকে তকতকে। পুরো চারটে বছর আমরা কাটিয়েছি আসামের জঙ্গলে। জঙ্গল কেটে নিজেদের হাতে ক্যাম্প পত্তন করেছি। এমন সব জায়গা যেখানে বোধহয় মানুষ হিসেবে আমরাই প্রথম পদার্পণ করলাম। জলন্ধরের ব্যারাক দেখে কেমন যেন লোভ লাগল। অদম্য এক ইচ্ছা পেয়ে বসল সকলকে, মিলিটারী জীবনের শেষ কটা দিন একটু আরাম করে যাব।

বিকেলে এক হাবিলদার এসে জানিয়ে গেল, পরদিন সকালে ব্যারাক ছেড়ে আমাদের তাঁবুতে যেতে হবে।

চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল, তাঁবু! আবার তাঁবু! আসামের জঙ্গলে তাঁবুতে বাস করেছিলাম সাপখোপের সঙ্গে, আর এখানকার তাঁবুতে দিনের বেলায় আধঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকলে, বালি চাপা পড়ে যেতে হবে। পাঞ্জাবের গ্রীষ্মকাল, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আঁধি চলছে, তারই মধ্যে তাঁবুতে বসে ঝলসাতে হবে!

প্রথম উঠল আব্দারের সুর, তারপর অসন্তোষের গুঞ্জন, তারপর প্রতিবাদ, তারপর রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প।

রাত্রে ঠিক হল, আমরা তাঁবুতে যাব না। আমাদের জন্যে ব্যারাক চাই।

সাবধানী, বিবেচক লোকের অভাব নেই। তারা বোঝাতে লাগল, কেন আর ঝামেলা বাধানো! মেয়াদ তো আর বড় জোর সপ্তাহখানেক!

কিন্তু শোনে কে! কেমন যেন রোখ্ চেপে গেছে। ওই বিকাশ, ওই রফিক, কমলাকান্ত, সুকুমার, সুলতান, শুধু ওরা কেন, কোম্পানি-শুদ্ধ ছেলে যেন ওই ব্যারাকের দাবিতে মরণপণ লড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। তার মাত্র মাস দুয়েক আগে আর, আই, এন্'এর

ব্যাপারটা ঘটে গেছে।

সকালে হাবিলদার এসে বলল, চলো ডাম্বুমে।

আমরা বললাম, আমাদের ব্যারাক চাই।

হাবিলদার জমাদারকে ডেকে নিয়ে এল।

আমরা বললাম, আমাদের ব্যারাক চাই।

হাবিলদার আর জমাদার সুবেদারকে ডেকে নিয়ে এল।

আমাদেব সেই একই কথা।

সুবেদার মেজর এল।

আমাদেব কথার কোন নড়চড় নেই।

সুবেদার মেজব ব্যারাক কন্‌ফাইনমেন্টের হুকুম জারি করে গেল।

আমরা ঠিক করলাম, মার্চ করে কমাণ্ডাণ্টের কাছে গিয়ে আমাদের দাবি পেশ কবব।

ফল্‌ইন্‌ করল সমস্ত কোম্পানি। যারা ইতস্তত করছিল, তারা ওই ফাঁকা ব্যারাকে থাকতে সাহস না পেয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

চললাম মার্চ করে। কোন ত্রুটী খুঁজে বার করবার ক্ষমতা কারও নেই। স্টেপিঙে ভুল নেই, ড্রেসিঙে গলৎ নেই, কারও বাজু একটা ভাঁজও খায় নি।

একবার ভাবো অতীশ, জলন্ধর ক্যান্টনমেন্টেব মধ্যে আমরা বিদ্রোহী একটা দল, মাত্র শ'দুয়েক সৈনিক, যুগযুগান্তেব মিলিটারী আইন-কানুনের সব কিছুকে পাযের তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে মার্চ করে চলেছি নিজেদের ইচ্ছে মতন।

কে একজন বললে, সোজাসুজি না গিয়ে, চল সমস্ত ক্যাম্পটা প্রদক্ষিণ করে যাই।

তখন দুপুর বেলা, বেলা একটা কি দেড়টা, সমস্ত ক্যাম্পটার তখন রেস্ট। অকস্মাৎ ভূমিকম্প হওয়ার মত চমকে উঠেছে ব্যারাকে ব্যারাকে প্রতিটী সৈনিক। প্রত্যেকটা ব্যারাক থেকে, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে সারা ভারতের প্রতিটি দেশের মানুষ, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, পাঠান!

কমান্ডান্টের আপিসের কাছাকাছি সুবেদার মেজর, সুবেদার, জমাদার আর হাবিলদাররা মিলে আমাদের পথ আটকালো।

এগিয়ে এল সুবেদার মেজর, তুমলোগ ক্যা মাঙতা?

আমাদের সেই এক কথা, আমাদের ব্যারাক চাই।

সুবেদার পেছন থেকে মুখ বাড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল, ক্যা জবর-দস্তিসে ব্যারাক লেগা!

আমাদের উত্তর, ইয়ে হামলোগোঁকো হক্ হ্যায়!

বাকবিতণ্ডা! ওরা রাগে অন্ধ হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনে এমন অবাধ্যতা তারা কখনও দেখেনি। রাগে আর উত্তেজনায় অকথ্য গালি-গালাজ পাড়ছে।

বুঝলাম, আমাদের ডিসিপ্লিন ওরা ভেঙে দিতে চায়। ওরা চায় আমাদের উত্তেজিত করে তুলতে। তাহলেই ওরা পাবে আমাদের ওদের আইনকানুনের আয়ত্তের মধ্যে।

আমাদের লাইনের মধ্যে থেকে কে একজন বজ্রগম্ভীর স্বরে হুকুম দিল, কোম্পানি, ফর্-ওয়ার্ড—

আগু বাড়াবার জন্যে পা বাড়ালাম।

সুবেদার মেজর পাশে সরে দাঁড়াল। সুবেদার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল আমাদের দিকে। জমাদার দৌড়ে গেল কমান্ডান্টের আপিসের দিকে।

আমরা এগিয়ে চলেছি। সব কটা মানুষের পা একটিমাত্র আওয়াজ করে পিচ্ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে।

কমান্ডান্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল। বারেক আমাদের সব কটা মানুষের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। আরক্ত মুখে কি যেন বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে নিলে। তারপর মৃদু হেসে বললে, অল্‌রাইট্ ইউ উইল্ গেট্ এ ব্যারাক্।

প্রায় মনুমেণ্টের কাছে এসে পড়েছে ওরা। পুবের রোদ্দুরে পশ্চিমে হেলে পড়েছে মনুমেণ্টের সুদীর্ঘ প্রতিবিম্ব। সবুজ ঘাসের ডগায় ডগায় শিশির চক্‌চক্ করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

ফেষ্টুনের দুটি খোঁটা মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়ে সনত দাঁড়িয়ে থাকে তার তলায়। অতীশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তার মুখোমুখি। কিছু হয়তো বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু এত কথা একসঙ্গে তার মাথার মধ্যে এসে ভীড় করেছে যে কিছুই সে বলতে পারল না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে অতীশ খানিকটা এগিয়ে যায়। আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। খুব দূরে একটা লাল বিন্দুর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। আরও খানিকটা এগিয়ে যায় অতীশ। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। কোথা থেকে একটা আওয়াজ যেন হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসছে। সমস্ত মাঠটার এদিক ওদিক অতীশ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে লাল সেই বিন্দু শত শত ফ্ল্যাগ ফেষ্টুন হয়ে এগিয়ে আসছে মাঠের দিকে। দূরের সে আওয়াজ বজ্রনিনাদ হয়ে প্রাসাদনগরীর দেয়ালে দেয়ালে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সমস্ত শূন্যতাকে পূর্ণ করে।

যে কথাটা অতীশ তখন বলব-বলব করেও বলতে পারেনি সনতকে, সেই কথাটা যেন তার কাছে পরিস্কার হয়ে ওঠে।

হন্তদন্ত হয়ে অতীশ সনতের কাছে এসে বললে, এই গলার আওয়াজের সঙ্গে যদি আমাদের হাতের রাইফেল, ব্রেনগান, স্টেন গান-এর আওয়াজ মিশে যেত, তাহলে কেমন হত সনত ?

সনত গভীর আবেগে অতীশের হাতটা চেপে ধরে হেসে ওঠে। সে হাসি বড় করুণ।

এগারো

বেলা তখন বোধহয় পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা।

অতীশ যাচ্ছিল রমেশ মিত্তির রোড ধরে চড়কডাঙ্গার মোড়ের দিকে। ছুটির দিন। সারা দুপুর বেশ মৌজ করে ঘুমিয়েছে। তারপর বেরিয়েছে বাড়ী থেকে।

মোড়ের কাছ বরাবর যখন সে এসে পড়েছে, তখন দেখে কিছু লোক খুব উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক চলেছে।

অতীশ ও ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় নি। কলকাতা শহরে উত্তেজনার অভাব কোন সময়েই নেই।

মোড়ে পেৌঁছে কেমন যেন সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনাটার ধরণধারণ যেন একটু আলাদা জাতের মনে হচ্ছে! দুপাড়ার দু'দল ছোকরার লড়াই-ঝগড়ার ব্যাপারের চেয়ে যেন আরও একটু বেশী ব্যাপক। মোড়ের মাথায় অনেক লোকের বিরাট জটলা। ফুটপাথের ওপর পাঁচ-দশ হাত তফাতে তফাতে গরম গরম আলোচনা।

মোড় থেকে খানিকটা ডাইনে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অতীশ লক্ষ্য করতে থাকে।

উল্টো দিকের ফুটপাথে একটা দোকানের সামনে প্রচণ্ড ভীড় আর ঠেলাঠেলি দোকানের মধ্যে ঢুকবার জন্যে। একদল বেরিয়ে আসছে, আর একদল ঢুকছে। যারা বেরিয়ে আসছে, তাদের হাতে থাকে-থাকে জুতোর বাক্স।

ধীরে ধীরে অতীশ রাস্তাটা পার হয়ে দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে, দোকানটা লুঠ হচ্ছে। কিন্তু যেটা বুঝতে পারে না সেটা হচ্ছে, কেন লুঠ হচ্ছে! এই দিন দুপুরে এত লোকে মিলে কেন এই দোকানটা লুঠ করছে!

হঠাৎ যেন ক্ষেপে যায় অতীশ। জুতোর বাক্স ঘাড়ে করে বেরিয়ে-আসা একটা লোককে ধাক্কা মেরে তেড়ে ওঠে, দিনদুপুরে একটা দোকান লুঠ করছেন! লজ্জা করে না!

লোকটার হাত থেকে জুতোর বাক্সগুলো পড়ে যায়। থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলে লোকটি, এটা যে মুসলমানের দোকান!

অতীশ প্রচণ্ড এক ধমক দেয়, মুসলমানের দোকান বলে আপনি লুঠ করবেন?

আরও কিছু লোক এসে ঘিরে দাঁড়ায় অতীশ আর লোকটিকে। তাদের মধ্যে কয়েকজন কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয় ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে পড়া জুতোর বাক্সগুলো। কারও ভাগ্যে জোটে একপাটি, কারও বা খালি বাক্স। তাইতেই সকলে মহা খুশী।

একজন দু' বগলে দুটো জুতোর বাক্স চেপে ধরে মারমুখো হয়ে

তেড়ে আসে অতীশের দিকে, মুসলমানের দোকান কেন লুঠ করবে না মশাই ?

অতীশ তার চারপাশে একবার দেখে নেয়। রাগে, বিস্ময়ে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে, মুসলমানের দোকান বলেই লুঠ করবে! বেশ বলেছেন তো! আপনার তো দেখছি রীতিমত ভদ্দরলোকের মত পোষাক!

ঘাড়-ছাঁটা বাব্‌রী-চুলো এক এক্সারসাইজওয়ালা যুবক অতীশের একেবারে গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে প্রশ্ন করে, আপনি হিন্দু না মুসলমান ?

ভ্যাবাচাকা মেরে যায় অতীশ। এ প্রশ্ন এমনভাবে তার জীবনে বোধহয় এই প্রথম। সে হিন্দু কি মুসলমান, সে ভাবনা ভাববার প্রয়োজন বোধহয় তার সারা জীবনে আর কোনদিন পড়ে নি।

প্রশ্নটা অতীশের কাছে কেমন যেন অপমানকর মনে হয়। সে-ও রুখে দাঁড়াল, আমি হিন্দু কি মুসলমান, তাতে আপনার কি মশাই! আমি কি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছি ?

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে ওঠে, শালা নিশ্চয়ই নেড়ে। না হলে দেখছেন না, হিন্দু কি মুসলমান বলতে চাইছে না কেন!

আবও একজন বলে ওঠে, দাও না শালাকে বেশ করে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দেখিয়ে।

হঠাৎ ধাঁই করে অতীশের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে প্রচণ্ড এক ঘুঁসি পেছন থেকে।

অতীশের চোখের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মুখে হাত চাপা দিয়ে সে সেখানেই বসে পড়ে।

কতক্ষণ ওভাবে ছিল মনে নেই অতীশের। ধীরে ধীরে আবার সে উঠে দাঁড়ায়। মাথাটা ঘুরছে। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায়। দোকানটার সামনে এসে পাশ ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দোকানে কেবল কাঠের র‍্যাকগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই।

হঠাৎ অতীশের মনে পড়ে, দোকানের লোকজন গেল কোথায় ?

তাকিয়ে তাকিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে অতীশ। কেমন যেন নতুন এক দুনিয়ায় সে এসে পড়েছে। এখানকার হালচাল, চালচলন, কিছুই যেন তার জানা নেই!

মোড়ে মোড়ে ভীড় আরও জমাট হয়ে উঠেছে। উত্তেজিত আলাপ আলোচনা সেই একইভাবে চলেছে। ছুটোছুটি করছে নানান ধরণের লোক নানান দিকে। কিছু লোকের মুখে আতঙ্কের ছায়া আর কিছু লোক উল্লাসে মাতোয়ারা।

হঠাৎ অতীশের আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে যায়। সেদিন রাস্তায় এত মানুষ বেরিয়ে আসে নি, মোড়ে-মোড়ে ছিল না কোনই জটলা, তবুও রাস্তার মোড়ে-মোড়ে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। সাজোয়া গাড়ী টহল দিচ্ছিল এক মিনিট দু'মিনিট অন্তর অন্তর। আর আজ সেখানে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলেছে। পুলিশের কোন চিহ্ন নেই। এমন কি মোড়ে মোড়ে যে টি. পি গুলো থাকে, তারাও কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে!

একটা লোককে ধরে কিছু লোক প্রচণ্ড ঠেঙাচ্ছে। অতীশ সেই-দিকে এগিয়ে যায়। দেখে দু'চারজন ভদ্রলোক বলছেন, ব্যাস্ ব্যাস্, যথেষ্ট হয়েছে এবার ছেড়ে দাও।

কে শোনে তাঁদের কথা। কে যেন একজন বলে ওঠে, ছেড়ে দেবে কি মশাই! ও শালা যে নেড়ে।

ভদ্রলোকেরা সরে আসেন ভীড়ের মধ্যে থেকে। অসহায় ভাবে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চলে যান যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে।

অতীশের মনে হয়, পুলিশ ছাড়া এ অবস্থাকে আয়ত্তে আনা কিছু-তেই সম্ভব নয়। চারিদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, কোথাও একটা লাল পাগড়ি দেখতে পাওয়া যায় কিনা!

কাকস্য পরিবেদনা! লাল পাগড়ি বা সাদা টুপি কোন কিছুই নজরে পড়ে না। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, থানা তো কাছেই।

জোরে পা চালিয়ে দেয় অতীশ থানার দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে যে লোকটিকে পায় তাকেই বলে অতীশ, ওদিকে যে দোকানপাট লুঠ হচ্ছে। আপনারা কি খবর পান নি?

লোকটি ভ্রূ কুঁচকে অতীশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন করে, আপনি হিন্দু না মুসলমান?

থতমত খেয়ে যায় অতীশ। সেই একই প্রশ্ন! সবিস্ময়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

সহৃদয় স্বরে লোকটি বলে, যদি মুসলমান হন, তাহলে এ পাড়া থেকে এখনই চলে যান।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে অতীশ থানা থেকে। এসে দাঁড়ায় রাস্তায় ফুটপাথের কিনারে। কি যেন সে বুঝবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতে ভেবে পাচ্ছে না, কেন একজন মুসলমানের পক্ষে এ পাড়ায় থাকা নিরাপদ নয়! এই পাড়াতেই তার জন্ম, এই পাড়াতেই কেটেছে সুদীর্ঘকালের এই জীবনটা, কিন্তু এমন আজব কথা তো সে কখনও শোনেনি!

একটা বাস এসে দাঁড়ায় স্টপেজে। কোন কিছু না ভেবেই অতীশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বাসটায়। কিছুদূর চলার পর তার খেয়াল হয়, সে চলেছে এস্‌প্লানেডের দিকে। এলগিন রোডের মোড় বরাবর এসে পড়েছে।

অতীশ উঠে দাঁড়ায়। এস্‌প্লানেড যাওয়ার তো তার কোন দরকার নেই। কয়েক পা এগিয়ে যায় নামবার জন্যে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের আপিসে গেলে নিশ্চয়ই সনতের সঙ্গে দেখা হবে।

মাথাটা তখনও দপ্‌দপ্‌ করছে। বাস চলেছে ফুলস্পীডে চৌরঙ্গির চওড়া রাস্তার ওপর দিয়ে। দমকা বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে মুখের ওপর। অতীশ বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, সবই চলেছে স্বাভাবিক ভাবেই। গ্যাসের আলোগুলোও যথারীতি জেবলে দিয়েছে। চৌরঙ্গির সাহেবী দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করছে।

হন্তদন্ত হয়ে আপিস ঘরে ঢুকে অতীশ নিজেই কেমন যেন চমকে ওঠে। সনত আছে, ফণীবাবু আছেন, আরও আছে জনদুয়েক। কিন্তু সকলেই কেন যেন অধোবদনে বসে আছে। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে

সকলেই একসঙ্গে চোখ তুলে চাইলে। সে চাহনি কি ভীষণ ভয়ার্ত আর অসহায়।

অতীশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। বসতে গিয়ে একটু ইতস্তত করে।

প্রথম কথা কইলেন ফণীবাবু, কোথা থেকে আসছেন অতীশবাবু?

অতীশ এগিয়ে গিয়ে চাটাইটার ওপর বসতে বসতে বললে, আসছি ভবানীপুর থেকে।

সনত সাগ্রহে প্রশ্ন করে, ওদিকে ব্যাপারস্যাপার কি রকম দেখলে?

অতীশ একে একে বলে যায় আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা।

অতীশের কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সকলে নীরব। মানুষগুলো যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সনত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অতীশের মুখের পানে। কিন্তু অতীশ বুঝতে পারছে, সনত মোটেই তাকে দেখছে না, দেখছে তাকে ডিঙিয়ে সুদূরে কোন এক দৃশ্যকে!

হঠাৎ যেন সনত চমকে উঠল। ঝুঁকে পড়ে অতীশের একটা হাত চেপে ধরে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, তোমাকে ওরা মারল অতীশ!

অতীশ উত্তর না দিয়ে মাথা নামিয়ে নিলে। যেন এ লজ্জা তারই।

ফণীবাবু বললেন, অতীশবাবু, এ আঘাত ওরা আপনাকে করে নি। এ আঘাত ওরা হেনেছে মানবতার ওপর। (যে সমস্ত গুণের অধিকারি হওয়ার ফলে জীবজগতে আজ আমরা মানুষ বলে পরিচিত, সেই মনুষ্যত্ব আজ পদদলিত। আজকের মতন এমন দুঃসময় আমাদের জাতীয় জীবনে আর কখনও আসে নি অতীশবাবু।)

ক্ষণেকের জন্যে চুপ করে থাকেন ফণীবাবু। ঘরটার মধ্যে বিজন স্তব্ধতা নেমে আসে। একটা ঝিঁঝিঁপোকা কোন একটা কোণ থেকে অশ্রান্তভাবে ডেকে চলে। হঠাৎ সকলে চমকে ওঠে বাইরে থেকে ভেসে আসা বিকট এক আওয়াজে। অনেক মানুষের সমবেত উন্মত্ত কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ে, আল্লা-হু-আকবর!

ফণীবাবু বলে ওঠেন, আর আমাদের হাতে বেশী সময় নেই সনতবাবু। এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। জানেন বোধহয়,

এ অঞ্চলেও দোকানপাট লুঠ হয়েছে ঠিক ভবানীপুরের মতই। ধর্মের নেশা মানুষকে উন্মাদ করে তুলেছে। এইবার চলবে ধর্মকে সামনে রেখে স্বার্থের হানাহানি।

সনত বললে, এখনই আমাদের কিছু করা দরকার ফণীবাবু।

—নিশ্চয়ই করা দরকার সনতবাবু, সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন ফণীবাবু, কিন্তু কি করা দরকার সেইটাই ভেবে পাচ্ছি না। এমন একটা অবস্থার জন্যে আমরা কেউই তৈরী ছিলাম না।

অতীশ ফুঁসে ওঠে, তৈরী ছিলাম না বলে চুপচাপ বসে বসে হাহুতাশ করব, সেটাও চলে না। আমরা হিন্দু মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি করে মরব, আর বৃটীশ সরকার বসে বসে মোরগের লড়াই দেখবে, সে কিছুতেই হতে দেব না।

ফণীবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন অতীশবাবু, এইটাই আমাদের এখনকার কাজ। কি বল সিরাজ, আর তুমিই বা কি বল অমূল্য?

অতীশ ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে অপরিচিত ছেলে দুটিকে।

ফণীবাবু করুণ হেসে বললেন, চিনতে পারলেন না অতীশবাবু, ওদের মধ্যে কে মুসলমান আর কে হিন্দু! পারবেন না, পারার কথাও নয়! ওরা জন্মেছে মানুষ হয়ে। দিনের পর দিন ওরা বড় হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। ওরা মিলিটারীতে একই লাইনে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি, একই হুকুমে ওরা একসঙ্গে কদম্ ফেলেছে। সেখানে ওদের একটিমাত্র পরিচয়ই ছিল, ওরা সিপাই। একই সঙ্গে ওরা অত্যাচারিত হয়েছে, একই সঙ্গে কেঁদেছে হেসেছে, অফিসারের বিরুদ্ধে লড়েছে। তবুও কি ওরা আজ আলাদা হয়ে যাবে!

সিরাজ রুখে ওঠে, কক্ষনো না ফণীবাবু। আমরা যখন থাকি মুসলমান পাড়ায়, তখন আমারই দায়িত্ব অমূল্যকে রক্ষা করা। আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে মারার আগে অমূল্যর একগাছা চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

অমূল্যর ফ্যাকাশে মুখখানায় হঠাৎ যেন খানিকটা রক্তের ঝলক খেলে যায়।

ফণীবাবু বললেন, এখনই আমাদের সকলকে সেণ্টারে সেণ্টারে চলে

যেতে হবে। সনতবাবু, আপনার আর অতীশবাবুর ওপর ভার রইল টালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট আর যাদবপুর সেণ্টারের। আমি ভার নিচ্ছি কলাবাগান আর বেলুড় সেণ্টারের। চল সিরাজ, আমরা এখনই রওণা হয়ে পড়ি। আজ রাত্রে আমি তোমাদের ওখানে থাকব। কাল ভোরেই রওণা হয়ে যাব বেলুড়ে।

ফণীবাবু উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সিরাজ আর অমূল্য!

সনতের ইচ্ছে করছে উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। কি যেন এক অবসাদ তার সমস্ত দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

অতীশ বললে, চল সনত, আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

সনত ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, তাই চল।

হঠাৎ ফণীবাবু দ্রুতগতিতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের কোলেই ন্যাড়া ছাদ। এসে দাঁড়ালেন আলসের কিনারে। ওখান থেকে মতি শীল স্ট্রীটের অনেকখানি দেখা যায়। ধর্মতলার মোড়টাও চোখে পড়ে।

ফণীবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখের ওপর দোকান-পাট লুঠ হচ্ছে। সে যে কোন দোকানই হোক না কেন। খাবারের দোকান রঙের দোকান, এমন কি পানবিড়ির দোকানও। হিন্দুর দোকান হলেই হল। সে কি উন্মত্ত উল্লাস! একটা করে দোকান সাফ্ হয়ে যাচ্ছে, আর হুংকার উঠছে, আল্লা-হু-আকবর!

ফেরবার জন্যে পা তোলেন ফণীবাবু। তাঁদের পাশের ঘরের বাসিন্দা সেই ছোট্ট পরিবারটি অসীম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিছানা-মাদুর বাঁধা-ছাঁদা করছে।

ঘরে ঢুকবার সিঁড়িতে পা দিয়ে ফণীবাবু ক্ষণেকের জন্যে থমকে দাঁড়ান। ঘরের মধ্যেটা চোখে পড়ে। দশ পাওয়ারের লালচে আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা সনত, অতীশ, সিরাজ আর অমূল্যকে মনে হয় যেন অশরীরি প্রেতাত্মা। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ান। কেন যেন তাঁর মনে হয়, সনত আর অতীশের কাছে তাঁকে বিদায় নিতে হবে। এগিয়ে গিয়ে সনতের হাতটা ধরেন।

এমন সময়ে কে যেন অসম তালে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ করে ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ঢুকল। দরজার কপাট দুটো দু'হাতে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যেকার সকলেই প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠে কাছাকাছি গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে দাঁড়াল। ফণীবাবুর হাত থেকে সনতের হাত গেল খসে। অমূল্য আর্তনাদ করে উঠল, কে? কে?

একটি নারীমূর্তি দরজার গোড়ায় স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে প্রাণ-পণ শক্তিতে দরজা দুটোকে আঁকড়ে ধরে।

সনত আর অতীশ একই সঙ্গে ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, কমলা! তুমি?

সনত ছুটে গেল কমলার কাছে। পেছনে পেছনে অতীশও এগিয়ে যায়।

কমলার হাত দুটো দরজার কপাট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সনত বললে, কেন তুমি এখানে এমন সময়ে এলে কমলা!

কমলা সনতের একটা হাত প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে বললে, তুমি এখনই এখান থেকে ফিরে চল সনতদা। আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

ফণীবাবু বললেন, ওঁকে আগে একটু বসতে দিন সনতবাবু।

সনত সস্নেহে বললে, তুমি ভেতরে এসে একটু বস। তোমার সমস্ত শরীর ভীষণ কাঁপছে।

কমলার হাত ধরে এনে সনত তাকে বসিয়ে দিলে চাটাইটার ওপর। অতীশকে ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে বললে, অতীশ একটু জল।

ফণীবাবু বললেন, তাহলে আমরা রওণা হয়ে পড়ি সনতবাবু। অতীশবাবু, আমরা চলি ভাই। আর আপনারাও এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে এখনই বেরিয়ে পড়ুন।

সনত আর অতীশ হাত বাড়িয়ে দিল ফণীবাবুর দিকে।

দুটি হাতে সনত আর অতীশের প্রসারিত হাত দুটি ধরে ফণীবাবু বললেন, আবার দেখা হবে, আবার আমরা আমাদের এই ঘরে বসে সুখ দুঃখের কথা কইব অতীশবাবু।

হাত দুটো হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে দরজার দিকে এগিয়ে

যান ফণীবাবু। মুখ না ফিরিয়েই ডাকেন, এসো ভাই সিরাজ আর অমূল্য।

ফণীবাবু, সিরাজ আর অমূল্য বেরিয়ে গেল। তাদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে কমলা প্রশ্ন করে, ও'রা কোথায় গেলেন?

সনত বললে, কলাবাগানে।

বিস্মিত কমলা বলে ওঠে, সে তো শুনেছি মুসলমান পাড়া। ও'রা সকলেই তো মুসলমান নন। ওই যে অমূল্য বলে যেন কাকে ডাকলেন।

অতীশ এ প্রশ্নের জবাব দেয়, আমাদের এই আপিস ঘরে যারা আসে, তারা কেউই হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তারা সকলেই প্রাক্তন সৈনিক।

সনত ঝু'কে কমলার কাছে এসে বললে, চল কমলা, তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

কমলা হাতটা তুলে ধরল। সনত সেই হাত ধরে কমলাকে দাঁড় করিয়ে দিলে।

কমলা বললে, তুমি তো আমার সঙ্গে ফিরে যাবে না সনতদা। ওই ও'দের মত তুমি আর অতীশদা নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যাবে। তাই না?

হ্যাঁ বলতে গিয়েও সনতের মুখে কথাটা আটকে যায়। বড় ক্লান্ত আর করুণ হয়ে উঠেছে কমলার মুখখানা।

অতীশ বললে, আমরা তো এক কাজ করতে পারি সনত। কমলার সঙ্গে গাড়ীতে অন্তত ভবানীপুর পর্যন্ত যেতে পারি। তারপর না হয় বাসে ওঠা যাবেখন।

সনত যেন এতক্ষণে একটা সূত্র খুঁজে পায়। বলে, হ্যাঁ, সেই ভাল। চল কমলা, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

বাইরে তখনই একবার সেই গগনবিদারী উন্মত্ত হুংকার ফেটে পড়ে, আল্লা-হু-আকবর!

গড়িয়াহাট, যাদবপুর, টালিগঞ্জ সেণ্টার হিন্দু এলাকা।

সনত আর অতীশ চরকির মত ঘুরতে থাকে একটা সেণ্টার থেকে

আর একটা সেণ্টারে। সেইদিনই রাত্রে গড়িয়াহাট থেকে যাদবপুর, সেখান থেকে টালিগঞ্জে পেঁৗছতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল।

গেটের সামনে পেঁৗছতেই দেখা হয়ে গেল সনাতনের সঙ্গে। সনাতন ক্যাম্পের সামনে পানের দোকান থেকে পান খেয়ে, বিড়ি কিনে ব্যারাকে ফিরছিল।

সনত জিজ্ঞেস করলে, কি সনাতনবাবু, আপনাদের সেণ্টারের খবর কি?

সনাতন বললে, কেন! খবর তো ভালই। আমাদের এখানে ওসব কোন ঝামেলা নেই। তা আপনারা এত রাত্রে কোত্থেকে?

সনত বললে, গড়িয়াহাট, যাদবপুর ঘুরে এখানে আসছি।

অতীশের কেমন যেন খটকা লাগে সনাতনের ওই অতি-সহজ উত্তরে। আবার প্রশ্ন করল অতীশ, আপনাদের এখানে তাহলে কোন ভয় নেই গণ্ডগোল হওয়ার?

সনাতন সেই একই সুরে জবাব দেয়, না মশাই, অন্তত আমাদের হিন্দুদের তরফ থেকে কিছুই হবে না আগে থেকে।

সনত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, তাহলে কি আপনারা এরই মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভাগাভাগি হয়ে গেছেন নাকি?

সনাতন তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ওঠে, ভাগাভাগি আমরা কি দুঃখে হতে যাব বলুন! ভয়টা আমাদের কাদের! আছে তো ওরা ওই গোটা তিরিশ। পাড়ার লোক তো সেই সন্ধ্যে থেকে বলছে সাবাড় করে দিতে। আমরা বলে দিয়েছি, আমাদের ক্যাম্পের মধ্যে ওসব হবে-টবে না। কিন্তু ওই বেটারাই তো আলাদা হয়ে গেল। সব কটা গিয়ে ঢুকেছে একটা ব্যারাকের মধ্যে।

কথা বলতে বলতে আপিসের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ওরা স্টোরের কাছে এসে পড়েছিল। ওখানেই দেখা হল অধীরের সঙ্গে।

সনাতন অধীরকে জিজ্ঞেস করল, কিরে অধীর, নবাব সাহেবদের খানাপিনা হল?

অধীর ধমকে ওঠে সনাতনকে, ওভাবে কথা বলছিস কেন সনাতন! তোদের ক'জনের ওই ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথাতেই ওরা এমন ভয় পেয়ে গেছে।

সনত জিজ্ঞেস করলে, সত্যিই ভয় পেয়েছে?

অধীর উত্তর দেয়, পাবে না! এই সেণ্টারের অন্তত ত্রিশজন হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ডে ঢুকেছে। ভয় পাওয়ার পক্ষে এইটাই তো যথেষ্ট কারণ।

সনাতন হেসে ওঠে, দেখুন সনতবাবু, হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ডে ঢুকেছে তো কি হয়েছে! আরে মশাই, মাসে চল্লিশটি করে টাকা দিচ্ছে। কাজ, রোজ বিকেলে গিয়ে ঘণ্টাখানেক প্যারেড করানো আর মাঝে মাঝে বক্তৃতা শোনা। এ তো দেশের কাজ।

অধীর বলে ওঠে, আর এই দেশের কাজওয়ালাদের নিয়েই বেধেছে গণ্ডগোল! যাক্, আপনারা যখন এসে পড়েছেন, দেখুন, অবস্থা যদি ফেরাতে পারেন। আমি তো খুব ভরসা পাচ্ছি না। একে তো ভেতরে এই দেশের কাজওয়ালারা, তার ওপর পাড়ার লোকের উস্কানি। শুনলাম নাকি কলাবাগান সেণ্টারের হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

অতীশ উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে, কক্ষণো না। এসব বাজে কথা। এই তো ঘণ্টা কয়েক আগে সিরাজ আর অমূল্য প্রাক্তন সৈনিক সংঘের আপিস থেকে ফিরে গেছে। ওদের সঙ্গে গেছেন ফণীবাবু, তিনি আজ রাত্রে ওই কলাবাগান মেসেই থাকবেন।

সনাতন তার ব্যারাকের দিকে চলে গেল।

সনত অতীশের একটা হাত ধরে ঈষৎ টান দিয়ে বললে, মাথা গরম কর না অতীশ। মনে হচ্ছে, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা এই সময়ে সবচেয়ে শক্ত কাজ।

একটু চুপ করে থেকে সনত বললে, আচ্ছা অধীরবাবু, আপনিই বলুন, আমরা এখন কি করতে পারি।

অধীর বললে, প্রথমে চলুন মুসলমান ট্রেইনীদের কাছে। তারপর ডাইনিং হলে একটা মিটিং ডাকুন। প্রাক্তন সৈনিক সংঘের তরফ থেকে আপনারা সমস্ত অবস্থা পরিষ্কার করে বলুন।

মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে কথা হল। অনেক কথাই তারা বললে। সহজ হয়ে ওঠার জন্যে ওরা বারম্বার চেষ্টা করলে। তবুও যেন নিত্যকার সহজ সরল ব্যবহার কিছুতেই ফিরে এল না।

ধীরে ধীরে সনত বুঝতে পারে, সমস্যার জড় অনেক গভীরে! সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরুতে ভাগ হয়ে গেছে মানুষ। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের ওপর মানুষের আস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জাতি ভাগ হয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে। কত যুগ যুগান্তরের জমা হওয়া ক্লেদ আজ নগ্নরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে!

মনে পড়ে যায় মিলিটারী জীবনের কথা। সেখানে মানুষগুলো অত্যাচারে, নিপীড়নে এক হয়ে গেলেও, পরস্পরের সঙ্গে মনে প্রাণে এক হয়ে মিশে যেতে পারে নি। অফিসারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মানুষগুলো এক হয়ে গিয়ে মরণপণ লড়াইয়ের জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে, সেই মানুষগুলোই 'হালাল্' আর 'ঝট্কা'র প্রশ্নে এক নিমেষে দুটি মারমুখী দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিচক্ষণ বৃটিশ সরকার সেই দুর্বলতারই সুযোগ নিয়েছে তাদের দুশো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে।

ডাইনিং হলের পথে যেতে যেতে অতীশ সনতকে আড়ালে ডেকে বললে, কিছু হবে না সনত, বৃথা চেষ্টা করছ।

অতীশের হাতখানা সজোরে চেপে ধরে সনত বলে ওঠে, না অতীশ একেবারে বৃথা হবে না। আজ এই উত্তেজনার মুহূর্তে হয়তো কাজ না-ও হতে পারে, কিন্তু আমাদের এই ভাষা, এই সুর কোনদিন মিলিয়ে যাবে না। বর্বরতার এ তাণ্ডব একদিন থেমে যাবেই, সেদিন এই মানুষগুলিই মনে করবে আমাদের কথা।

ডাইনিং হলের মিটিং তেমন জমলো না। সনাতনের দল মিটিঙে এল না, উপরন্তু তারা হাসাহাসি করল, নানান রকম টিপ্পনি আর মন্তব্য খোলাখুলিভাবেই করতে লাগল।

তবুও সনত বলে গেল একে একে আর, আই, এন্'এর গৌরবময় সংগ্রামের কথা, যে সংগ্রামে রেটিংরা লড়েছিল শুধুই ভারতবাসী হিসেবে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। তারই ফলে এল কেবিনেট মিশন। তাদের পদতলে আর্জি নিয়ে হাজির হল দলে দলে আমাদের দেশের নেতারা! সওয়াল উঠল ভারতের দুই জাতির—হিন্দু আর মুসলমান! ভারতকে বিভক্ত করে স্বাধীনতার উপঢৌকনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল সুপ্রতি-

ষ্ঠিত হিন্দু ধনিক শ্রেণী, আর উদীয়মান মুসলমান ধনিক শ্রেণী। হয়তো কোন ফরমুলার মাধ্যমে এ কাজ স্বাভাবিকভাবেই সমাধা করা যেত। কিন্তু উনত্রিশে জুলাই! ত্রাসের সঞ্চার করল শাসক শ্রেণী আর তার দুই হবু অংশীদারের মনে! সাধারণ মানুষের এই ঐক্যকে চুরমার না করলে যদি প্রতিরোধ দেখা দেয়! তাই ধর্মের ভিত্তিতে মানুষগুলোকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলার বন্দোবস্তটাই হল আমাদের স্বাধীনতার বোধনপুজো! তাই আজ এই দাঙ্গা! উনত্রিশে জুলাই রাস্তার মোড়ে মোড়ে মোতায়েন থাকে দলে দলে পুলিশ, মিলিটারী টহল দেয় সাঁজোয়া গাড়ীতে করে সারা শহর। কিন্তু আজ কোথাও একটা পুলিশ নেই। আজ যে অন্য কথা! আজই তো দিল্লীর মসনদে বসতে চলেছে ভাবী স্বাধীন ভারতের অন্তর্বর্তি সরকার!

ডাইনিং হলের মধ্যে নিরন্ধ্র স্তব্ধতা। মানুষগুলো সব অবাক হয়ে সনতের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে। এত ব্যাপার, এত গূঢ় রহস্য, রাজনীতির এত ঘোরপ্যাঁচ—এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের কই! পেটের দায়ে ঢুকেছিল মিলিটারীতে। পাঁচ বছর বাদে ফিরে এসে দেখলে জঠরের সেই জ্বালা সমস্ত জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই পনেরো টাকা মাসোহারায় কিছু হাতের কাজ শিখতে এসেছে এখানে।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকা সারিসারি মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে সনত বললে, আমরা এ বর্বরতাকে প্রতিরোধ করবই। এখানে আমরা হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই জন্যে এখনকার মুসলমানদের আমরা নিজের প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করব। আজ আমাদের কাজ শুধু এইটুকু।

অধীর একটা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালে যারা এ কাজে রাজী, তারা হাত তোল।

অনেকে ভেবে পেল না, এটা আবার এমন একটা কাজ কিসের! বিপদে বন্ধুকে রক্ষা করা, সে চেতনা তো রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে। আবার তারা বোকার মত অধীরের উত্তেজিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অধীর আবার বলে হাত তুলতে।

দোদ্‌্লামান চিত্তে অনেকেই হাত তোলে। উত্তোলিত হাতে ঘরটা প্রায় ভরে যায়।

তবুও রয়ে গেল কয়েকজন বাকী। সংখ্যায় তারা নগন্য। তারা হল সনাতনের দলবল। সেই দলের মধ্যে থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে ওঠে, সাবাস্ লীগের দালালরা!

কয়েকজন খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

যারা হাত তুলেছিল, তারা আরও একবার বিস্মিত হয়। পেছন ফিরে তাকিয়ে খুঁজতে থাকে, এরা আবার কারা!

সতেরো তারিখের ভোরে টালিগঞ্জ সেন্টার থেকে অতীশ বাড়ী ফিরে গেল।

বাড়ীতে পা দিতেই মড়া-কান্না পড়ে গেল। অতীশ যে মুসলমানের ছুরিতে প্রাণ দিয়েছে সে বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আর এমন একটা ঘটনা আরও কাজে লেগেছিল পাড়ার কিছু উৎসাহী লোকের কাছে। তারা শাবল, খোন্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মুসলমান খুঁজতে।

অতীশ সুস্থ শরীরে ফিরে আসাতে উৎসাহী সেই লোকেদের একতিলও বিব্রত বোধ করতে হয় নি। কারণ, পুরো একটা রাতের মধ্যে এত খবর এসে জমা হয়েছে যে অতীশের কথা তৎক্ষণে তাদের স্মৃতির কোন অতলে তলিয়ে গেছে!

অতীশের ছোটমামা রাত প্রায় নটা পর্যন্ত ছুটোছুটি করেছেন। রাত গড়িয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গতিবিধির সীমানাও হয়ে এসেছে সঙ্কুচিত। তারই মধ্যে তিনি বারবার ছুটে গেছেন সেই সেই থানাগুলোতে, যেগুলোতে নিরাপদে যাওয়া যায়। প্রতিবার সেই একই উত্তর পেয়ে অবশেষে তিনি ক্ষান্ত হন অতীশের খোঁজ নেওয়ার ব্যাপারে। ইতিমধ্যে অতীশের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা তাঁরই মারফতে জানাজানি

হয়ে যায় পাড়ায়। রাত দশটার সময় দেখা গেল, তিনিই হচ্ছেন প্রধান ব্যক্তি পাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি করার!

প্রথম দিকে মালতী ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল, তার কান্নার ক্ষমতা যেন ততই কমে আসতে লাগল, আর চোখের জলও যেতে লাগল শুকিয়ে। ধীরে ধীরে তার সমস্ত অনুভূতি এল ভোঁতা হয়ে। শুধু কাঠ হয়ে দোরগোড়ায় বসে থেকে কাটিয়ে দিল সারারাতটা। সেখান থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারল না। সমস্ত কথার জবাবে সে একটিমাত্র কথাই বলেছে, ও ফিরে এসে কড়া নাড়লে যে দরজা খুলে দিতে হবে।

ছোটমামা, ছোটমামিমা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন আর আশংকিত হয়ে উঠেছেন অতীশের অবর্তমানে মালতীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে!

সতেরো আর আঠারো তারিখ, দুটো দিন অতীশ কাটিয়ে দিল কি এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে। সারা দিন-রাত ধরে যে উন্মত্ততা সমস্ত এলাকাটা জুড়ে চলেছে তার ধাক্কায় সে কেমন যেন পাগলাটে হয়ে গেছে। তাকে সামলাতে মালতী হিমসিম্ খেয়ে গেছে। যখনই জয়হিন্দ' হাঁক কানে এসেছে, তখনই সে ছুটে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে। তার ইচ্ছে হয়েছে ওই হাঁকটাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে।

সারা দিনরাত, সমস্তক্ষণ অতীশ ছটফট করেছে সনতের জন্যে। সনতকে সেই যে টালিগঞ্জে রেখে এসেছে, তারপর কি ঘটেছে কে জানে! হয়তো ওই সনাতনের দল সনতের ওপর আক্রোশে মারাত্মক একটা কিছু করে বসতে পারে।

যতবারই অতীশ বেরোতে চেয়েছে, মালতী কান্নাকাটি করে একেবারে তার পা জড়িয়ে ধরেছে। সোজাসুজি বলেছে তুমি বেরোলেই আমি গলায় দড়ি দেব।

বিহ্বল দৃষ্টিতে অতীশ মালতীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। অদ্ভুত এক কথা তার মনে হয়েছে। যে মানুষ অপরের জন্যে প্রাণ

এমন অকাতরে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবতে পারে, সেই মানুষই আজ কেমন করে নির্বিকার চিত্তে মানুষ খুন করছে!

উনিশ তারিখে অতীশ আর কোন কথা শুনল না।

মালতীর কাছে কাকুতিমিনতি করে বললে, আমাকে যেতে দাও মালতী। প্রতি মুহূর্তে সনতের কথা এমন বিভৎস ভাবে মনে পড়ছে যে, এর থেকে পরিত্রাণ না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

অতীশের মুখের দিকে অশ্রুসজল চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে মালতী। তারপর হঠাৎ মাথা নিচু করে তার সামনে রেখে বলে, আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর, কোথাও কোন গণ্ডগোল দেখলে তার ধারে-কাছে যাবে না। কারও সঙ্গে রাগারাগি করবে না। আর আজই সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসবে।

কথা দিতেই হয় অতীশকে।

আজ যখন মানুষের জীবন এত সুলভ আর তুচ্ছ হয়ে পড়েছে, সেখানে অন্তত এই দুনিয়ার মধ্যে একটা মানুষের কাছে তার জীবনের জন্যে এতখানি আকুতি, তার মনে অভিনব এক আবেগের সৃষ্টি করে। মালতীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, হ্যাঁ মালতী, তোমার জন্যেই আমি বাঁচব।

আনমনে চলতে চলতে অতীশ এসে পড়ে চড়কডাঙার মোড়ে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। অনেক দূরে দূরে তফাতে তফাতে এক-আধজন লোককে চলতে দেখা যাচ্ছে।

কেমন যেন কৌতুহল হয় অতীশের, সেই জুতোর দোকানটাকে আর একবার দেখতে। এগিয়ে গিয়ে দেখে, দোকানটার সেই একই অবস্থা! শূন্য দোকানটার মধ্যে খালি র‍্যাকগুলো যেন হাঁ করে আছে!

হঠাৎ চমকে ওঠে অতীশ। দোকানের দরজার গোড়ায় এক রাইফেল-ধারী পুলিশ বসে আছে!

পুলিশ! পুলিশ কেন! কি পাহারা দিচ্ছে সে!

অতীশ জোরে পা চালিয়ে দেয় টালিগঞ্জের দিকে। ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে সতেরো তারিখ থেকেই। সমস্ত পথটা তাকে হেঁটে যেতে হবে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাইফেলধারী পুলিশ। মিলিটারী ভর্তি সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিচ্ছে শূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে। মিলিটারী ট্রাকে করে কাদের যেন কোথায় নিয়ে চলেছে!

পুলিশ, মিলিটারী শহরের রাস্তায় নেমেছে!

অতীশের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন?

চিরাচরিত উত্তর মনে আসে. শান্তি রক্ষা করতে।

কিসের শান্তি! কার শান্তি!

জনশূন্য রাস্তা আর মাঝে মাঝে লাশ! গতকাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রোদ উঠেছে। লাশগুলো ফুলে ফেঁপে বিভৎস হয়ে উঠেছে। কাক, শকুণ, কুকুরের মহোৎসব!

অতীশের মনে হয়, শান্তি রক্ষকদের এই ব্যবস্থা যেন মৃত সৈনিকের সমাধি স্থলে আর, আই, পি. (রেষ্ট ইন পীস্) লেবেল লটকে দেওয়ার মত!

জোরে হাঁটতে থাকে অতীশ। কিসে যেন তাকে তাড়া করেছে। পেছনে তাকাতে ভয় করে!

টালিগঞ্জ সেণ্টারের সামনে এসে অতীশ সনতকে বাইরেই দেখতে পায়। ছুটে গিয়ে অতীশ তাকে জড়িয়ে ধরে।

সনত নড়ে না। নিজের বুকের মধ্যে অতীশের বুকের কাঁপুনি অনুভব করতে থাকে।

কেঁপে ওঠা গলায় অতীশ ডাকে, সনত!

সনত বললে, কিছুই করতে পারলাম না অতীশ। সেই ভাগ হয়ে গেল!

অতীশ জিজ্ঞেস করলে, তুমি বোধহয় এখান থেকে নড় নি?

—না অতীশ. মাটি কামড়ে পড়েছিলাম। প্রাক্তন সৈনিক সংঘের প্রতিনিধি হিসেবে এইটুকু করতে পেরেছি যে, প্রাক্তন সৈনিকেরা এখনও নিজেদের মধ্যে মারামারি করেনি।

দুখানা মিলিটারী ট্রাক রাস্তা কাঁপিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পের গেটে।

জন পঁচিশ ছেলে সেই ট্রাক থেকে ধীরে ধীরে নামতে থাকে।

নিরাপদ স্থানে এসেও তাদের মধ্যে উল্লাস জাগছে না। যেন তারা পরাজয় স্বীকার করে পলাতক হয়ে এসেছে।

ফণীবাবুও ছিলেন সেই ট্রাকে। সনত আর অতীশকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন তাদের কাছে।

সনত প্রশ্ন করল, এরা বুঝি কলাবাগানের হিন্দু?

ফণীবাবু বললেন, হ্যাঁ। আর, যাদবপুর, গড়িয়াহাট আর এখানকার মুসলমানরা?

সনত বললে, তাদের সকলকে এখানেই জড় করেছে। আমাকে দিয়েছে ক্যাম্প থেকে বার করে। গতকাল থেকে ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষরাই সমস্ত দেখাশোনা করছেন।

ক্যাম্পের মধ্যে কলরব শুনে ওরা তিনজনেই সেই দিকে ফিরে চায়। মুসলমান ছেলেরা বোঁচকা ঘাড়ে করে বেরিয়ে আসছে, আর তাদের পাশে পাশে হেঁটে আসছে অনেকগুলি হিন্দু ছেলে।

অপার বিস্ময়ে ওরা দেখছে. দুই দলেরই ছেলেদের মুখগুলো। বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যথায় কি করুণ হয়ে উঠেছে সে মুখগুলোর চেহারা। তবুও ওদের বিচ্ছিন্ন হতেই হবে।

গাড়ীতে ওঠার পালা শেষ হয়েছে। গাড়ীতে স্টার্ট লাগিয়েছে মিলিটারী ড্রাইভার। ড্রাইভারের পাশের সীটে গিয়ে বসেছেন মিলিটারী অফিসার।

হঠাৎ অধীর গাড়ীর কাছে ছুটে এসে বলে ওঠে, গন্ডগোল মিটে গেলে আবার ফিরে আসিস ভাই।

সনত, অতীশ আর ফণীবাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। হয়তো সকলেই ভাবছিল যে যার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে আজকের এই অবস্থার কথা। কথা বলবার মত মনের ভারসাম্য ছিল না কারও।

সনত আর ফণীবাবু দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত। চোখ তাদের কোটরে বসে গেছে, মুখগুলো কালো হয়ে উঠেছে।

অতীশ বললে, চলুন ফণীবাবু, একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক।

ক্যাম্পের সামনেই একটা চালা ঘরে ছিল এক চায়ের দোকান। সেখানে গিয়ে ওরা ঢুকল। অতীশ বললে, তিন কাপ চা আর দু'খানা করে বিস্কুট দাও তো ভাই।

সনত টেবিলের ওপর কণুইটা রেখে মাথার চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে। মুখটা তার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে ওঠে।

ফণীবাবু বললেন, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথাই আসে না সনত-বাবু। তবুও যেন মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে দু'একটা সান্ত্বনার কথার বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আপনার কাছে। আপনি যেন বড় বেশী ভেঙে পড়েছেন। যে সর্বনাশ আজ হয়ে গেল, তাকে ঠেকাবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তবে ভরসা এইটুকু, এ ব্যাপার সাময়িক। মানুষের মন গতিশীল। এই সর্বনাশের পরেও আবার তারা হাসবে, ঘর বাঁধবে। আজ যারা অপর সম্প্রদায়ের একটি লোককে নির্বিকার চিত্তে খুন করছে, তারাই আবার কাল একটি শিশুকে বাঁচাবার জন্যে হয়তো নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলবে। এইটুকুই মানুষের অগ্রগতির পাথেয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ফণীবাবু উঠে দাঁড়ান। হাতটা বাড়িয়ে দেন সনতের দিকে।

বিপুল আবেগে সনত ফণীবাবুর হাতটা চেপে ধরে। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আচ্ছা ফণীবাবু, এই দাঙ্গা, এই যুদ্ধের কি কোন শেষ নেই?

ফণীবাবু মৃদু হেসে বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আজ আর তেমন কঠিন নয় সনতবাবু। দুনিয়া জোড়া সাধারণ মানুষ আজ এই সমস্যারই সমাধানের পথে পা বাড়িয়েছে। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ আছে, ততদিন যুদ্ধ আর দাঙ্গাও আছে। তাই আমাদের মন খারাপ করে বসে থাকার অবসর নেই।

ফণীবাবুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সনত মাথা নিচু করে নেয়।

অতীশের হাতের ওপর মৃদু একটা চাপ দিয়ে ফণীবাবু বল্লেন, চলি ভাই অতীশবাবু. আবার দেখা হবে।

ফণীবাবু চলে গেলেন।

অতীশ বললে, চল সনত, এবার ফেরা যাক্।

সনত বলল, চল।

নীরবে ধীর কদমে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে সনত আর অতীশ পাশাপাশি। দিনের আলো যেমন উজ্জ্বল রূপ নিয়ে দেখা দেয় প্রতিদিনই, সেদিনও তার কোন ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তবুও রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। প্রতিটি লোকের চোখেমুখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। তাদেরও বুকের মধ্যে অজানা এক ভীতি থেকে থেকে শির্‌শির্ করে উঠছে।

টালিগঞ্জের ট্রামডিপোর সামনে এসে হঠাৎ সনত দাঁড়িয়ে পড়ে।

অতীশ বিস্মিত দৃষ্টি মেলে সনতের মুখের দিকে চেয়ে বলে. কি হল! দাঁড়িয়ে পড়লে যে?

সনতের মুখখানা বিচিত্র এক হাসিতে ভরে ওঠে। বললে. আমি কোথায় ফিরে যাব অতীশ?

অতীশ সেই একই স্বরে আবার প্রশ্ন করে, কেন?

সনত বললে, মতি শীল স্ট্রীটে তো ফেরা যাবে না। ওটা যে মুসলমান এলেকা!

অতীশ লজ্জিত হয়ে পড়ে। মাথা চুলকে বলে. তাইতো. আমি তো ও কথাটা একেবারে খেয়ালই করিনি। তা তুমি না হয় আমার ওখানেই চল।

—তোমার ওখানে! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সনত অতীশের মুখের দিকে তাকায়।

অতীশ বললে. তোমার সন্দেহ হচ্ছে বোধহয়. আমার কথা থাকবে কিনা? সে সন্দেহ আমারও যে নেই তা নয়। কিন্তু উপায় কি বল! তুমি তো আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পার না। না হয় ছোটমামার হাতে পায়ে ধরব। তাতেও যদি না হয়, যে কটা টাকা হাতে আছে ছোটমামার হাতে তুলে দেব।

আবার দুই বন্ধুতে চলতে থাকে। নির্জন সেই রাস্তা। ট্রাম

নেই, শ্বাস চলছে না। খাঁ খাঁ করছে দুপুরের রোদ। রাস্তার পীচ গরম হয়ে গলে গেছে। কিন্তু তার ওপর দিয়ে চলবার মত গাড়ীও কম। কেবল থেকে থেকে উর্ধ্বশ্বাস গতিতে ছুটে চলেছে মিলিটারী ট্রাক্। হিন্দুদের হিন্দুপাড়ায় আর মুসলমানদের মুসলমান পাড়ায় পেঁৗছে দিচ্ছে।

আরও কিছু দূর চলবার পর অতীশ সনতের কাঁধের ওপর আলতো ভাবে একটা হাত রাখে।

সনত মুখ ফিরিয়ে অতীশের মুখের পানে তাকায়।

অতীশ বলে, না সনত, সবার আগে আমাদের যেতে হবে নফর কুণ্ডু লেনে।

সনত বললে, তাই চল।

বারো

বিকাশের হঠাৎ একটা চাকরী জুটে গেল এই ডামাডোলের বাজারে!

হঠাৎ এই কারণে যে, বিকাশ মোটেই আশা করেনি, এমন কি কোন চেষ্টাও করেনি। দাঙ্গা-হাঙ্গামার রকম সকম দেখে সে যে রকম ভড়কে গিয়েছিল, তাতে আর যা কিছুরই আশা করুক না কেন, চাকরী সম্বন্ধে কোন আশা তার মনের ধারে-কাছেও আসেনি।

বিকাশ আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়েছিল সব দিক থেকেই। চাকরীর তদ্বিরে ঘোরাঘুরিটা দাঙ্গার ধাক্কায় যখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, আর দিনের বেশীর ভাগ সময়টা যখন কাটাতে লাগল ওই পায়রার খোপের মধ্যে, তখন থেকেই তার মনের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা বাসা বাঁধতে লাগল। বিধিলিপির কোলে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে যে অনাবিল আরাম আছে, সেই আরামই সে উপভোগ করতে থাকে।

তারপর, পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর যেন তার গা লাগছিল না ঘোরাঘুরি করতে, কারণ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনে নিয়েছে, ঘোরাঘুরি করে কোন লাভ নেই।

প্রকাশ ইতিমধ্যে পাড়ায় উৎসাহী ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছে। দাঙ্গার কটা দিন সে খুবই ব্যস্ত ছিল। ওই সময়ে কিছু কিছু টাকা-কড়ি আর জিনিস-পত্তর সে যে কোথা থেকে এনেছে, সেটা বিকাশ অনুমান করতে পারলেও, মুখ খুলে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায়নি। বিকাশ বুঝে নিয়েছে, প্রকাশের ওপর তার দাদাগিরির যুগ শেষ হয়েছে। মায়ার কাছে শুনেছে, তার বিয়ে করা নিয়ে কটাক্ষ নাকি প্রকাশ তার অনুপস্থিতিতে প্রায়ই করে থাকে।

কিছুক্ষণ আগে সুহাসিনী আর প্রকাশের মধ্যে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেছে। সুহাসিনী প্রকাশকে গালিগালাজ করেছেন, এমন কি এক-ঘা চড়ও মেরেছেন। সর্বশেষ কাঁদতে কাঁদতে এসে বিকাশকে বললেন, একটা কিছু ব্যবস্থা কর বিকাশ, ছেলেটা যে অমানুষ হয়ে গেল।

বিকাশ দরাজ গলায় উত্তর দিল, আমার ক্ষমতার বাইরে মা।

সুহাসিনী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে কি হবে!

এ-প্রশ্নের উত্তর বিকাশের কাছে মোটেই কঠিন মনে হয় না। দিনের পর দিন সংকীর্ণ এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে যে ভাবনার জাবর সে অহরহ কেটে এসেছে, সেই ভাবনাগুলোই উত্তর হয়ে বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

হেসে বিকাশ উত্তর দেয়, ভাববার কিছুই নেই মা। দেখো, আর কিছুদিনের মধ্যেই মায়া মরে যাবে। আমাদের কাঁধ থেকে বিরাট এক বোঝা নেমে যাবে। তুমি দেশে গিয়ে থাকবে। আমি আর প্রকাশ যে যার পথ বেছে নেব। আর ছোড়দি! সেটা বিমলদা আর ছোড়দির ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া বিমলদা তো বলেছেন তাঁর মনের মত লোক জোগাড় হলেই বিয়েটা তিনি রেজেস্ট্রী করে নেবেন। মাঝখান থেকে তুমিই খানিকটা জল ঘোলা করলে মা। অযথা তাদের মাঝখানে এসে চেপে বসলে, আত্মীয়-স্বজনকে ঘাঁটিয়ে এক ঘোঁট পাকালে। এসে উঠলে এমন এক বাড়ীতে, যেখানে চেনাজানা কাকেও ডেকে আনতে মাথা কাটা যায়। এত কাণ্ডই তো করলে। তাতে কি লাভ হল মা!

সুহাসিনী মাথা নিচু করে চুপ করে থাকেন। বিকাশের প্রতিটি কথা অভ্রান্ত সত্য। তবুও ওই যুক্তি আর বিশ্লেষণই কি সব!

হঠাৎ সশব্দে হেসে ওঠে বিকাশ। সেই হাসিমুখ মায়ের মুখের সামনে তুলে ধরে বলে ওঠে, তোমার না বড় সাধ ছিল মা, ছেলে বৌ নিয়ে গুছিয়ে সংসার করবে? তোমার বুকভরা স্নেহ দিয়ে ছোড়াদির একটা হিল্লে করবে। তোমার মেয়ে জামাই নিয়ে দেশের ভিটেয় গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে? সে হবে না মা। ওদের বিয়েটা রেজেস্ট্রী হওয়ার পরও তোমার আত্মীয়-স্বজন, দেশের জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেউই মানবে ও বিয়েকে। যদিও আইনের চোখে, যুক্তির দিক থেকে, ন্যায়ের মাপকাঠিতে ওদের ওই বিয়ে আর সকলের বিয়ের মতই সিদ্ধ। তখন তুমি কি করবে মা?

সুহাসিনী ভয় পান। ভয়ে ভয়ে বলেন, না বিকাশ, আমি মায়াকে নিয়ে দেশেই ফিরে যাব।

আরও জোরে হেসে ওঠে বিকাশ, সে-পথও বন্ধ হয়ে গেছে মা। আমাদের চিরদিনের দেশঘর আর আমাদের থাকছে না। আমাদের দেশ আর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের কাছে বিদেশ বিভুঁই হয়ে যাবে, ওটা হবে মুসলমানদের দেশ।

সুহাসিনী আঁতকে ওঠেন, তা হলে!

বিকাশ এগিয়ে আসে মায়ের কোলের কাছে। মুখটা তুলে ফিস-ফিসিয়ে বলে, একটা কাজ করা যায় মা। দেখবে, তাতে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অস্থির হয়ে ওঠেন সুহাসিনী, বল বাবা বল, যা বলবি আমি তাই করব।

বিকাশ চোখ দুটো মেলে ধরে মায়ের মুখের ওপর। ব্যথায় কুঁকড়ে-ওঠা মায়ের মুখখানা দেখতে তার বড় ভাল লাগছে। বললে ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে, তাহলে এক কাজ কর মা। একদিন ভাল করে রান্না-বান্না কর। এস সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খাই। তারপর, খাওয়ার শেষে একটুখানি করে বিষ!

বিকাশ! আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠেন সুহাসিনী। বুকের মধ্যে দুহাতে চেপে ধরেন বিকাশকে। অঝোর ধারে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে।

মায়ের বুকের মধ্যে বিকাশের বড় ভাল লাগছে। নিঃশব্দে সে পড়ে থাকে।

বাইরে থেকে বিমলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, বিকাশ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বিকাশ।

সুহাসিনী চোখ মুছে ডাকেন, এসো বিমল।

বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সুহাসিনী বলেন, বস বিমল। মায়ে-পোয়ে সুখ দুঃখের কথা হচ্ছিল।

মাদুরটার ওপর বসে বিমল বললে, বিকাশের জন্যে একটা কাজের খবর এনেছিলাম।

কাজ! সবিস্ময়ে সুহাসিনী বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বিকাশ প্রশ্ন করে, কি কাজ বিমলদা?

বিমল বললে, কাজটা খুবই সাধারণ। কতকটা বিল-কালেক্টর ধরনের। আমাদের কারখানায় যে মুসলমান ভদ্রলোক ওই কাজটা করতেন, দাঙ্গার পর থেকে তাঁর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তাও মাস-খানেকের ওপর অপেক্ষা করা গেল। কিন্তু লোক না হলে কারবারও তো চলে না। মালিক আমার কাছে বলেছিল, জানাশোনা লোক সে চায়। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

এমন দিনে, এমন সময়ে, এমন খবর তো রীতিমত সুখবর! প্রচণ্ড উল্লাসে সুহাসিনীর ফেটে পড়া উচিত ছিল, আরও উচিত ছিল বিমলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো, প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করা।

কিন্তু এর কোনটাই সুহাসিনীর মনের ধারে-কাছে এলো না। যেটা মনে এল, সেটা হচ্ছে সেই অজানা অচেনা মানুষটার জন্যে উদ্বেগ!

সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, ভাল করে খোঁজ খবর নিয়েছিলে বিমল?

ম্লান হেসে বিমল বললে, আজকের এই অবস্থায় যতটুকু খোঁজ-খবর করা সম্ভব, ততটুকু নিশ্চয়ই করা হয়েছে।

আর যেন কথা এগোয় না। যে-বিষয়টা সকলেরই মনে ছায়া ফেলে

চলেছে, সে-বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রবৃত্তি আর যেন কিছুতেই আসছে না!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিমল প্রশ্ন করে বিকাশকে, কি বিকাশ, কাজটা তুমি নেবে তো?

কেমন যেন চমকে ওঠে বিকাশ। কাজটা নেওয়া বা না-নেওয়ার প্রশ্নটা যে তারই সম্মুখিন এ-কথা এতক্ষণের মধ্যে একবারও তার মনে হয়নি। সে ভাবছিল সেই লোকটির কথা, যার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না!

আমতা আমতা করে বিকাশ বলে, নেব, মানে নেওয়া উচিত কিনা তাই ভাবছিলাম। তুমি কি বল, বিমলদা?

আবার বিমলের মুখে সেই ম্লান হাসি দেখা দেয়। ধীরে ধীরে বলে, এত সুন্দর সুন্দর মন, মানুষের শুভকামনায় এতগুলো বুক থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের বুকে এতবড় একটা অপরাধ ঘটে গেল। আমরা কেউই বাধা দিতে পারিনি। কিন্তু আজ যদি নিজেদের অপদার্থতা খুঁজে বার না করে ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে থাকি, তাহলে দুষ্কৃতিকারীরাই প্রশ্রয় পাবে। জীবনকে আবার স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর বিকাশ।

বিস্মিত দৃষ্টিতে বিকাশ চেয়ে থাকে বিমলের দিকে। এই মানুষটার মুখোমুখি হলেই সে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে থাকে নিজেকে। সেই দুর্বলতাই আরও বেশী করে প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথায়, আচ্ছা আমি এ-কাজ নেব। কিন্তু সনতদার সঙ্গে একবার আলোচনা করব। দেখি তিনি কি বলেন।

উঠে পড়ে বিমল বললে, বেশ তাহলে আলোচনাটাই আগে সেরে নাও। কাল গেলেও চলবে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় বিমল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকেন সুহাসিনী আর বিকাশ। বিচিত্র ভাবনা ভেবে চলেছে দু'জনেই। আর মাত্র কিছুক্ষণ আগে যখন তারা দেখছিল, জীবনের সবকটি দ্বার রুদ্ধ, তখন বিমল এল সেই রুদ্ধ ঘরে দমকা ঠাণ্ডা বাতাসের মত। এ-বাতাসে আরাম আছে কিন্তু স্বস্তি তো পাচ্ছে

না। এই আরামের মধ্যে যেন নৃশংসতার ছোঁয়াচ রয়ে গেছে। একের জীবনের বিনিময়ে অপরের জীবনের সুরু!

মায়া এসে ঘরে ঢোকে।

বিকাশ যেন কথা বলার একটু সুযোগ পায়। প্রশ্ন করে মায়াকে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—নিচে। ছোড়দির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

বিকাশ বিরক্তি প্রকাশ করে, আবার নিচে গিয়েছিলে! তোমার না সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা বারণ।

মায়া আর কোন জবাব না দিয়ে গুটিয়ে-রাখা বিছানাটা পেতে নিয়ে তার ওপর বসে পড়ে।

সুহাসিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কাজটা নিয়ে নে বিকাশ।

মায়া প্রশ্ন করে, কোন কাজ? ছোড়দি বলছিলেন বিমলদা নাকি একটা কাজের সন্ধান এনেছেন। কিন্তু সেই লোকটি যদি আবার ফিরে আসে?

সুহাসিনী বলতে বলতে বেরিয়ে যান, তখন না হয় বিকাশ তার কাজ তাকেই ফিরিয়ে দেবে।

সনতের মনে হচ্ছিল, জীবনের একটা পর্ব যেন শেষ হল! এর পর কি?

ভাবনাটা অদ্ভুত ধরনের। মাত্র মাস-ছয়েক আগে এমনই ধরনের ভাবনা তাকে আনমনা করে তুলেছিল। আর, সি, মেল'এ বসে সেই নিশুতি রাত্রে বিকাশের সঙ্গে তার কথাবার্তার প্রতি বর্ণটা মনে পড়ে যায়। মিলিটারী জীবন শেষ করে নতুন জীবনে পদার্পণ করার আগে কেমন যেন অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে।

আর দাঙ্গা সুরু হওয়ার পর দেড় মাস বাদে মতি শীল স্ট্রীটের ঘরে বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আজও সে সেই একই কথা ভেবে চলেছে। দাঙ্গা সম্পূর্ণ না থামলেও, জীবনযাত্রা ক্রমশই স্বাভাবিকের দিকে এগিয়ে চলেছে। আপিস, কাছারী, স্কুল, কলেজ, সবই খুলে

গেছে। রাস্তাঘাট আবার জমজমাট। লোকে কাজের তাড়ায় আবার সেই আগেকার মতই বাসে-ট্রামে ঝুলোঝুলি, ঠাসাঠাসি করে চলেছে। তবুও সহরের বিশেষ কোন একটা রাস্তা বা পল্লীর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সচকিতভাবে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আশ-পাশের লোকগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। তারা খোঁজে জীবনের নিরাপত্তা।

জীবনের এই নিরাপত্তার কথা ভেবেই আর, সি, মেল'এ বসে তারা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ছিল বিকাশ, কমলাকান্ত, সুকুমার আর রফিকও! সে নিরাপত্তা ছিল জীবনযাত্রার নিরাপত্তা। আর আজকের নিরাপত্তার প্রশ্ন হল অক্ষত দেহে প্রাণটাকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার নিরাপত্তা।

মতি শীল স্ট্রীটের ঘরে এসে উঠেছে সনত মাত্র কয়েক দিন আগে। তারও আগে মাঝে মাঝে এসে দেখে গেছে এ-অঞ্চলের হালচাল। ভর-দুপুর বেলায় এই বাড়ীর এক হাত চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে তার গা ছম্‌ছম্‌ করেছে। অপর সম্প্রদায়ের কোন একটা মানুষকে একটু জোরে হাঁটতে বা দৌড়াতে দেখলেই কেমন যেন তার বুকের মধ্যেটা ধড়-ফড় করে উঠেছে, প্রচণ্ড আতঙ্কে অকস্মাৎ তার সর্বশরীর হীম হয়ে এসেছে।

তবুও সনতকে এসে উঠতে হয়েছে এই মতি শীল স্ট্রীটের ঘরে। অতীশের বাড়ী তার কোনই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তাদের অসুবিধার বহর দেখে সে নিজেই বিব্রত বোধ করেছে। নফর কুণ্ডু লেনে গিয়ে থাকবার জন্যে কাকিমাও বলেছিলেন। এমন কি কমলার সেই অটল দৃঢ়তাও টলে গিয়েছিল।

সনত নিজেকেও দুর্বল বোধ করতে থাকে। জীবনের স্বপ্ন এমন-ভাবে খান্‌ খান্‌ হয়ে যাবে, এ-কথা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। মিলিটারী জীবনে বার বার সে কারাবরণ করেছে। উর্ধ্বতন অফিসারের বিরাগভাজন হয়েছে ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে, মানুষের সাধারণ অধিকারের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে। কিন্তু তার জন্যে কোনদিন সে নিজেকে দুর্বল বোধ করেনি। তার উৎসাহ এক তিলও কমেনি। সেদিন

কোম্পানির সমস্ত মানুষগুলো ছিল তার পাশে-পাশে, তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অংশীদার হয়ে।

কিন্তু আজ যেন সে ফুরিয়ে-যাওয়া মানুষ!

আর কয়েক মাস বাদে স্বাধীনতা আসছে। তবুও তার মনে কোন উল্লাস নেই। নতুন করে আশা করবার কিছু নেই। সুদীর্ঘ কালের সংগ্রামের ফল কি এই স্বাধীনতা! এ-স্বাধীনতার চেহারাটা কেমন! দ্বিখণ্ডিত ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা আর মুসলমানের স্বাধীনতা! সমস্ত ভারতবাসী একসাথে স্বাধীনতা পেল না। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা এলো না!

যে ভারতভূমিতে সে একদা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে-ভারত আজ প্রাক্তন ভারত!

দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা ঠেলে মুখ বাড়াল বিকাশ।

সনত বললে, এসো বিকাশ।

বিকাশ ঘরে ঢুকে বললে, তুমি একাই বসে আছ?

—তার আর কি করব বল। গত পাঁচ দিনের মধ্যে কেবল তুমিই এলে।

—কিন্তু আমি তো আর প্রাক্তন সৈনিক নই।

—কি রকম!

—আমার তো চাকরী জুটে গেছে। সুতরাং আমার পুনর্বাসন হয়ে গেছে। কাজেই আমি আর প্রাক্তন সৈনিক নই।

—যাক, তাহলে শুধু দুর্দিনই আসেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে সুদিনও এসেছে বল!

—তা ঠিক। কিন্তু একজনের দুর্দিনের ফলেই আর একজনের সুদিন।

ভ্রূ কুঁচকে সনত প্রশ্ন করে, কি রকম?

বিকাশ ব'লে যায় তার চাকরী পাওয়ার উপাখ্যানটা। এমন কি বিমলের সঙ্গে কথাবার্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও দেয়।

সমস্ত শোনার পর সনত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বিমলের কথাটা তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

সনত ঝ'্কে প[illegible], তোমার বিমলদা যে কথাটা বলেছেন আবার বলতো বিকাশ।

বিকাশ ব'লে যায়, 'এত সন্দর সন্দর মন, মানুষের শুভ কামনায় এতগুলো দরদভরা বুক থাকা সত্বেও আমাদের দেশের বুকে এত বড় একটা অপরাধ ঘটে গেল! আমরা কেউই বাধা দিতে পারি নি। কিন্তু আজ যদি নিজেদের অপদার্থতা খুঁজে বার না ক'রে ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে থাকি, তাহলে দুষ্কৃতিকারীরাই প্রশ্রয় পাবে। জীবনকে আবার স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর—'

সনত অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। নিজের মনের মধ্যে কথাগুলোকে নিয়ে যাচাই করতে থাকে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা আন্দোলিত হতে থাকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি: ভারত দু'টুকরো হয়ে গেল। প্রাক্তন ভারতের দুই অংশে আবার জাগল নতুন করে জীবনের সাড়া। সাধারণ মানুষ সেই ভিক্ষার পাত্র নিয়ে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে ঠোকাঠুকি খেতে লাগল। আবার দুই দেশে সৃষ্টি হতে লাগল উনত্রিশে জুলাই। সাধারণ মানুষের জাত নেই, ধর্ম নেই। তাদের মুক্তির আগে তারা থামবে না। তারা যেদিন হবে মুক্ত, সেদিন ধর্মভেদে দেশভেদের এই বেড়া আপনা থেকেই ধ্বসে পড়বে।

হঠাৎ সনত প্রশ্ন করে, আচ্ছা বিকাশ, এ চাকরী পেয়ে তুমি খুশী হয়েছ?

বিকাশ বললে, না সনতদা, খুশী তো দূরের কথা, চাকরীটা নেওয়া উচিত কিনা ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তাই তো তোমার কাছে ছুটে এলাম।

সনত বলে ওঠে, তুমি যে খুশী হওনি, সে আমি তোমায় না দেখলেও বুঝতে পারতাম। আমাদের মত মানুষ যারা, যারা দুঃখ আর দুর্দশার বোঝা ঘাড়ে করে জীবন-চলার পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, তারা কেউই খুশী হতে পারবে না।

বিকাশ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে বলে, তাহলে?

—তোমার বিমলদার কথাটাই ঠিক বিকাশ। দুঃখে ক্ষোভে হত-বুদ্ধি হয়ে আত্মহত্যা করাটাই সমবেদনা প্রকাশ করার একমাত্র রাস্তা

নয়। বরং জীবনের স্বাভাবিক পথে চলতে চলতে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যাতে আমরা করতে পারি, তারই চেষ্টা দেখা উচিত।

দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কমলা ইতস্তত করছে।

সনত চোখ তুলে দেখে কমলার খুশী মাখা মুখখানায় বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছে।

উঠে দরজার কাছে গিয়ে সনত চাপা গলায় বললে, আবার তুমি এখানে এসেছ?

কমলা কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানা তুলে বললে, তবে কি চিঠি দিয়ে তোমার সঙ্গে হিন্দু আর মুসলমান এলেকার কোন সীমান্তে সাক্ষাৎকারের আর্জি জানাব!

সনত হেসে উঠে বলে, ভেতরে এস।

কমলা বললে, ভেতরে যে অন্য লোক রয়েছে। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

সনত ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে ওঠে, ও আবার লোক কোথায়, ও তো আমাদের বিকাশ।

—তাহলে ভেতরে চল।

হাসতে হাসতে কমলা ভেতরে এসে চাটাইটার ওপর বসতে বসতে বললে, শুনলেন তো বিকাশবাবু, আপনার সনতদার কথা। আপনি নাকি কোন লোকই নন—আপনি শুধুই বিকাশ।

বিকাশ হাসতে হাসতে বললে, সনতদা বরাবরই আমাকে ওই চোখেই দেখেন।

সনত বললে, বিকাশ, তোমার সঙ্গে এঁর বোধহয় পরিচয় নেই। এসো আলাপ করিয়ে দিই।

বিকাশ বললে, তার আর দরকার হবে না সনতদা। উনি যে কমলাদি, প্রথম দেখায়ই চিনতে পেরেছি।

কমলার আরক্ত মুখখানার দিকে ফিরে বিকাশ রীতিমত গম্ভীরভাবে বলল, আপনি কিন্তু আমার এক সাংঘাতিক বিপদ ঘটালেন।

কমলা বিব্রত দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে তাকায়।

বিকাশ বলে, [illegible] এসে আপনাকে দেখলাম, এতে লাভটা হল এই যে, মায়া হয়তো সপ্তাহখানেক আমার সঙ্গে কথাই বলবে না।

সনত আর কমলা সরবে হেসে ওঠে। বিকাশও সে হাসিতে যোগ দেয়।

সনত কমলাকে বলল, এইবার বল, তোমার কি কথা। মনে হচ্ছে যেন কোন সুখবর।

কমলা বললে, একটা বাড়ী পাওয়া গেছে।

সনত সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে, বাড়ী!

কমলা বললে, হ্যাঁ, সমস্তই ঠিকঠাক। ইচ্ছে কর তো আজই সেখানে গিয়ে উঠতে পার।

—আমি তো এখনই সেখানে চলে যাব, আনন্দের আতিশয্যে সনত উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে।

হঠাৎ থেমে পড়ে বিকাশের কাঁধে একটা চাপড় মেরে সনত বলে, আজই চলে এসো বিকাশ। নীরদ আর অতীশকে এখনই খবর দিতে হবে। আর—

কমলার মুখের দিকে চেয়ে সনত থেমে যায়।

কমলা সুগভীর স্নেহে সনতের উত্তেজিত মুখখানার দিকে চেয়ে আছে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে দুজনের দৃষ্টি পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখে।

কমলা চোখ নামিয়ে নেয়। তার সমস্ত বুকটা জুড়ে নিদারুণ এক ব্যথা খচ্ খচ্ করতে থাকে। এখনই সে সনতের হাত ধরে নতুন পাওয়া বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে, সনতের তাকে এই মুহূর্তে বড় বেশী প্রয়োজন। গত দেড় মাস ধরে গৃহহীনের মত সে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। জীবনের কোথাও তার স্থিতি হল না। আর আজ তো সে জীবনের বৃহত্তর যুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত!

হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠে কমলা বললে, যান না বিকাশবাবু, বাড়ীটা আপনারা একবার দেখে আসুন।

সনত বললে, তাই চল বিকাশ। ক্ষণেক থেমে কমলার মুখের পানে চেয়ে বললে, তুমিও চল না কমলা।

কমলার মুখখানা আবার রক্তিম হয়ে উঠেছে, বুঝি বা লজ্জায়। ভারাক্রান্ত দৃষ্টি সে নামিয়ে নেয় সনতের করুণ দৃষ্টির ওপর থেকে।

তিনজনে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সনত দরজায় তালাটা লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাড়ীটা কোথায় ?

কমলা বললে, ভবানীপুরে।

ন্যাড়া ছাদের ওপর দিয়ে চলতে চলতে বিকাশ জিজ্ঞেস করল কেমন করে পেলেন বাড়ীটা কমলাদি ?

কমলা বললে, বাড়ীটা এক মুসলমান ভদ্রলোকের—

হঠাৎ সনত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সহসা যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সচকিত স্বরে বলে ওঠে চল, চল, আর দেরী করো না।
